

মাসুদ রানা

অমানুষ

কাজী আনোয়ার হোসেন


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৩৭৬

অমানুষ

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7376-2
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭
রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব
বিদেশি ছবি অবলম্বনে
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩
Masud Rana-376
AMANUSH
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

আটান্ন টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? *বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ *বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা *প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর *নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যুআলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া *টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা*মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা *সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর *নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা*বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসন্দ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল *শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য*প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেল আবিব*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী*বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা *রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন*হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ *কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন *সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল *সর্পলতা।

এক

১৯৪৫ সাল।

বাতাস না থাকায় একটানা বহুক্ষণ ঢেউহীন, নিথর হয়ে আছে মোহনার পানি, ওপরটা কালো কাঁচের মত মসৃণ।

হঠাৎ প্রবল আলোড়ন উঠল পানিতে, যেন বিশাল কোনও জলজন্তু উঠে আসছে সমুদ্রের গভীর অতল থেকে, পাঁউরুটির পিঠের মত ফুলে উঠছে পানি।

প্রথমে গুরুত্ব দিলেন না পাহাড়ের ঢালে বসা মানুষটি, ভাবলেন আরেকটা দৃষ্টিবিভ্রম–হতেই পারে সেটা, কারণ একে তো প্রচণ্ড ক্লান্ত চোখ, তার ওপর মেঘে ঢাকা চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ভুল দেখাটা অস্বাভাবিক নয়।

তবে চোখ সরালেন না জায়গাটা থেকে। ফুলতে ফুলতে একসময় বিস্ফোরিত হলো যেন পাঁউরুটির পিঠ। পানি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা দানবীয় মাথা। কালো, মসৃণ, চকচকে শরীর থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ার আবছা আভা অন্ধকারেও প্রকাশ করে দিচ্ছে ওটার অস্তিত্ব।

প্রকাণ্ড জিনিসটা আরেকটু ভাসল। দেখা গেল চোখা লম্বা নাক, সিলিন্ডার আকৃতির দেহ। এক সময় থামল ওটার ওপরে ওঠা। মসৃণ পানিতে পিঠ ভাসিয়ে অপেক্ষা করে রইল মানুষটার জন্য।

অন্ধকারে তিনবার দেখা গেল আলোর ঝিলিক: খাটো, লম্বা, লম্বা: ডট, ড্যাশ, ড্যাশ–'ডব্লিউ' বোঝানো হলো আন্তর্জাতিক

মোর্স কোডে। টর্চ জ্বেলে-নিভিয়ে সঙ্কেত দিলেন তিনিও। তারপর পাশে রাখা নিজের ছোট ব্যাগটা তুলে নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলেন।

গায়ে বিশ্রী দুর্গন্ধ। চুলকাতে চুলকাতে ক্ষত করে ফেলেছেন জায়গায় জায়গায়। পরনের পোশাকটা কয়েক দিন আগে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটা লাশের গা থেকে খুলে নিয়েছেন। নোংরা, উকুনে ভর্তি, ঠিকমত ফিট করেনি। নিজের পরনের অভিজাত পোশাক আর হাতে তৈরি দামি বুটজোড়া মাটিচাপা দিয়ে এসেছেন একটা গর্তে।

আপাতত ক্ষুধার্ত নন তিনি। বিকেলে এক বাস্তুহারা দম্পতির ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইঁট দিয়ে মাথা ছেঁচে দুজনকে খুন করেছেন, ওদের ভিক্ষে করা খাবার কেড়ে নিয়ে গপাগপ্ গিলেছেন।

দুজন মানুষকে খুন করতে একটুও হাত কাঁপেনি তাঁর, একটু খারাপ লাগেনি, বরং আনন্দ পেয়েছেন। গত কয়েক বছরে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছেন তিনি। নিজের হাতে, অন্যকে দিয়ে, শত শত মানুষকে খুন করেছেন। মানুষ মারা তাঁর কাছে নতুন নয়।

গত কয়েক দিন ধরে শুধু ছুটেছেন আর ছুটেছেন তিনি। কত দিন হবে সেটা? পাঁচ দিন? সাত? মনে নেই, মনে রাখার প্রয়োজনও বোধ করেননি। বিধ্বস্ত দেশটির ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে আরও অনেক বাস্তুহারার সঙ্গে মিশে একটানা হেঁটেছেন, দখলদার বাহিনীর চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে সব সময় শঙ্কিত থেকেছেন, পরিত্যক্ত খামারবাড়ির ভিজে খড়ের গাদা ছাড়া ঘুমানোর জায়গা জোটেনি।

ক্লান্তি ছিল নিত্যসঙ্গী। কতবার যে লুটিয়ে পড়েছেন ভেজা ঘাসে মুখ গুঁজে দিয়েছেন নোংরা কাদায়। এত কষ্ট হয়তো হতো

না, যদি বয়েসটা না হতো পঞ্চাশের কোঠায়, আর শরীরটা বেশি ওজনদার। গত দশ বছরে ব্যায়াম বলতে কিছুই করেননি। শরীরটাকে কেন ফিট রাখেননি ভেবে প্রচণ্ড আক্রোশ হচ্ছিল নিজের ওপর। কিন্তু তিনি কী আর জানতেন, এভাবে প্রাণভয়ে ভীত ইঁদুরের মত দৌড়ে পালানোর প্রয়োজন হবে কোনদিন?

গত কয়েক দিনে বহুবার তাঁর মনে হয়েছে এই কষ্টের চেয়ে মৃত্যুও ভাল। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থেকেছেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মনের জোরে আবার টেনে তুলেছেন নিজেকে। মনকে বুঝিয়েছেন, না, যে কাজটা শুরু করেছেন, সেটা শেষ করতেই হবে। একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে এভাবে হাল ছেড়ে দেয়াটা ঠিক হবে না।

পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে সাবধানে নামতে নামতে আপনমনে হাসলেন হেনরিখ স্কপ, হাল না ছাড়াতে নিজের ওপর সন্তুষ্ট তিনি। ক্লান্তি, ভয়, সব উধাও হয়ে গেছে। লক্ষ্যে পৌঁছানোর কঠিন ধাপগুলোর প্রথমটা পার হয়ে এসেছেন।

পানিতে ভাসমান কালো জিনিসটার দিকে তাকালেন। অন্তহীন ছুটে বেড়ানো কিংবা অপেক্ষার মুহূর্তগুলোতেও একটিবারের জন্যও মনে হয়নি তাঁর, সন্দেহ হয়নি, ওরা আসবে না। কারণ তিনি জানেন, ওরা ইহুদি নয়–ইংরেজও নয়, তাঁরই মত জার্মান; ওপরওয়ালার কাছ থেকে কোনও নির্দেশ পেলে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। জার্মানদের ওপর নির্ভর করা যায় চোখ বুজে।

দুই

নুড়ি বিছানো সৈকতে নেমে এলেন স্কপ। তাঁর জন্য পানির কিনারে অপেক্ষা করছে একটা রবারের ডিঙি। তাঁকে তুলে নিতে এসেছে ওটা। দাঁড়ে বসা একজন লোক, আরেকজন সৈকতে দাঁড়ানো। দুজনের পরনেই কালো পোশাক–জুতো, ট্রাউজার, সোয়েটার, উলের ক্যাপ। কয়লার গুঁড়ো মেখে কালো করে নিয়েছে হাত-মুখ। দুজনের কেউই কথা বলল না।

একটা হাত বাড়িয়ে দিল তীরে দাঁড়ানো লোকটা, স্কপের বোঝাটা নিয়ে তাঁকে হালকা করতে চাইল, রাজি হলেন না তিনি। বরং ব্যাগটা আরও শক্ত করে বুকে চেপে ধরে পা রাখলেন ডিঙিতে, দাঁড়ে বসা লোকটার কাঁধে ভর দিয়ে নৌকায় উঠলেন, টলমল পায়ে হেঁটে গেলেন সামনের গলুইয়ের দিকে।

নুড়ি পাথরের সঙ্গে রবারের ঘষা লাগার শব্দ হলো। তারপর শান্ত পানিতে সাবধানে দাঁড় বাওয়ার মৃদু ছলাৎ।

প্রায় নিঃশব্দে এসে ইউ-বোটের গায়ে ভিড়ল রবারের ডিঙি। ডেকে দাঁড়ানো আরও দুজন লোক। হাত ধরে স্কপকে সাবমেরিনে উঠতে সাহায্য করল তারা, ফরোয়ার্ড হ্যাচের কাছে নিয়ে গিয়ে মেলে ধরল ওটা। লোহার মই নেমে গেছে সাবমেরিনের পেটের ভিতর।

কন্ট্রোলরুমে একটা মইয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন স্কপ। রুক্ষকণ্ঠে আদেশের ঝড় বইল কয়েক মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গে পালন

করা হলো সে আদেশ। কুয়াশায় ভরে আছে যেন সাবমেরিনের ভিতরটা। প্রতিটি বৈদ্যুতিক বাল্‌বের চারপাশ ঘিরে রয়েছে বর্ণবলয়, প্রতিটি ধাতব জিনিসের স্পর্শই ভেজা ভেজা। বাতাস শুধু আর্দ্রই নয়, দুর্গন্ধে ভরা। প্রতিটি গন্ধকে আলাদাভাবে চেনার চেষ্টা করলেন তিনি: লবণ, ঘাম, ডিজেল ও আলুর গন্ধ চিনতে পারলেন স্পষ্ট।

স্কপের মনে হলো, নরকে এসে বন্দি হয়েছেন।

বৈদ্যুতিক মোটরের চাপা শব্দ কানে এল তাঁর। গতি টের পেলেন, খুব হালকাভাবে। সামনে এগোচ্ছে সাবমেরিন। নীচের দিকে নাক নামাল।

সাদা ক্যাপ পরা একজন অফিসার পেরিস্কোপের সামনে থেকে সরে এসে স্কপকে অনুসরণ করতে ইশারা করলেন। ঢুকে গেলেন একটা প্যাসেজওয়েতে। মাথা নুইয়ে একটা নিচু দরজা পেরিয়ে অন্যপাশে এসে তাঁকে অনুসরণ করলেন স্কপ।

খুদে একটা খুপরিমত ঘরে ঢুকলেন দুজনে। একটা বাংক, একটা চেয়ার আর একটা ফোল্ডিং ডেস্ক রয়েছে সেখানে। নিজের পরিচয় দিলেন অফিসার। তিনি এই ডুবোজাহাজের কমান্ডার, ক্যাপিট্যান্ট-লেফটেন্যান্ট কেম্‌ফ্‌। বয়েস খুবই কম, তিরিশের বেশি হবে না, মুখ ভর্তি দাড়ি, রোগাটে চেহারা; এই বয়েসেই ইউ-বোটের ঝানু ক্যাপ্টেন। গলায় ঝোলানো নাইট'স ক্রস, শার্টের কলারের ভিতর ঢুকতেই ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে দিলেন।

ভঙ্গিটা খুব পছন্দ হলো স্কপের। বোঝা যাচ্ছে অনেক দিন আগেই রিটারক্রয়েব্জ পেয়েছেন কেম্‌ফ্‌, হয়তো ওটার পাশাপাশি ইউনিফর্মে লাগানোর জন্য ওক লিভও পাওনা হয়ে গেছে তাঁর, সময়ের অভাবে হাতে আসছে না জিনিসটা। নিজের কাজ ভাল বোঝেন, এখনও তাঁর বেঁচে থাকাই সেটা প্রমাণ করে। যুদ্ধে ব্যবহৃত প্রায় নব্বই ভাগ ইউ-বোট হারিয়ে গেছে, ওগুলোতে করে পাড়ি জমানো ঊনচল্লিশ হাজার মানুষের তেত্রিশ হাজারই হয় মারা

পড়েছে নয়তো ধরা পড়েছে—বাকিরা নিখোঁজ।

দেশের ভিতরের গোলমাল, জার্মান সৈন্যদের পিছু হটা আর ফুয়েরারের মৃত্যুসংবাদ দিলেন কেম্‌ফ্‌কে স্কপ।

'রাইখের নতুন লিডার কে হলেন?' জানতে চাইলেন কেম্‌ফ্।

'জানি না, হয়তো বোরম্যানই দায়িত্ব নেবেন,' সত্যি কথাটা কেম্‌ফ্‌কে জানাতে দ্বিধা করছেন স্কপ। রাইখ বলে কিছু নেই আর এখন জার্মানিতে। অকারণে ক্যাপ্টেনের মন খারাপ করতে চাইলেন না তিনি। প্রসঙ্গ বদলালেন, 'এই জাহাজে কয়জন লোক আপনার?'

'পঞ্চাশ, আপনাকে ও আমাকে নিয়ে। সবাই ভলান্টিয়ার, সবাই পার্টি মেম্বার, সবাই একা।'

'যুদ্ধে জার্মানির কী দশা হয়েছে, ক্রুরা কতখানি জানে?'

'কিছুই জানে না,' কেম্‌ফ্ জবাব দিলেন। 'শুধু জানে, কোনদিন আর বাড়ি ফেরার আশা নেই ওদের। আমি বলেছি।'

'কতদিন লাগবে আমাদের যেতে?'

'এমনিতে তিরিশ-চল্লিশ দিন লাগে, কিন্তু এখন শর্টকাটে যেতে পারব না। বিস্কে উপসাগর মৃত্যুফাঁদ হয়ে আছে, মিত্রবাহিনীর জাহাজ গিজগিজ করছে ওখানে। স্কটল্যান্ড ঘুরে আটলান্টিকে পড়তে হবে আমাদের, তারপর দক্ষিণে। পানির ওপর ভেসে চলতে পারলে আঠারো নট গতি তুলতে পারতাম, কিন্তু সেটা কতখানি সম্ভব হবে জানি না। ইকোনোমি স্পিড বজায় রাখতে হবে আমাকে, অর্থাৎ বারো নটেই পাড়ি দিতে হবে আট হাজার সাতশো মাইল। পথে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখলে বেশির ভাগ সময় ডুব দিয়ে থাকতে হবে। ডুব দিয়ে চললে সাত নটের বেশি গতি পাব না। তা-ও যদি একটানা চলতে পারতাম, কথা ছিল না, কিন্তু চৌষট্টি মাইল চলার পরই আমাদের ই-মোটরগুলোর ক্ষমতা ফুরিয়ে যায়, রিচার্জ করতে সময় দিতে হয় সাত ঘণ্টা. আর ওই সময়টায় ওপরে ভেসে উঠতে হয় আমাদের।

এ সব হিসেবে রেখে, আশা করি পঞ্চাশ দিনের মধ্যে আপনাকে জায়গামত পৌঁছে দিতে পারব।'

বগলের নীচে ঘাম টের পাচ্ছেন স্কপ। প-ঞ্চা-শ দিন! এই লোহার কফিনটায় ঢুকেছেন তিনি একটি ঘণ্টাও হয়নি, এখনই তাঁর দম আটকে আসছে, লোহার সাঁড়াশি দিয়ে যেন চেপে ধরা হয়েছে ফুসফুস; এটাতে পঞ্চাশটা দিন বন্দি থাকার কথা শুনে ঘেমে যাচ্ছেন তিনি।

'অভ্যস্ত হয়ে যাবেন,' ভরসা দিলেন কেম্ফ্। 'দক্ষিণে পৌঁছে ডেকে গিয়েও সময় কাটাতে পারবেন, অবশ্য যদি পৌঁছাতে পারি। আরও একটা অসুবিধের কথা বলি আপনাকে, লড়াইয়ের প্রয়োজন হলে পূর্ণ শক্তি পাব না, এক হাতওয়ালা মানুষের মত অবস্থা। আমাদের ফরোয়ার্ড টর্পেডো নেই।'

'নেই কেন?'

'বের করে ফেলে দিতে হয়েছে, আপনার বাক্স রাখার জায়গা করার জন্যে। এতই বড়, হ্যাচ দিয়ে ঢুকছিল না, ডেক প্লেট খুলে নিয়ে তারপর ঢোকাতে হয়েছে। ঢোকানোর পর দেখি টর্পেডোর পাশে জায়গা হচ্ছে না। কী আর করা, শেষে টর্পেডোটাই ফেলে দিতে হয়েছে।'

উঠে দাঁড়ালেন স্কপ। 'চলুন, দেখব।'

ছোট ছোট খুপরির মত এক সারি ঘরকে পাশ কাটিয়ে এগোলেন দুজনে। ওগুলোতে রয়েছে রেডিও রুম, অফিসার'স কোয়ার্টার, রান্নাঘর। জাহাজের গলুইয়ের কাছে পৌঁছে টান দিয়ে ফরোয়ার্ড টর্পেডো রুমের হ্যাচ খুললেন কেম্ফ্। ভিতরে ঢুকলেন স্কপ।

এখানেই রয়েছে জিনিসটা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ব্রোঞ্জের তৈরি বিশাল বাক্সটার দিকে তাকিয়ে রইলেন স্কপ। কত বছরের কঠোর পরিশ্রম, সাধনা, ব্যর্থতা ও উপহাসের পর এসেছে এই সাফল্য: তৈরি হয়েছে বিস্ময়কর সেই মারণাস্ত্র।

ব্রোঞ্জের চকচকে ঔজ্জ্বল্য কিছুটা মলিন হয়েছে। বাক্সের কোনও ক্ষতি হলো কিনা পরীক্ষা করে দেখলেন। না, হয়নি।

বাক্সের একপাশে হাত রাখলেন তিনি। গর্বে ভরে উঠল বুক। এখানে রয়েছে সেই অস্ত্র, থার্ড রাইখের সময়কালীন সবচেয়ে বিস্ময়কর আর বৈপ্লবিক আবিষ্কার।

তিনি জানতেন, সফল তিনি হবেনই। তাঁর আবিষ্কারের সুবিধা ভোগ করবে জার্মানি। যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া যেত এ অস্ত্র ব্যাপক হারে ব্যবহার করা গেলে; কিন্তু তার আগেই শেষ হয়ে গেল যুদ্ধ।

তিন

স্কটল্যান্ডের চোখা মাথাটা ঘুরে এসে পশ্চিমা ঝড়ের রোষানলে পড়ল ইউ-বোট। ডুবোজাহাজটাকে অ্যামিউজমেন্ট পার্কের রাইডের মত দোলাতে লাগল ক্ষিপ্ত সাগর। এরই মধ্য দিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে দক্ষিণে এগিয়ে চলল জাহাজ, আয়ারল্যান্ডের পশ্চিম ধার দিয়ে ধীরগতিতে এসে পড়ল আটলান্টিক মহাসাগরে।

৮ মে স্কপকে জানালেন কেম্ফ্, রেডিওতে বুলেটিন শুনেছেন, মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে জার্মানি। যুদ্ধ শেষ।

'না, শেষ হয়নি,' জবাব দিলেন স্কপ, 'আমাদের জন্যে নয়। আমাদের যুদ্ধ কখনও শেষ হবে না।'

দিন যায়, শরতে লিনডেন গাছের পাতা ঝরার মত একের পর এক, বৈচিত্র্যহীন। শিপিং লেইন এড়িয়ে চলছেন কেম্ফ্, কাজেই

মিত্রবাহিনীর জাহাজের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। গত কয়দিনে মাত্র তিনবার দূর দিগন্তের কাছে জাহাজের ধোঁয়ার চিহ্ন চোখে পড়েছে; ছয়বার ডুব দেবার আদেশ দিতে হয়েছে তাঁকে, তবে সেগুলো শ্যালো প্র্যাকটিস ডাইভ, কোন জরুরি অবস্থা নয়।

স্কপের একঘেয়ে সময় কাটে খেয়ে, ঘুমিয়ে আর ফরোয়ার্ড টর্পেডো রুমে কাজ করে। কাজ আর কিছু না, বাক্সটাকে বার বার মোছা। তবু এটাই এখন হয়ে গেছে তাঁর ধ্যানজ্ঞান, এই অন্তহীন সাগরযাত্রার দুঃসহ স্নায়ুর চাপ কাটানোর উপায়। মাঝে মাঝে বাক্সের ডালা খুলে দেখেন। ব্রোঞ্জের গায়ে আঁকা একটা খুদে স্বস্তিকার নীচের রিলিজ বাটন টিপলেই স্প্রিঙের সাহায্যে আপনাআপনি খুলে যায় ডালা। রবারের পুরু আস্তরণ দিয়ে বায়ু ও পানি নিরোধক করা হয়েছে ভিতরটা। সেই রবারের মধ্যে সূক্ষ্ম ফুটো হয়েছে কিনা কিংবা চিড় ধরেছে কিনা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করেন তিনি। সামান্যতম সম্ভাবনাও যেখানে চোখে পড়ে, সেখানে গ্রিজ মাখিয়ে দেন।

সমুদ্রযাত্রার চার সপ্তাহ পর এক সন্ধ্যাবেলা স্কপকে কন্ট্রোল রুমে আসতে বললেন কেম্ফ্। পেরিস্কোপের উইঙে ঝোলানো তাঁর দুই হাত, আইপিসে চোখ, ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ ঘোরাচ্ছেন পেরিস্কোপটা। স্কপ ঢুকেছেন বুঝতে পেরে চোখ না সরিয়েই বললেন, 'এই মুহূর্তটারই অপেক্ষা করছিলাম, হের ডক্টর। সাগর শান্ত, বৃষ্টি পড়ছে। ইচ্ছে করলে ওপরে গিয়ে শাওয়ার নিতে পারেন।' আইপিস থেকে মুখ তুলে ফিরে তাকিয়ে হাসলেন। 'প্রথম শিফটেই যান।'

এক মাসের বেশি হয়েছে, গোসল, শেভ, দাঁত ব্রাশ কিছুই করতে পারেননি স্কপ। জাহাজের মেশিন প্রতিদিন মাত্র কয়েক গ্যালন নোনা পানিকে মিষ্টি পানিতে রূপান্তরিত করতে পারে, সেই পানি প্রধানত ব্যবহার হয় রান্না আর ইঞ্জিনের ব্যাটারিতে। বৃষ্টির

মিষ্টি পানিতে গায়ের চামড়া ধোয়ার কথা শুনে উদ্বেলিত হলো মন, জিজ্ঞেস করলেন, 'নিরাপদ?'

'বিপদের তো কিছু দেখছি না। বাহামা থেকে প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার দূরে রয়েছি, এত দক্ষিণে এ সময়ে জাহাজ আসার কথা নয়–নেহাত কপাল খারাপ না হলে।' আইপিসে চোখ রাখলেন আবার কেম্ফ্। 'গভীরতা কত, চিফ?'

'তল পাচ্ছি না, হের ক্যাপিটান,' জবাব দিল কন্ট্রোলে বসা একজন সেইলর।

'তল নেই?' অবাক হলেন স্কপ। 'সমুদ্রের তল থাকে না কীভাবে?'

'এটা আমাদের সাবমেরিনের ভাষা,' কেম্ফ্ জানালেন। 'এতই গভীর, আমাদের ফ্যাদোমিটারে ফিরতি সঙ্কেত আসে না। নিশ্চয় এই মুহূর্তে মাঝসাগরের কোন গভীর খাদের ওপর রয়েছি আমরা...তিন মাইল, পাঁচ মাইল...কে জানে, কত গভীর খাদটা। কোথাও বাড়ি খাচ্ছে না ফ্যাদোমিটারের পাঠানো সঙ্কেত।'

কনিং টাওয়ারের হ্যাচ খুলল একজন নাবিক। বাইরের তাজা হাওয়া ঢুকল ভিতরে। স্কপের মনে হলো ভায়োলেট ফুলের সুবাস। মইয়ের গোড়ায় দাঁড়ানো তিনি। হাতে এক টুকরো সাবান। ওপর থেকে চোখে-মুখে এসে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা।

মইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে দুরবিন দিয়ে দিগন্ত দেখল একজন ক্রুম্যান। 'অল ক্লিয়ার!' বলে নেমে এল ও।

মই বেয়ে ব্রিজে উঠে গেলেন স্কপ। ব্রিজের কিনারে পা রাখলেন। আরেকটা মই বেয়ে নেমে এলেন ডেকে। তাঁকে অনুসরণ করে আফটারডেকে জড় হলো চারজন নাবিক। পুরো উলঙ্গ ওরা, হাতে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাবানের টুকরোটা।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তবে ঝোড়ো বাতাস না থাকাতে গায়ে বিঁধছে না। সাগরের ঢেউ দোলনায় দোলানোর মত করে দোলাচ্ছে সাবমেরিনটাকে। তবে সেটা এতই কম যে, জাহাজে

অনভ্যস্থ স্কপের মত মানুষেরও ডেকে হাঁটতে অসুবিধে হলো না। সামনের সমতল জায়গায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। কাপড় খুলে ডেকে ছড়িয়ে দিলেন, আশা, বৃষ্টিতে ধুয়ে সাফ হয়ে যাবে দীর্ঘদিনের লেগে থাকা ঘাম ও ময়লার দুর্গন্ধ। গায়ে ইচ্ছেমত সাবান মাখতে লাগলেন তিনি।

'হের ডক্টর!'

চিৎকার শুনে ফিরে তাকালেন স্কপ। মই বেয়ে হুড়াহুড়ি করে আফটারডেক থেকে ব্রিজে উঠছে চারজন নাবিক।

'প্লেন! জলদি চলে আসুন!' ওপর দিকে দেখাল মইয়ের গোড়ায় থাকা সর্বশেষ নাবিকটি, তারপর সে-ও মই বেয়ে ব্রিজে উঠতে লাগল।

'কী?' নিজের কণ্ঠকে ছাপিয়ে স্কপের কানে ঢুকল প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ। নাবিকদের নির্দেশিত দিকে তাকালেন। এক মুহূর্ত কিছুই দেখলেন না। তারপর পশ্চিমা মেঘস্তরের ধূসর পটভূমিতে কালো একটা দাগমত চোখে পড়ল, ঢেউয়ের প্রায় মাথা ছুঁয়ে এদিকেই উড়ে আসছে।

খাবলা দিয়ে নিজের কাপড়গুলো তুলে নিয়ে মইয়ের দিকে ছুটলেন তিনি। পা লাগল মসৃণ ডেকে বেরিয়ে থাকা কীসে যেন, হোঁচট খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন ডেকের উপর। হাত থেকে ছুটে গেল কাপড়গুলো।

এগিয়ে আসছে ইঞ্জিনের শব্দ। গুঞ্জনের মত শব্দটা এখন বেড়ে গর্জনে রূপ নিয়েছে।

স্কপের আহত পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে তীক্ষ্ণ ব্যথা উঠে এল উপর দিকে। কাপড় তোলার সময় নেই আর, নিজেকে টেনে তুললেন কোনমতে। ফিরে তাকালেন, কীসে হোঁচট খেয়েছেন দেখার জন্য। ফরোয়ার্ড হ্যাচের ঠিক পিছনে ঝালাই করা একটা ইস্পাতের ডেকপ্লেটের কানা বেরিয়ে আছে, ঝালাইটা হয়তো ঠিকমত করা হয়নি, কিংবা পানির চাপে ছুটে গেছে।

মই বেয়ে উঠতে শুরু করলেন তিনি।

ইঞ্জিনের শব্দ এখন কানফাটা, স্কপের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটা। তাকিয়েই আছেন তিনি। কিছুদূর গিয়ে বাঁক নিয়ে ঘুরতে শুরু করল ওটা।

ব্রিজ থেকে ঝুঁকে স্কপের দিকে তাকিয়ে আছে একজন নাবিক। হাত নেড়ে তাড়াতাড়ি নামার জন্য তাগাদা দিতে লাগল তাঁকে।

জাহাজের খোলের ভিতর থেকে আসা ভেঁপুর শব্দ কানে এল তাঁর। ইমার্জেন্সি ডাইভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সাবমেরিন। ব্রিজের কিনার থেকে হ্যাচের ভিতরের মইয়ে যখন পা রাখলেন তিনি, চালু হয়ে গেছে জাহাজের ইঞ্জিন, থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করেছে ধাতব দেহটা, সামনে এগোতে শুরু করেছে, যে-কোনও মুহূর্তে ডুবে যাবে।

ঝনঝন করে বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচের ঢাকনা, তাঁর পাশ কাটিয়ে মইয়ের দুই পাশ ধরে প্রায় পিছলে নেমে গেল নাবিকেরা। সবার শেষে নীচে নামলেন স্কপ। উলঙ্গ, চামড়া বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানি মিশানো সাবানের ফেনা।

পেরিস্কোপে ঝুঁকে রয়েছেন কেম্ফ্। 'প্লাগ লাগান, চিফ,' আদেশ শোনা গেল তাঁর, 'ডুব দেব আমরা।'

স্কপ বলতে গেলেন, 'ডেকে একটা...'

'পেরিস্কোপ ডেপ্থ্,' চিফ জানালেন। 'ই মোটর হাফ স্পিড।'

এক মোচড়ে পেরিস্কোপ নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিলেন কেম্ফ্। মুখ খারাপ করে গালি দিলেন। 'ফিরে আসছে হারামজাদা!'

'আমাদের গুলি করবে না, তাই না?' স্কপ বললেন। 'আপনি বলেছিলেন...'

'এই বদমাশটা ওসব নিয়ম-নীতি মানবে বলে মনে হয় না। প্রথমবার শিওর হয়ে নিচ্ছিল সাবমেরিন কিনা। একটা ইউ-বোটকে আটলান্টিক পেরোতে দেবে না কোনমতেই ও।' চিফকে

একশো মিটার নীচে ডুব দেয়ার নির্দেশ দিলেন কেম্ফ্। পেরিস্কোপের উইং দুটো ঝটাং করে ওপরে ঠেলে দিয়ে রিট্র্যাকটর বাটন লাগিয়ে দিলেন। পিছলে নেমে এল চকচকে ইস্পাতের টিউবটা। স্কপের দিকে তাকানোর সুযোগ পেলেন এতক্ষণে। তাঁর মুখে শঙ্কার ছায়া দেখে আশ্বস্ত করতে চাইলেন, 'ভয় নেই, আমরা এখানে খড়ের গাদায় সুচের মত। তা ছাড়া রাত নামছে, আমাদের খুঁজে বের করা...

'পঞ্চাশ মিটার!' চিফ জানালেন।

'ডেকের ওপর ' স্কপ বললেন, 'একটা ইস্পাতের পাতের কানা বেরিয়ে আছে...একশো মিটারে আগে আর ডুব দিয়েছেন?'

'অসংখ্যবার।'

'পঁচাত্তর মিটার, হের ক্যাপিটান!' জানালেন চিফ।

পঁচাত্তর মিটার পানির নীচে এখন সাবমেরিনের খোলে প্রতি বর্গইঞ্চিতে পানির চাপ প্রায় একশো পাউন্ড। এর দ্বিগুণ গভীরতায়ও চাপ সহ্য করে চলতে পারে এই জাহাজ, সেভাবেই ডিজাইন করা হয়েছে। কিন্তু স্কপের রহস্যময় বাক্সটা ঢোকানোর জন্য ফরোয়ার্ড ডেকের পাত খুলতে হয়েছিল। তারপর আবার ঝালাই করে লাগানোর সময় এত তাড়াহুড়া করতে হয়েছে ওয়েল্ডারকে যে, এক জায়গায় খুঁত থেকে গেছে। শ্যালো ডাইভের সময় পানির চাপে এই খুঁতওয়ালা জায়গাটা অল্প অল্প করে ছুটে যাচ্ছিল, এখন হাজার হাজার টন পানির চাপ সইতে না পেরে পড়ে ঝালাই করা পুরো পাতটাই ছুটে গেল।

কামানের গোলা ফাটার মত শব্দ হলো সামনের দিকে, মুহূর্তে একপাশে কাত হয়ে গেল সাবমেরিন। সিট থেকে ছিটকে পড়ল মানুষগুলো। স্কপ গিয়ে ধাক্কা খেলেন মইয়ের সঙ্গে। পড়ে যাচ্ছিলেন, থাবা দিয়ে ধরে ফেললেন মইটা।

মেঝেতে রইল না আর কেম্ফের পা, তিনি আঁকড়ে ধরলেন পেরিস্কোপটা। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইমার্জেন্সি সারফেস! ওপরে তোলো! ইঞ্জিন পুরোদমে!' স্কপের দিকে তাকালেন। 'ফরোয়ার্ড হ্যাচ লাগিয়েছিলেন?'

'মনে করতে পারছি না...'

আবার কামানের গোলার মত শব্দ। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ফরোয়ার্ড হ্যাচ। তীব্র গতিতে টর্পেডো রুমের দিক থেকে ধেয়ে এল পাঁচ ফুট উঁচু আর তিন ফুট চওড়া পানির ধারা, ছুটে গেল পেটি অফিসারদের কোয়ার্টারের দিকে। ভাসিয়ে দিল রান্নাঘর আর অফিসারদের ওয়ার্ডরুম।

'নাইনটি মিটার, হের ক্যাপিটান!' চিৎকার করে জানাল একটা কণ্ঠ।

নীচে নেমে চলেছে সাবমেরিন। হঠাৎ দেহটাকে ওজনশূন্য লাগল স্কপের, অনুভূতিটা এলিভেটরের ভিতরে থাকার মত।

জোরাল ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শোনা গেল; একটা পাইপ বিস্ফোরিত হলো কোথাও; তীব্র হিসহিস শব্দে বাষ্প বেরোতে লাগল। প্রথমে ঘাম, তারপর প্রস্রাব, আর সবশেষে তেল ও মলের দুর্গন্ধে ভরে যেতে থাকল কন্ট্রোলরুম।

দুশো মিটার নীচে আবার কামানের গোলা ফাটার মত শব্দ।

অন্ধকার। চিৎকার। কান্না।

মৃত্যুর এক মুহূর্ত আগে একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন হেনরিখ স্কপ, টর্পেডো রুমের দিকে, যেন ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে তাঁর বাড়ানো হাতের আঙুলগুলো।

চার

দ্রুত ডুবছে সাবমেরিন। সামনের গলুই নীচের দিকে। খাড়া নেমে এলো হাজার ফুট। খোলের চাপ সহ্যক্ষমতার সীমা ছাড়াল। একসঙ্গে ছিঁড়ে, ছুটে গেল ডজনখানেক ইস্পাতের প্লেট। বড় বড় ফোকর দিয়ে তীব্র গতিতে বাতাস বেরোচ্ছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে জাহাজের দেহ, দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, ভয়ানক মৃত্যুযন্ত্রণায় যেন খাবি খাচ্ছে বিশাল এক সামুদ্রিক প্রাণী। ধ্বংস হয়ে গেল যত্ন করে তৈরি ভারসাম্যব্যবস্থা, ঝরা পাতার মত দুলে দুলে নামছে।

দু'হাজার ফুট পেরিয়ে এল। পাঁচ হাজার ফুট। যতই নামছে, বাড়ছে খোলের গায়ে পানির চাপ। ভিতরে আটকে থাকা বাতাসের ছোট ছোট বুদবুদকে ফাটিয়ে দিচ্ছে আঙুলে টিপে আঙুর ফাটানোর মত করে। দশ হাজার ফুট নীচে প্রতি মিলিমিটার ইস্পাতের গায়ে পানির চাপ পড়ল দুই টন। অবশিষ্ট বাতাস অন্ধকার পানিতে ভুড়ভুড়ি তুলে উঠে যেতে লাগল ওপর দিকে।

সোডার ক্যানের মত ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে এসে সাগরতলের ডুবোপাহাড়ের ঢালে ধাক্কা খেল প্রথমে সাবমেরিনটা, কাদামাটির মেঘ ছড়িয়ে ধীরগতিতে গড়িয়ে পড়তে লাগল ঢাল বেয়ে, বড় বড় পাথর খসিয়ে নিয়ে চলল নিজের সঙ্গে অন্ধকার গিরিখাতের দিকে। অবশেষে থামল পতন। মোচড় খেয়ে বাঁকা হয়ে গেছে ইস্পাতের দেহটা।

গলুইয়ের কাছে টর্পেডো রুমে অবিকৃত রইল ব্রোঞ্জের তৈরি বড়

বাক্সটা। সাবমেরিনের চেয়েও অনেক অনেক বেশি চাপ সইবার ক্ষমতা আছে ওটার। পুরু রবারের আচ্ছাদনের ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেল না সাগরের পানি।

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেল কাদার ধোঁয়া। শান্তি ফিরে এল অন্ধকার অতল গহ্বরে। কোটি কোটি খুদে জলজ প্রাণী টহল দিয়ে বেড়ায় এখানেও। এ খাচ্ছে ওকে, ও খাচ্ছে তাকে–জীবনচক্রের স্বাভাবিক নির্মম খেলা চলতে থাকল তার নির্ধারিত, নিয়মিত ছন্দে।

পাঁচ

২০০৭ সাল।
২৬ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ।
৪৫ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ।

ভূপৃষ্ঠে সম্পূর্ণ অন্ধকার জায়গা পাওয়া কঠিন। অমাবস্যার মেঘলা রাতে সমস্ত তারা যখন ঢাকা পড়ে যায়, কিছুটা আলোর আভাস থেকে যায় তখনও।

কিন্তু সাগর গভীরে সবখানেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। পানিতে আধ মাইলও প্রবেশ করতে পারে না সূর্যের আলো। সাগরতলের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, বিশাল গিরিখাত, হিমালয়ের মত বড় বড় পর্বতমালার পাদদেশ–সবই থাকে অন্ধকারের কালো চাদরে ঢাকা। এখানে ওখানে মিটমিট করে করে জ্বলে জলজ প্রাণীর দেহনিঃসৃত বৈদ্যুতিক আলো, কিন্তু তাতে গভীর এই অন্ধকারের

কোনই পরিবর্তন হয় না।

এ রকমই একটা অন্ধকার জায়গায় বিশাল দুটো কাঁকড়ার মত পাশাপাশি ভেসে রয়েছে দুটো সাবমার্সিবল, সাদা রঙের শরীর, চোখা নাকের দুই পাশে গর্তের ভিতর বসানো দুটো পাঁচ হাজার ওয়াটের লাইটকে দেখাচ্ছে জ্বলন্ত চোখের মত।

'চার হাজার মিটার,' রেডিওতে জানাল একটা সাবমার্সিবলের পাইলট। 'নাক বরাবর সামনেই রয়েছে গিরিখাতটা। আমি নামছি।'

'ঠিক আছে,' দ্বিতীয় সাবমার্সিবলের পাইলট জবাব দিল। 'এগোও। আমি তোমার পিছনেই আছি।'

গিয়ার দিতেই ঘুরতে আরম্ভ করল বৈদ্যুতিক মোটরে চলা প্রপেলারগুলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সামনের সাবমার্সিবল।

দশ ফুট লম্বা, ছয় ফুট চওড়া ইস্পাতের ক্যাপসুলের মত জিনিসটার ভিতরে পাইলটের পাশে আধশোয়া হয়ে বসে আছে মিগুয়েল জিমেনিজ। ওর মুখটা সেঁটে আছে পুরু কাঁচের তৈরি ছয়ইঞ্চি পোর্টহোলে। বালি ও পাথরে ঢাকা পাহাড়ের খাড়া ঢালের খুব সামান্য অংশই চোখে পড়ছে সাবমার্সিবলের শক্তিশালী ল্যাম্পের আলোয়, ওপরে অসীম কালো শূন্যতা, নীচেও তা-ই।

চার হাজার মিটার–জিমেনিজ ভাবছে–প্রায় তেরো হাজার ফুট, অর্থাৎ প্রায় আড়াই মাইল পানির নীচে রয়েছে ওরা। ওপরের পানির চাপ, চারপাশের চাপ, সব মিলিয়ে কতটা? ক্যালকুলেটর ছাড়া হিসেব করা কঠিন। তবে এটুকু অনুমান করতে পারছে, বাইরে বেরোলে এই চাপ মুহূর্তে তাকে বুদবুদের মত ফাটিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

ভেবো না এ সব কথা, নিজেকে বোঝাল ও। ভাবলে পাগল হয়ে যেতে হবে। মাথা খারাপ করার সময় কিংবা জায়গা নয় এটা। কাজ করতে হবে। টাকাটা ওর খুব দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সেরে এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

ওপর থেকে এক ফোঁটা পানি পড়ল ঘাড়ে। ভীষণ চমকে উঠল ও।

ফিরে তাকিয়ে হাসল পাইলট। 'ভয় লাগছে?'

'ঘাড়ে এ রকম পানি পড়ে আগে বলনি কেন?'

'সাবমার্সিবলে করে যাদের আনি, তাদের ভয় দেখাতে ভাল লাগে আমার।'

'স্যাডিস্ট!' মুখ গোমড়া করে জবাব দিল জিমেনিজ। 'তোমার জরিমানা হওয়া দরকার,' রসিকতা করে ভয় কাটানোর চেষ্টা করল জিমেনিজ। হাত দিয়ে ঘাড়ের পানি মুছল। সাগরের ওপরে তাপমাত্রা পঁচাশি ডিগ্রি, উলের পুলওভার, উলের মোজা আর মোটা সুতিকাপড়ের ট্রাউজার পরে দরদর করে ঘামছিল। কিন্তু গত তিন ঘণ্টায় তাপমাত্রা নেমে এসেছে পঞ্চাশ ডিগ্রির বেশি। গরম কাপড়ও এখন ঠাণ্ডা ঠেকাতে পারছে না। তবুও ঘামছে, তবে সেটা গরমে নয়, ভয়ে।

'বাইরে তাপমাত্রা কত এখানে?' জিজ্ঞেস করল ও। জানার কৌতূহলে নয়, কথা বলে অন্য দিকে মন সরাতে চাইছে।

'তিরিশ-বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট,' পাইলট জানাল।

পোর্টহোলের দিকে ফিরল জিমেনিজ। সাবমার্সিবলের গায়ে বল্টু দিয়ে আটকানো মুভেবল হাউজিঙে বসানো চারটে ক্যামেরার একটার কন্ট্রোলে হাত রাখল। একটা গিরিখাতের পাশ দিয়ে চলেছে সাবমার্সিবল। জিমেনিজের কাছে মনে হলো চন্দ্রপৃষ্ঠের চেয়ে খারাপ। নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মনকে বার বার বোঝাতে থাকল, পৃথিবীতে সে-ই প্রথম ফটোগ্রাফার, যে সাগরের এত গভীরে নেমে এইসব দৃশ্যের ছবি তুলছে।

'এখানেও প্রাণী আছে, বিশ্বাস করা কঠিন!' বিড়বিড় করল জিমেনিজ।

'হ্যাঁ, সাগরতলে এমনসব প্রাণী আছে, যা আগে কখনও দেখনি। সাদা রঙের প্রাণী আছে, চোখ নেই—এই অন্ধকারে চোখ

থেকেই বা লাভটা কী? কাঁচের মত স্বচ্ছ প্রাণী আছে, দেহের ভিতরের সমস্ত যন্ত্রপাতি দেখা যায়। যেখানেই যাও, কিছু না কিছু থাকবেই; অবশ্যই অতল তল অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট নীচের কথা বলছি না। ওখানে কী আছে খোদাই জানে! অত নীচে নামিনি কখনও। তবে এই জায়গাটাতে প্রচুর প্রাণী আছে। ওপরের কিছু কিছু প্রাণীর উৎপত্তি এখানে, ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে যদি প্রমাণ করে দিতে পারি সেটা, কী রকম হই-চই ফেলে দিতে পারব, ভাবো।'

'হ্যাঁ,' জিমেনিজ জবাব দিল, 'বিজ্ঞানীরা এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন কি জানো? কেমোসিনথেসিস।'

কেমোসিনথেসিসঃ আলোকহীন প্রাণী, যাদের সৃষ্টি শুধু রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে। বিস্ময়কর, এক বৈপ্লবিক গবেষণার দুয়ার খুলে যাবে, যদি এর ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারে ও। কেমোসিনথেসিস যে সম্ভব, সেটার তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করতেই সাগরের এত গভীরে নেমেছে ওরা। এটা ওর অ্যাসাইনমেন্ট, একজন ফটোগ্রাফারের স্বপ্ন। ফ্রি লান্সার ফটোগ্রাফার ও। অ্যাজোরসের পশ্চিমে এই মিড আটলান্টিক রিজের তলায় ক্রিস্টফ ট্রেঞ্চ থেকে জীবজগতের ছবি তুলে নিয়ে যাওয়ার চুক্তি করেছে ও ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার সঙ্গে।

অসংখ্য ভেন্ট দেখা গেল এখানে। এ সব ফোকর দিয়ে পৃথিবীর পেটের ভিতর থেকে বরফশীতল পানিতে যেন বমির মত বেরিয়ে আসছে গলিত পাথর। ভেন্টগুলোকে একেকটা খুদে আগ্নেয়গিরি বললে ভুল হবে না। বিজ্ঞানীদের ধারণা ওগুলো থেকে বেরোনো রাসায়নিক পদার্থের ওপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছে এখানকার প্রাণিজগৎ; অন্য কথায়, কেমোসিনথেসিস। রাসায়নিক পদ্ধতিতে জন্ম হয়েছে এখানকার জীবকূলের, সূর্যের আলো কী জিনিস ওরা জানে না; দেখেনি কখনও, সূর্যের আলোর বাইরেই জন্মেছে ওরা, বেঁচেও রয়েছে।

এই অ্যাসাইনমেন্টের জন্য জিমেনিজকে বাছাই করা হয়েছে কয়েকটা কারণে: ওর তারুণ্য, ওর দুঃসাহস ও বেপরোয়া স্বভাব; এবং অসাধারণ ক্যামেরা-জ্ঞান। আর কাজটা নিয়েছে ও প্রধানত আবিষ্কারের নেশায়, সাগরতলে সত্যি সত্যি এ রকম একটা ঘটনা ঘটছে সেটা প্রথম দেখার, দেখে রোমাঞ্চিত হওয়ার, প্রমাণ করার সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে জোটে। সেই সঙ্গে টাকা তো পাচ্ছেই। এতবড় একটা নামকরা ম্যাগাজিনে লেখাটাও কম কীসে।

গত পনেরো বছরে তিনবার প্লেনক্র্যাশে পড়েও বেঁচে গেছে ও, রক্ষা পেয়েছে আহত সিংহীর আক্রমণ থেকে, হাঙর আর মোরে ইলের কামড় খেয়েও মরেনি, মারা যায়নি কাঁকড়াবিছের বিষে। উদ্ভট পরজীবী আর অ্যামিবার আক্রমণের শিকার হয়েও বেঁচে গেছে–তবে একবার সাময়িকভাবে চুলসহ শরীরের সমস্ত লোম খসে গিয়েছিল, আরেকবার জিভ ও শরীরের অন্যান্য নরম জায়গার ছাল উঠে গিয়েছিল। উহ্, সে কী কষ্ট!

প্রকৃতির ছুঁড়ে দেয়া নানারকম চমকে অভ্যস্ত ও, সমস্ত বিপদ-আপদকে যেন কাঁচকলা দেখিয়ে টিকে রয়েছে এখনও।

কিন্তু গত কয়েক ঘণ্টায় যা ঘটে গেল, এটা ওর কল্পনারও বাইরে, ধারণারও অতীত। ভয় পেয়েছে ও, প্রচণ্ড ভয়।

গভীর সাগরতলে অন্ধের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর জীবন নির্ভর করছে অতি খুদে এই সাবমার্সিবল নামের সাবমেরিনটার পাইলটের দক্ষতার ওপর। ধাতব এই ক্যাপসুলের মত যন্ত্রটাও কতখানি নির্ভরযোগ্য কে জানে! হয়তো কম পয়সা খরচ করে সস্তাদরের মেকানিক দিয়ে ঝালাই করা হয়েছে এর ইস্পাতের পাতগুলো। পানির চাপ সইতে না পেরে কোনও একটা পাত খুলে এলে, কিংবা কোন কারণে ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেলে...আর ভাবতে চাইল না জিমেনিজ। অসুস্থ বোধ করছে। দম আটকানো, কোণঠাসা এ রকম বন্দি অবস্থায় কখনও পড়েনি।

ইস্ কেন যে ওর গার্লফ্রেন্ডের কথা শোনেনি, আফসোস

হচ্ছে এখন। একসঙ্গে দুটো অ্যাসাইনমেন্টের প্রস্তাব এসেছিল। দ্বিতীয় অ্যাসাইনমেন্টটা নিতে বলেছিল ও। ওটা ছিল, কোরাল সাগরে বিষাক্ত সী-স্নেকের ক্লোজআপ ছবি তোলা। ওই কাজটাতেও বিপদ আছে। তবে ওখানে অন্তত বেকায়দায় পড়লে পানি থেকে উঠে পালিয়ে বাঁচার একটা সুযোগ ছিল।

কিন্তু না, ওর কাছে এখনকার কাজটাই ভাল মনে হয়েছিল। গৌরবের কাজ! মহা আবিষ্কার! পৃথিবীবাসী চিনে ফেলবে ওকে! এ সব বড় বড় কথা বলেছে। নিজের ওপরই রাগ লাগছে এখন।

'আর কতক্ষণ?' গলা চড়িয়ে পাইলটকে জিজ্ঞেস করল ও। জোরে কথা বলে নিজের হৃৎপিণ্ডের অস্বস্তিকর শব্দকে চাপা দিতে চায়।

'ধোঁয়ার কারখানাগুলোর কাছে যেতে?' স্বভাবসুলভ নাটকীয় ভঙ্গিতে জবাব দিল পাইলট। 'বেশিক্ষণ না।' সামনের প্যানেলের একটা গেইজে টোকা দিল পাইলট। 'পানির তাপমাত্রা বাড়ছে। ওগুলোর কাছে চলে এসেছি আমরা।'

ডুবো পাহাড়ের গা থেকে বেরোনো তীক্ষ্ণ একটা পাথরের পাশ ঘুরে এগোল সাবমার্সিবল। ঘন কালো ধোঁয়ার মধ্যে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল ওটার আলো।

'এই তো, এসে গেলাম,' পাইলট বলল। সামনে এগোনো বন্ধ করে পিছাতে শুরু করল। আলো আবার পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত পিছাল।

সামনে ঝুঁকে ক্যামেরা কন্ট্রোল চেপে ধরল জিমেনিজ। 'ফিলকে বলে দেখো, ঘুরে ওপাশে আসতে পারে কি না। আমি ওকে ফ্রেমে পেতে চাই।'

মাইক্রোফোনে কথা বলল পাইলট। কালো মেঘের ভিতর থেকে ভুতুড়ে ছায়ার মত বেরিয়ে এল অন্য সাবমার্সিবলটা।

এই দূরত্ব থেকে ভেন্টটাকে খুব সাংঘাতিক কিছু মনে হচ্ছে না: কালো পানিতে কালো ধোঁয়া, মাঝে মাঝে কমলা-লাল

আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে গর্তের মুখে। আগ্নেয়গিরির অতি সাধারণ দৃশ্য। কিন্তু এখানে যা যা আছে, সব চায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, যত সাধারণই হোক না কেন। তাই ছবি তুলতে আরম্ভ করল জিমেনিজ।

প্রতিটি ক্যামেরায় ৩৫ মিমি ফিল্মের একশোটা করে ফ্রেম লোড করা আছে, ঘন ঘন ঝিলিক দিতে শুরু করল ফ্ল্যাশারের আলো। ওদিকে ভেন্টের মুখের কাছে ধীরে ধীরে অন্য সাবমার্সিবলটাকে নিয়ে আসছে ওটার পাইলট।

কাজ শুরু করতেই অস্বস্তি চলে গেল জিমেনিজের। ছবি তোলার দিকেই মনোযোগ। দূর হয়ে গেছে ভয়ের ভাবনাগুলো। অন্য সারমার্সিবলটার আলোর উজ্জ্বলতা যাতে ছবির ক্ষতি করতে না পারে সে-ব্যাপারে সতর্ক রইল।

কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেছে তার। এখন আর শীত করছে না। বরং গরম লাগছে।

'তাপমাত্রা কত এখানে?' কাজের ফাঁকে জিজ্ঞেস করল ও।

'প্রায় দুশো ডিগ্রি ফারেনহাইট,' পাইলট জানাল। 'স্টোভের মত উত্তাপ ছড়াচ্ছে ওই ভেন্ট, আশপাশের সবকিছুকে গরম করে রেখেছে।'

আচমকা কী যেন এসে বাড়ি খেল জিমেনিজের সামনের পোর্টহোলে—কোনও একটা প্রাণীই হবে, পিছলে গিয়ে পড়ল ধোঁয়ার মেঘের ভিতরে। চমকে গেল ও। আপনাআপনি পিছন দিকে ঝাঁকি খেল শরীর। 'কী ওটা?' এত দ্রুত ঘটে গেছে ঘটনাটা, আর চোখের এতটাই সামনে, ভালমত নজরে আসেনি। শুধু সাদা রঙের একটা অস্পষ্ট ঝিলিমিলির মত দেখেছে।

'অপেক্ষা করো,' সাবধান করল পাইলট, 'এত তাড়াতাড়ি সব ফিল্ম খরচ করে ফেলো না। দেখার অনেক কিছু পাবে এখানে, বোঝাই যাচ্ছে। হয়তো এমন প্রাণীর দেখা পেয়ে যাব, যেটা আমরাই প্রথম দেখব, আগে কেউ দেখেনি।'

ভেন্টের মুখের দিকে এগোনো শুরু করল ওরা। শুধু রাসায়নিক পদার্থে তৈরি প্রাণী যদি সত্যি থেকে থাকে, এখানেই খাবারের সন্ধানে আসবে ওরা, এই ধোঁয়ায় ঢাকা পানিতে ছড়ানো তরল লাভার মধ্যে। ভারি গুড়ুগুড়ু শব্দ শোনা যাচ্ছে, একটানা সেই শব্দকে পানিতে বাজনার মত লাগছে। পাহাড়ের গায়ের ফাটল দিয়ে কমলা-লাল আভা বেরিয়ে আসছে তরল লাভার সঙ্গে।

সামনে দিয়ে ছুটে গেল একটা প্রাণী। তারপর আরেকটা। তারপর আরও একটা। সাবমার্সিবলটা যখন এসে থামল জমাট লাভার একটা ছোট মালভূমির ওপর, ওই প্রাণীদের যেন মহোৎসব লেগে গেল। কোটি কোটি চিংড়ি সদৃশ প্রাণী। সাধারণ চিংড়ির তুলনায় অনেক বড়, ছাই রঙ, চোখবিহীন। দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। একটা পাহাড় সৃষ্টি করে রেখেছে যেন প্রাণীগুলো, নাড়ির গতির মত নিয়মিত ছন্দে কাঁপছে সেই জ্যান্ত পাহাড়টা।

'ওহ্, গড!' তাক লেগে গেছে জিমিনিজের। 'কী করছে ওরা?'

'খাচ্ছে,' জবাব দিল পাইলট, 'ওই ধোঁয়ার মধ্যেই আছে ওদের খাবার।'

'দু'শো ডিগ্রি গরম পানিতে চিংড়ি বাঁচে?'

'তাই তো দেখা যাচ্ছে। এখানেই জন্মায়, এখানেই জীবন কাটায়, এখানেই মরে।'

মাঝে মাঝে ভেন্টের মধ্যে পড়ে যায় কোন কোনটা, সাতশো ডিগ্রি গরমে সিদ্ধ হয়ে হাঁড়ি-কাবাব হয়।

এখানে ডজনখানেক শট নিল জিমেনিজ।

ধীরে ধীরে সাবমার্সিবলটাকে আগে বাড়াল পাইলট। ঘন হয়ে থাকা চিংড়ির দঙ্গলকে ঠেলে সরাল।

ভেন্টের মুখ ঘিরে, নরম লাভায় শিকড় গেড়ে দুলছে ছয় থেকে আট ফুট লম্বা লতার মত জিনিস, মাথায় ফুটে আছে হলুদ আর লাল রঙের পাপড়ি। মানুষের আঙুলের সমান লম্বা। দেখে

উদ্ভিদ বলেই মনে হয়, যেন নরকের বাগান সাজিয়ে রেখেছে। ধোঁয়া বেরোনোর তালে তালে বৃন্তর ভিতরে ঢুকছে-বেরোচ্ছে বিচিত্র আঙুলগুলো।

'ওগুলো কী জিনিস?' জিমেনিজ জিজ্ঞেস করল।

'আমার মনে হয় কোনও ধরনের টিউব ওয়ার্ম। নিজের দেহে তৈরি খনিজ পদার্থ—সম্ভবত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে লম্বা লম্বা বাড়ি বানিয়ে তার মধ্যে ঢুকে বসে আছে বিশাল ওই কৃমিগুলো, ফুলের পাপড়ির মত মাথাটা বাইরে বের করে রেখেছে শিকার ধরার জন্যে। দেখাই যাক।' একটা কন্ট্রোল লিভারে চাপ দিল পাইলট। সাবমার্সিবলের একটা যান্ত্রিক বাহু লম্বা হয়ে কাছের একটা বৃন্তের দিকে এগোল। বাহুর মাথায় লাগানো ইস্পাতের আঙুলের অস্তিত্ব টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফের মত জমে গেল যেন বৃন্তের পাপড়ি, স্পর্শ করার ঠিক আগের মুহূর্তে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল টিউবের ভিতর। পাইলট জিজ্ঞেস করল, 'কী, ছবি নিতে পারলে?'

'সাংঘাতিক দ্রুত,' জিমেনিজ জবাব দিল। 'আবার চেষ্টা করি। শাটার স্পীড দুই হাজার করে দিয়ে।'

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। তিনশোর বেশি শট নিয়ে ফেলেছে জিমেনিজ। চিংড়ি ও টিউব ওয়ার্মের ক্লোজ-আপ, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, আর অন্য সাবমার্সিবলটাকে দৃষ্টিসীমায় রেখে অসংখ্য ছবি। ওর ধারণা, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-মানের অন্তত গোটা বিশেক ছবি পেয়ে গেছে। ও জানে না, ওর তোলা এসব ছবি কেমোসিনথেটিক প্রাণীর অস্তিত্ব প্রমাণ করবে, নাকি শুধু সমুদ্রের আড়াই মাইল নীচে দুশো ডিগ্রি তাপমাত্রায় অন্ধ চিংড়িরা বাস করে এটুকুই বোঝাবে।

মূল্যবান কিছু নমুনাও জোগাড় করেছে। সাবমার্সিবলের পাইলটকে দিয়ে যান্ত্রিক বাহুর সাহায্যে আধ ডজন চিংড়ি আর

গোটা দুই টিউব ওয়ার্ম তুলে নিয়েছে। সেগুলো রাখা হয়েছে বোটের বাইরে লাগানো কালেকটিং বাস্কেটে। মাদার শিপে গিয়ে ম্যাক্রো লেন্সের সাহায্যে ক্লোজ-শট নেবে ওগুলোর।

'হয়েছে,' পাইলটকে বলল ও। 'চলো, ফিরি।'

'সত্যি হয়েছে তো? কিছু বাকি থাকলে কিন্তু ঝামেলায় পড়বে। আরও পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ করে আবার তোমাকে এখানে ছবি নিতে পাঠাবে না তোমার বস। আর পাঠালেও তোমার পাওনা থেকে কাটবে।'

সামান্য দ্বিধা করে জবাব দিল জিমেনিজ, 'না, হয়েছে।' যা যা চোখে পড়েছে, কিছুই বাদ রাখেনি, সবকিছুর ছবি তুলেছে। তারমধ্যে কিছু শট যে খুবই উন্নতমানের, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ক্যামেরা সম্পর্কে ওর জ্ঞানকে অসাধারণ বললে কম বলা হবে, বরং বলা উচিত যন্ত্রটা ওর মগজেরই একটা অংশ। যতগুলো ছবি তুলেছে, সব মনের পর্দায় গাঁথা হয়ে গেছে। ভিডিওচিত্রের মত ফিরিয়ে এনে কল্পনার পর্দায় দেখল আরেকবার সেগুলো। খুবই ভাল হয়েছে কিছু ছবি, সন্দেহ নেই আর।

রেডিওতে অন্য সাবমার্সিবলটার পাইলটকে জানাল প্রথমটার পাইলট, 'ফিল, আমরা ফিরে যাব এবার।'

পাইলট বোটের মুখ ঘোরাতেই আলোর সীমানার প্রান্তে অস্বাভাবিক একটা জিনিস চোখে পড়ল জিমেনিজের। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। পাইলটকে আলো সরিয়ে দেখতে বলল। মিহি বালিতে দলামোচড়া হয়ে পড়ে আছে কালো রঙের কিছু ধাতব বস্তু। চেনার উপায় নেই। কিছু জিনিস চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, কিছু ছেঁড়া, দুমড়ানো-মোচড়ানো।

'জঞ্জাল,' জিমেনিজ বলল।

'হ্যাঁ। কিন্তু কীসের?' রেডিওতে অন্য সাবমার্সিবলটাকে নিজের অবস্থান জানাল পাইলট। নিজের বোটটাকে নামিয়ে এনে বালির ওপর রাখল।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে ধাতব জিনিসগুলো। পরিষ্কারভাবে দেখার জন্য পুরো দশ হাজার ওয়াট আলোকরশ্মি একটার ওপর আরেকটা ফেলে এক ফুট এক ফুট করে সরাতে লাগল। ধাতব জিনিসগুলোর প্রতিটি অংশ পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। যেন জটিল ধাঁধার জবাব খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

জিমেনিজ কোন সহযোগিতার চেষ্টা করল না, জানে কিছু করার ক্ষমতা নেই ওর। ও একজন ফটোগ্রাফার, ইঞ্জিনিয়ার নয়। পড়ে থাকা জিনিসগুলোকে বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিন, কিংবা চাকা-চালিত পুরনো আমলের স্টিমার, অথবা পুরনো বিমানের ধ্বংসাবশেষ বলে মনে হলো ওর।

কাজ নেই, তাই অলস মস্তিষ্কে আগের ভয়টা আবার ফিরে এল ওর। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা হলো খুদে এই ক্যাপসুলটায় বন্দি হয়ে আছে। ভেসে উঠতে কমপক্ষে আরও তিন ঘণ্টা। প্রচণ্ড শীত লাগছে, সেই সঙ্গে খিদে। যে পরিমাণ চাপ যাচ্ছে স্নায়ুর ওপর দিয়ে, বিশ্রামটা এখন জরুরি। এখানে আর একটা মুহূর্তও থাকতে রাজি নয় ও। কাজ শেষ, এখন পালাতে চায়।

'বাদ দাও তো দেখাদেখি,' বলল ও। 'চলো, যাই।'

জবাব দেবার আগে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করল পাইলট। ফিরে তাকাল জিমেনিজের দিকে। 'বেশ কিছু ফিল্ম এখনও বাকি আছে না?'

'কেন?'

'বাড়তি কামাইয়ের সুযোগটা হাতছাড়া করা উচিত হবে না তোমার।'

ছয়

দ্বিতীয় সাবমার্সিবলটার সঙ্গে যোগাযোগ করল পাইলট। ধ্বংসস্তূপের অন্যপ্রান্তে পঞ্চাশ গজ দূরে এসে দাঁড়াতে বলল। দুটো সাবমার্সিবলের বিশ হাজার ওয়াট আলোতে জায়গাটা আরও পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে।

জিমেনিজের দিকে তাকিয়ে হাসল পাইলট। 'বলো তো?'

'কী বলব?'

'কী ওটা?'

'আমি কী করে জানব?' নিজের কণ্ঠের রুক্ষতায় নিজেই অবাক জিমেনিজ। স্বর কিছুটা নরম করল। 'দেখো, আমি জমে যাচ্ছি শীতে, খিদেয় পেট জ্বলছে, সেইসঙ্গে ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। খেয়েদেয়ে বালিশে মাথা রাখতে না পারলে মরে যাব। বাড়তি টাকার দরকার নেই। চলো...'

'ওটা একটা সাবমেরিন ছিল একসময়।'

'মানে?' পোর্টহোলে নাক চেপে ধরল আবার জিমেনিজ। 'কী করে বুঝলে?'

'ওই ডাইভিং প্লেইনটা দেখে,' পাইলট বলল। 'আর ওই যে ওটা, স্নরকেল টিউব।'

'অ্যাটমিক সাবমেরিনের?'

'না। মরচে পড়েছে, তারমানে পুরনো সাবমেরিনের ইস্পাতের বডি। এত গভীরে অক্সিজেন খুব কম, তাই মরচেও পড়েছে ধীরে তা ছাড়া আধুনিক অ্যাটমিক সাবমেরিনের চেয়ে

অনেক ছোট বডি। পুরনো আমলের দুর্বল ওয়্যারিং। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জিনিস।'

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ!'

'হ্যাঁ। আরও কাছে গিয়ে দেখি।' মাইক্রোফোনে কথা বলল পাইলট। একসঙ্গে চলতে আরম্ভ করল দুটো সাবমার্সিবল। ধীরগতিতে, খুব সাবধানে, যাতে কিছুর সঙ্গে ধাক্কা না লাগে, নীচের আলগা বালি লাফিয়ে উঠে দৃষ্টিশক্তি বাধাগ্রস্ত করতে না পারে।

জিমেনিজের ফিল্ম কাউন্টার শো করছে ছিয়াশিটা ফ্রেম বাকি আছে। বেছে বেছে ছবি তুলতে লাগল ও। কল্পনায় পুরো সাবমেরিনটার চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে ওটা, কোন্‌টা যে কোন্‌ জায়গার জিনিস বুঝবার উপায় নেই।

'বোটটার কোনখানে রয়েছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'মনে তো হচ্ছে পিছন দিকে,' জবাব দিল পাইলট। 'ডানে কাত হয়ে পড়েছিল সাবমেরিনটা। ওই পাইপগুলো পিছনের টরপেডো রাখার টিউব।'

সাবমেরিনের একটা ডেক গান পেরিয়ে এল সাবমার্সিবল। এখানকার দুটো ছবি তুলল জিমেনিজ।

হাঁ হয়ে থাকা একটা ফোকরের কাছে এল ওরা। কয়েক ফুট দূরে একজোড়া জুতো পড়ে থাকতে দেখা গেল। প্রায় নতুনই রয়েছে। দেখে মনে হয় যেন কোন কারণে ফেলে রেখে গেছে জুতোর মালিক, যে কোন মুহূর্তে ফিরে এসে পায়ে দেবে।

'লোকটা কই?' বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে জুতোর ছবি তুলতে তুলতে বলল জিমেনিজ। নিজের অজান্তেই গায়ে কাঁটা দিল। 'লাশটা?'

'এতকাল পরে লাশ খুঁজছ? টিউব ওয়ার্মে খেয়ে ফেলেছে নিশ্চয়।'

'পানির কৃমি হাড়ও খায় নাকি?'

'না, ওরা মাংস খেয়েছে। হাড় খেয়েছে সাগরে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা নোনা পানি হাড়ের কঙ্কালের ক্যালসিয়াম গলিয়ে ফেলে। আমি কল্পনা করতাম, সাগর ভালবাসি, মৃত্যুর পর সাগরেই আমাকে ফেলে দিতে বলব, কিন্তু এখন আর বলব না। ভয়ঙ্কর ওই কিলবিলে পোকাগুলো আমাকে কুরে কুরে খাবে, ভাবতেই গা গোলাচ্ছে।'

সাবমেরিনের গলুইয়ের দিকে এগোনোর সময় আরও কিছু পরিচিত জিনিস চোখে পড়ল ওদের। রান্নার পাত্র, একটা বাঙ্কের কাঠামো, একটা রেডিও। এগুলোর ছবি তুলল জিমেনিজ। ক্যামেরা রিঅ্যাডজাস্ট করছে, চোখের কোণে একটা ইস্পাতের প্লেটে লেখা অক্ষর চোখে পড়ল। হাত তুলে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কী?'

সাবমার্সিবল ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে সেদিকে এগোল পাইলট। পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠল, 'আরে!'

'আবার কী?'

'কনিং টাওয়ারের একটা প্লেটে ওই "ইউ" অক্ষরটা দেখো। ইউ-বোট ছিল এটা!'

'ইউ-বোট? মানে জার্মান?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এত দূর-দক্ষিণে জাহাজ রুটের বাইরে কী করছিল ওটা, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।'

বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ইউ-বোটটার ছবি নিতে লাগল জিমেনিজ।

পাইলট তখন সাবমার্সিবলটাকে নিয়ে চলেছে গলুইয়ের কাছে। ফরোয়ার্ড ডেকের কাছে পৌঁছবার পর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল ও। পানিতে চুপচাপ ভেসে রইল সাবমার্সিবল। 'ডোবার কারণও বোঝা যাচ্ছে,' ডেকপ্লেটের বিশাল ফোকরটার ওপর

আলো ফেলেছে। 'পানির চাপে ভর্তা হয়ে গেছে সাবমেরিনটা।'

ডেকপ্লেটের প্রান্তগুলো এমনভাবে বেঁকে গেছে, যেন বিশাল হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েছে কেউ।

একটা শট নিল জিমেনিজ। দরদর করে ঘামছে। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে প্রায় বাষট্টি বছর আগে এই সাবমেরিনের মানুষগুলো যখন বুঝতে পেরেছিল তারা মারা যাচ্ছে, মনের কী অবস্থা হয়েছিল তাদের! জাহাজের ফোকর দিয়ে তুমুল বেগে ঢুকে পড়া সাগরের পানির গর্জন যেন শুনতে পাচ্ছে ও। আতঙ্কিত মানুষের চিৎকার, পানিতে দম আটকে ছটফট করতে থাকা, ভয়াবহ যন্ত্রণা...আর ভাবতে চাইল না ও। বিড়বিড় করল, 'খোদা!'

গিয়ার দিল পাইলট। আগে বাড়ল সাবমার্সিবল। আরও কয়েক ইঞ্চি এগোতে গর্তের ভিতর আলো ঢুকল। মোটা রেশমি কাপড়ের আবরণে জড়ানো অসংখ্য তার ও পাইপ চোখে পড়ল। আর একটা...

'হেই!' চেঁচিয়ে উঠল জিমেনিজ।

'কী?'

'একটা কিছু আছে ওখানে। বড়...দেখতে অনেকটা...নাহ্, ঠিক চেনা যাচ্ছে না...'

সাবমার্সিবলটাকে এনে ঠিক ফোকরটার ওপর রাখল পাইলট। সামনের দিকটা নীচে ঝোঁকাল। যান্ত্রিক বাহুর মাথায় লাগানো ধাতব আঙুল ব্যবহার করে টেনে ছিঁড়ল তারগুলো, পাইপগুলো ঠেলে সরাল। দুটো লাইটকে ঘুরিয়ে এনে একসঙ্গে করে ফেলল ফোকরের ভিতরে। 'কী ওটা!'

'বাক্স,' চিনতে পারছে এখন জিমেনিজ। জিনিসটার সবজে-হলুদ গায়ের ওপর আলো নাচছে। 'বাক্স বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'কফিন!' পাইলট বলল। 'কিন্তু এত বড় কীসের কফিন? মানুষ, না দানব?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দুজনের কেউ কোন কথা বলল না। বাক্সটার দিকে তাকিয়ে আছে বিস্মিত দৃষ্টিতে। আসলেই কফিন, না অন্য কোন কিছুর বাক্স, বোঝার চেষ্টা করছে।

অবশেষে জিমেনিজ বলল, 'তুলে আনা দরকার। মূল্যবান কোন কিছু আছে ওতে। নইলে ইউ-বোটে করে নিতে চাইত না।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল পাইলট। 'কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে তুলব?' অনুমান করল, প্রায় আট ফুট লম্বা বাক্স। এক টনের কম হবে না। আমাদের এই সাবমার্সিবল দিয়ে ওটা ওপরে টেনে তোলা অসম্ভব।'

'দুটো বোটই যদি ব্যবহার করা হয়?'

'তা-ও সম্ভব না। ভার বইবার উপযোগী করে তৈরি হয়নি এ সব সাবমার্সিবল, কষ্টেসৃষ্টে হয়তো হাজার পাউন্ড তুলতে পারবে। দুটো সাবমার্সিবল দুই হাজার। ওই বাক্সটার ওজন, আমার ধারণা, দুই হাজারের অনেক বেশি...' থেমে গেল পাইলট। 'তবে এক কাজ করা যায়। আমাদের মাদার শিপে পাঁচ মাইল লম্বা ইস্পাতের তার আছে। ওটার মাথা যদি নামিয়ে দেয়, ফাঁস তৈরি করে বাক্সটাতে পরাতে পারি, হয়তো...হ্যাঁ, এটাই একমাত্র উপায়...'

একটা বোতামে টিপ দিয়ে মাইক্রোফোনে কথা বলতে আরম্ভ করল পাইলট।

মাদার শিপ থেকে তার নামিয়ে বাক্সটায় ফাঁস পরাতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল দুটো সাবমার্সিবলের। মাইক্রোফোনে ওটা তোলার যখন নির্দেশ দিল পাইলট, সাবমার্সিবলের ভিতরের বাতাস তখন বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে। বাক্সটা সাবমেরিনের খোলের ভিতর থেকে টেনে বের করে এনে ওপরে তোলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠতে শুরু করল সাবমার্সিবল দুটোও।

ভীষণ ক্লান্ত জিমেনিজ। কিন্তু বাক্সটার ভিতর কী আছে জানার

আগ্রহ আর উত্তেজনায় সেটাকে আমলে আনতে চাইল না।

'একটা জিনিস অদ্ভুত লাগেনি তোমার?' ডেপথ গেইজের দিকে তাকিয়ে আছে জিমেনিজ, এক মিটার এক মিটার করে উঠে যাচ্ছে ওরা, চলেছে, যেখানে রয়েছে পরম আকাঙ্ক্ষিত রোদ, খোলা বাতাসে তাজা অক্সিজেন।

'পুরো ব্যাপারটাই তো অদ্ভুত,' পাইলট জবাব দিল। 'বিশেষ কিছুর কথা বলছ নাকি তুমি?'

'সাবমেরিনের ওই ধ্বংসাবশেষ...সব কিছুর ওপর পলি পড়ে আছে। সব কিছুর ওপর ধূসর আস্তরণ...শুধু বাক্সটাতে ছাড়া। পরিষ্কার, ঝকঝকে। এ কারণেই এত তাড়াতাড়ি ওটা চোখে পড়েছে আমাদের।'

কাঁধ ঝাঁকাল পাইলট। 'ব্রোঞ্জের গায়ে পলি বসে না হয়তো। কী জানি!'

সাত

'নাহ্, এটা উচিত হয়নি ওদের!' জিমেনিজ বলল। 'বড় বড় পণ্ডিতরা সব...বাইরে থেকে দেখে ঘোড়ার ডিম বুঝবে ওরা। ভিতরে যা আছে, সেটাতেই রয়েছে আসল প্রশ্নের জবাব। কী ভাবে ওরা নিজেদের?'

'ওই যে বললে, ঘোড়ার ডিম!' জিমেনিজের সুরে সুর মেলাল পাইলট। 'সারাদিন বসে বসে বুড়ো আঙুল চোষে, শুধু পণ্ডিতী আর কথার কচকচানি...কষ্ট করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা এনে দিয়েছি বাক্সটা, এখন আসছে ওরা মাতব্বরি মারতে!'

জাহাজের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দুজনে। পশ্চিমে ম্যাসাচুসেটসের দিকে ছুটেছে মাদার শিপ। ফ্যানটেইলের ওপর ক্রেডলে রাখা আছে বাক্সটা। কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করে জাহাজের বিশেষ বিশেষ জায়গায় আলোর ব্যবস্থা করেছে জিমেনিজ, বাক্সের ডালা তোলার সময় রহস্যময় আবহ সৃষ্টি করবে এই আলো। বাক্স খোলার উপযুক্ত সময় হিসেবে সূর্যাস্তকে বেছে নিয়েছে ও, ফটোগ্রাফারদের 'ম্যাজিক আওয়ার' বলা হয় এই সময়টাকে। ছায়াগুলো হয় দীর্ঘ, আলো থাকে মোলায়েম, ছবি হয় নাটকীয়।

সাজানো-গোছানো শেষ করেছে জিমেনিজ, আর মাত্র আধঘণ্টা পরেই এসে যাবে ওর প্রতীক্ষার মুহূর্তটা, এ সময় জাহাজের ক্যাপ্টেন ওর হাতে একটা ফ্যাক্স তুলে দিয়েছেন। খামের ওপর 'জরুরি' লেখা। পাঠিয়েছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক। বন্দরে ভিড়বার আগে বাক্সটা খুলতে নিষেধ করা হয়েছে। বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, লেখক, সাংবাদিকরা জাহাজে উঠবেন, তাঁদের সামনে খোলা হবে ওই বাক্স। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এক্সপ্লোরার টেলিভিশন সিরিজের কর্মীরাও থাকবে।

ফ্যাক্সটা বিধ্বস্ত করে দিয়েছে যেন জিমেনিজকে। কী ঘটবে জানা আছে তার। বিশেষজ্ঞদের হুকুমে চলবে সব কিছু। ওর এত পরিশ্রম করে আয়োজন করা লাইটিং সিসটেম ধ্বংস করে দেয়া হবে, তাকে সরিয়ে দেয়া হবে পিছনে, সামনে চলে আসবে টিভি টিম। অন্য পত্রিকার কাছে ছবি বিক্রি করে কিছু বাড়তি রোজগারের সুযোগ তো যাবেই, বাক্স খোলার সময় ছবি তোলার ক্ষেত্রেও ওর মেধাকে কাজে লাগাতে পারবে না।

কিন্তু কিছুই করার নেই ওর এবং এখন বুঝতে পারছে দোষটা ওর নিজের। আরও চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা উচিত ছিল। উত্তেজনার বশে কোন কিছু না ভেবে বাক্সটা খোলার আগেই ওটা আবিষ্কারের কথা পত্রিকা-কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে মস্ত ভুল করেছে।

'শিট!' শেষ বিকেলের আকাশের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে

উঠল ও।

'আহা, বাদ দাও না, যা গেছে তো গেছেই!' জিমেনিজের হাত ধরে টানল পাইলট। 'এসো। জ্যাক ড্যানিয়েলের বোতলটা এতক্ষণে আমাদের বিরহে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে।'

ওয়ার্ডরুমে বসে মদ খাচ্ছে দুজনে। জিমেনিজের রাগ কমানোর জন্য বিশেষ-অজ্ঞদের যত বেশি সমালোচনা করল পাইলট, ততই রাগ বাড়ল জিমেনিজের। আক্রোশে পরিণত হলো সেটা। তাকে ঠকানো হয়েছে, ওর প্রতি অবিচার করা হয়েছে–এ ছাড়া আর যেন কিছুই ভাবতে পারছে না।

রাত আটটা পঁয়তাল্লিশে পাইলট জানাল, গলা পর্যন্ত ভরে গেছে তার, আর জায়গা নেই। টলতে টলতে চলে গেল নিজের বাঙ্কের দিকে।

পরিকল্পনাটা আগেই করে রেখেছিল জিমেনিজ, এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ঘড়ি দেখল, আটটা পঞ্চাশ মিনিট। ঘড়ির অ্যালার্ম মধ্যরাতে সেট করে রেখে সে-ও শুয়ে পড়ল বিছানায়।

'ওটা মনট্যাউক পয়েন্ট,' রেডার স্ক্রিনের এক জায়গায় আঙুল রাখলেন ক্যাপ্টেন। 'আর এটা ব্লক আইল্যান্ড। সাগর শান্ত থাকলে, উড হোলের কাছে নোঙর ফেলে ভোরের অপেক্ষা করতাম।' বাল্‌ক্‌হেডে ঝোলানো ঘড়িটার দিকে তাকালেন তিনি। 'একটা পনেরো বাজে। আর ঘণ্টা চারেক পরেই আলো ফুটবে। এই পুবাল ঝড়ের মধ্যে এখন আর বেশিদূর না এগিয়ে ব্লক আইল্যান্ডের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া উচিত। যা ঢেউ। অকারণে সবাইকে অসুস্থ বানানোর কোন মানে হয় না। প্রপেলারেরও ক্ষতি হতে পারে।'

'হ্যাঁ,' জিমেনিজ বলল। এত বেশি কফি গিলেছে, পেটের ভিতর ছলাৎ-ছলাৎ আওয়াজ করছে, বমি আসতে চাইছে। বিশাল

একেকটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে ধড়াস ধড়াস করে খাঁজে পড়ছে জাহাজটা, প্রচণ্ড আওয়াজে ভয় লাগে, মনে হয় যে কোন মুহূর্তে তলা খসে পড়ে যেতে পারে। পিছন থেকে ঠেলছে প্রবল ঝোড়ো হাওয়া। রাতের অন্ধকারে এভাবে চলাটা ভীষণ বিপজ্জনক। 'দূর, শুয়ে পড়িগে। দেখি, ঘুমানো যায় নাকি।'

'বাঙ্কের পাশে ওয়েস্টবাস্কেট রেখো,' হেসে বললেন ক্যাপ্টেন। 'বিছানায় বমি করে দিলে ঘুম শেষ।'

কয়জন লুকআউট আছে দেখার জন্য ব্রিজে চলে এল জিমেনিজ। মাত্র দুজন লোক নজর রাখছে। দুজনেই হুইল হাউসে রয়েছে, ওদের নজর সামনের দিকে। জাহাজের পিছন দিকটা নির্জন, কেউ তাকাচ্ছে না সেদিকে।

কেবিনে ফিরে এল ও। টয়লেটে গিয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করল একবার। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে একইভাবে আবার বমি করতে চাইল। বেরোল শুধু পিত্তরস। পেট খালি। দাঁত ব্রাশ করল। অনেকটা হালকা লাগল শরীর, মাথার ভার কাটল। ফ্ল্যাশ লাগানো একটা নাইকন ক্যামেরা কাঁধে ঝোলাল ও। একটা টর্চ তুলে নিয়ে সুইচ টিপে দেখল ঠিকমত জ্বলে কিনা। ঘর থেকে বেরিয়ে জাহাজের পিছন দিকে চলল।

বাতাসের গতি এখন ঘণ্টায় পঁচিশ-তিরিশ নট, তবে বৃষ্টি না থাকায়, আর জাহাজ বাতাসের অনুকূলে চলায় ঝাপটাগুলো তেমন জোরালো ভাবে লাগছে না। জাহাজের গতি পনেরো নট। তবে ঢেউয়ের মধ্যে যে রকম লাফাচ্ছে, তাতে স্বাভাবিকভাবে হাঁটা কঠিন।

দুটো পাঁচশো ওয়াটের বাল্‌ব্‌ আলোকিত করে রেখেছে পিছনের অংশটাকে। ক্রেডলে রাখা বাহু গুটানো সাবমার্সিবল দুটোকে লাগছে মস্ত দুটো গুবরে পোকার মত, কিংবা কমিক বইয়ের কোনও আজব জন্তু-চরিত্র। মাঝখানে রাখা সবজে-হলুদ রহস্যময় বাক্সটাকে যেন পাহারা দিচ্ছে ওগুলো।

ছায়ায় গা ঢেকে সাবধানে এগোল জিমেনিজ। পেরিয়ে এল পিছনের ডেকের একশো ফুট জায়গা। বাঁ দিকের সাবমার্সিবলটার পিছনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দেখে নিল ব্রিজের উইং থেকে কেউ নজর রেখেছে কি না। কেউ দেখছে না নিশ্চিত হয়ে নিয়ে তারপর টর্চ জ্বালল। আলো ফেলল বাক্সের একপাশে।

বাক্সটার ডালা কতখানি ভারি, জানে না ও। একশো পাউন্ড হতে পারে, কিংবা আরও বেশি, টেনে তোলা হয়তো ওর সাধ্যের বাইরে। না পারলে সাবমার্সিবলের দাঁড়া ব্যবহার করবে, সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছে। তাতে ইঞ্জিন চালু করতে হবে ওটার, তা-ও করবে। এখন আর পিছিয়ে যাবে না কোনমতেই। তবে এতসব ঝামেলা করা না-ও লাগতে পারে। ডালা অতিরিক্ত ভারি হলে সেটা তোলার নিশ্চয় কোনও যান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে, হয়তো স্প্রিং লাগানো, বোতাম টিপলে কিংবা কোন হুড়কো খুলে দিলেই আপনাআপনি উঠে যাবে ডালাটা।

সাবমার্সিবলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও। মাথা নিচু করে বাক্স আর ক্রেডলের মাঝখানের খোলা জায়গাটায় এসে হাঁটু গেড়ে বসল বাক্সের পাশে। ব্রিজের দিকে পিঠ দিয়ে টর্চের আলো আড়াল করে ডালার ঠিক নীচে যেখানে বাক্সের গায়ে লেগে আছে ওটা, একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আলো ফেলে দেখল। ওর কাছ থেকে দূরে, ফ্যানটেইলের কিনার থেকে মাত্র কয়েক ফুট নীচে প্রপেলারের কাছে টগবগ করে ফুটছে যেন পানি। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বার বার ওঠানামা করছে জাহাজ। কোনওদিকে নজর নেই তার, একমনে বাক্সটা পরীক্ষা করছে। ব্রোঞ্জের গায়ে একটা খুদে সোয়াস্তিকা খোদাই করা দেখতে পেল। তার ঠিক নীচেই রয়েছে একটা বোতাম।

ওটায় টিপ দিল ও। খুট করে মৃদু শব্দ। তারপর হিসহিস। ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠতে শুরু করেছে ডালাটা।

একটা মহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে তাকিয়ে রইল ও। প্রতি সেকেন্ডে

এক ইঞ্চির বেশি খুলছে না ডালাটা, স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

অর্ধেক খুলতেই আর অপেক্ষা করতে পারল না ও। উঠে দাঁড়াল। ক্যামেরা তুলে আনল চোখের সামনে। ফোকাস করল। অপেক্ষা করতে লাগল ফ্ল্যাশারের বিপ বিপ শোনার জন্য। ফ্ল্যাশার ফায়ার করতে তৈরি হলেই শব্দ করে জানিয়ে দেবে।

আলো খুব কম। তার ওপর ডালার ছায়া পড়েছে বাক্সের ভিতর। লেন্সের ভিতর দিয়ে দেখা গেল বাক্স ভরা তরল পদার্থ।...কিন্তু তার মধ্যে ওটা কী...একটা মানুষের মুখ না?...না, মানুষ না, তবে মিল আছে...

আচমকা তরল পদার্থে আলোড়ন উঠল। ঝিক্ করে উঠল কোন কিছু, চকচকে স্টিলে আলো পড়লে যেমন করে। ঝট্ করে বেরিয়ে এল একটা হাত।

প্রথমে তীক্ষ্ণ ব্যথা, তারপর এক ধরনের উষ্ণতা—পানির নীচে টেনে নেয়া হলো যেন ওকে। এবং সবশেষে, মারা যাওয়ার আগের মুহূর্তে বুঝল, খেয়ে ফেলা হচ্ছে ওকে।

ঢেউয়ে ওঠানামা করতে করতে একটা দ্বীপের দিকে মোড় নিল জাহাজ। পিছনের ডেকে গড়াগড়ি খাচ্ছে জিমেনিজের নাইকন ক্যামেরাটা।

আট

খাবারের প্রয়োজন ছিল দানবটার। বুভুক্ষের মত, আনাড়ি ভঙ্গিতে মাংস খেতে শুরু করল। নোনা, উষ্ণ রক্ত শুষে নিয়ে পিপাসা

মেটাল। এত খাওয়া খেল, একবিন্দু জায়গা রইল না আর পাকস্থলীতে, গলা পর্যন্ত উঠে এল খাবার।

পেট শান্ত হলো। পুষ্টি পেতে শুরু করেছে দেহ। কিন্তু মগজটা কেমন দ্বিধাগ্রস্ত, অচেনা লাগছে সব কিছু, দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠলে যেমন হয়। গতি টের পাচ্ছে ওটা। বাক্স থেকে মাথা তুলতেই কীসের যেন ঘাটতি অনুভব করল। থরথর করে কাঁপছে ফুলকোর পর্দাগুলো, হাঁসফাঁস করছে অক্সিজেন না পেয়ে, তাড়াতাড়ি আবার বাক্সের তরলে ডুব দিল ওটা।

মগজের কাছে ক্রমাগত সঙ্কেত চেয়ে পাঠাচ্ছে স্নায়ুতন্ত্র, কোন সাড়া পাচ্ছে না। মগজে প্রোগ্রামিং করে জবাব ভরা রয়েছে, কিন্তু প্রবল উত্তেজনার মধ্যে সেগুলো খুঁজে পাচ্ছে না দানবটা।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, কাছেই রয়েছে নিরাপদ জায়গা, যেখানে টিকতে অসুবিধে হবে না। মরিয়া হয়ে তাই আবার বাক্সের নিরাপদ আবাস থেকে বেরিয়ে এল ওটা। চারপাশে কী আছে বোঝার চেষ্টা করল।

ওই তো। ওই যে। কালো অন্ধকার পানির জগৎ, যেখানে যাওয়া অতি জরুরি।

তথ্যের জোগান দিচ্ছে না মগজ, তবে ইন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ। সেই বোধটা দিয়েই বুঝতে পারছে, এ মুহূর্তে খাবার ও আশ্রয়টাই সবচেয়ে জরুরি।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধি খাটিয়ে প্রোগ্রাম পরিবর্তনের সাধ্য দানবটার নেই, তবে গায়ে আছে প্রচণ্ড শক্তি, আর এখন সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাঁচতে চাইল।

বাক্সের একমাথার কাছে এসে দাঁড়াল ওটা। ঠেলতে শুরু করল পানির দিকে। অক্সিজেনের ক্ষুধা বাড়ছে মগজে। দ্রুত কাজ সারার তাগাদা দিচ্ছে মগজ।

ঢেউ থেকে নামার সময় নিচু হয়ে গেল জাহাজের গলুই। উঁচু

হলো পিছন দিক। গায়ের জোরে ঠেলেও তাই বাক্সটাকে সরাতে পারল না দানবটা। আবার ঢেউয়ের মাথায় চড়ল জাহাজের সামনের অংশ, গলুইটা উঁচু হয়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে। পিছন দিকটা নিচু হচ্ছে। উঁচু-নিচু হওয়ার এই সময়টাতে মুহূর্তের জন্য ওজনশূন্য হয়ে গেল বাক্সটা। ঠেলা খেয়ে নড়ে উঠল।

ঠেলেই চলেছে দানবটা। জাহাজের পিছন দিক নিচু হয়ে থাকায় সরে যাচ্ছে বাক্সটা। ফ্যানটেইলের কিনারে গিয়ে টলমল হয়ে রইল একমুহূর্ত, তারপর উল্টে পড়ে গেল সাগরে।

বাক্সের পিছন পিছন ঝাঁপ দিল ওটা। ঠাণ্ডা, নোনা পানিতে ডুবে গিয়ে স্বস্তি ফিরে এল শরীরে, সেইসঙ্গে দম নেয়ার আরাম। সতেজ হয়ে উঠল দেহের সমস্ত যন্ত্রাংশ।

মাথা নিচু করে ডাইভ দিল ওটা রাতের সাগরে। দ্রুত নেমে যেতে থাকল পানির গভীরে।

নয়

ওয়াটারবোরো। আমেরিকার পূর্ব উপকূল।

বোটের কেবিনে একটা টেলিভিশন মনিটরের ওপর ঝুঁকে দুই হাত দিয়ে আলো আড়াল করে দাঁড়াল মাসুদ রানা। এখনও আকাশের অনেকটাই নীচে গ্রীষ্মের সূর্য, উজ্জ্বল আলো জানালা দিয়ে বন্যার মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঘরে, মনিটরের সবুজ স্ক্রিনের রেখাগুলো অস্পষ্ট করে দিয়েছে। আবছা দেখা যাচ্ছে ধীর-সচল সাদা বিন্দুটা।

স্ক্রিনের একটা রেখার ওপর আঙুল রাখল রানা। কম্পাসের

সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বলল, 'আসছে ওটা। একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেছে।'

'করছেটা কী?' জিজ্ঞেস করল বোটের মালিক বিগ। হাঙর দেখায় রানাকে সহযোগিতা করছে। আসল নাম হ্যারি ওয়াগনার। বিশাল দেহের কারণে স্থানীয় লোকেরা ডাকে বিগ। হ্যারি অবশ্য তাতে কিছু মনে করে না। বরং একধরনের আত্মতৃপ্তি পায়। ডানে হুইল ঘুরিয়ে দক্ষিণে এগোল। 'নাস্তা খেতে ব্লকে গিয়েছিল, এখন লাঞ্চ সারতে ওয়াটারবোরোতে ফিরছে নাকি?'

'খিদে আছে বলে তো মনে হয় না,' জবাব দিল রানা। 'নিশ্চয় তিমির মাংস এত গিলেছে, সাতদিন আর খেতে হবে না।'

'কিছু কিছু হাঙর এক মাস না খেয়েও বাঁচে,' বলল বিগের বারো বছরের ছেলে ভিকি। বেঞ্চে বসে মনিটরের দিকে তাকিয়ে খুব যত্ন করে গ্রাফ পেপারে ডাটা কপি করছে। মা নেই ওর। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে পাঁচ বছর আগে।

'তা ঠিক।' জানালা দিয়ে পাথুরে সৈকতটার দিকে তাকাল রানা। রোড আইল্যান্ডের ওয়াচ-হিল সৈকত। ন'টা বাজেনি, এর মাঝেই বেশ কয়েকটা পরিবার পিকনিকের বাক্স, ফ্রিজবি আর ইনার টিউব নিয়ে হাজির হয়ে গেছে। কয়েকজন তরুণ সারফার ওয়েটসুট প'রে অল্প ঢেউয়ের মধ্যে ওঠা-নামা করছে বড় ঢেউয়ের আশায়। বাতাস নেই, আবহাওয়ার পূর্বাভাসেও বাতাস বাড়ার কথা কিছু বলেনি। হতাশ হয়েই হয়তো ফিরে যেতে হবে ওদের।

তীর থেকে পাঁচশো গজ দূরে বিগের সাদা ইয়টটা যে উদ্দেশ্যে ঘোরাঘুরি করছে, ওদের গিয়ে জানালে কী রকম আতঙ্কিত হবে ওরা, কেমন হুড়াহুড়ি শুরু করবে, ভেবে মনে মনে হাসল রানা।

'হাঙরটা আসছে,' স্ক্রিনের ডিজিটাল নম্বরগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল ভিকি।

আবার স্ক্রিনের ওপর ঝুঁকে হাত দিয়ে আলো আড়াল করল

রানা। রেইডারের সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখে মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ। একশো ফুট দূরে, দুশো ফুট পানির নীচে। নিশ্চয় শরীর ঠাণ্ডা করছে। এখান থেকে ব্লক পর্যন্ত তো পানির গভীরতা কম দেখানো আছে ম্যাপে।'

'নিশ্চয় খাদটাদ আছে, ম্যাপওলারা খুঁজে পায়নি। নিজের রাজত্ব ভাল করেই চেনে হাঙরটা, আমাদের চেয়ে অনেক ভাল...'

ভিকির কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠল রানা, 'ওই যে, ঢালের ওপর দিয়ে উঠে আসছে আবার।' বাল্কহেডের উপর হুকে ঝোলানো একটা ৮৫-২০০ এম এম জুম লেন্সওয়ালা স্টিল ক্যামেরা খুলে নিল ও। ভিকিকে বলল, 'চলো, দেখি পোজ দেয় কি না।' বিগকে বলল, 'আপনি মনিটরে একটা চোখ রাখুন। হঠাৎ মোড় নিয়ে অন্য দিকে রওনা হলে জানাবেন।'

দরজার দিকে এগোল ও। আবার তাকাল সৈকতের দিকে। 'হাঙরটা ওদিকে না গেলেই বাঁচা যায়। ওকে দেখলে লোকগুলো যা শুরু করবে এখন...'

'ম্যাটাওয়ান ক্রিকের মত,' ভিকি বলল, 'উনিশশো ষোলো সালে ঘটেছিল ঘটনাটা।'

'হ্যাঁ, তবে ওখানে অকারণে হই-চই করেনি লোকে। ওই হাঙরটা তিনজন মানুষকে খুন করেছিল।'

'চারজন,' শুধরে দিল ভিকি।

'তাই?' হাসল রানা।

'রেফারেন্স বই খুলে শিওর হয়ে নেব?'

'থাক, মেনে নিচ্ছি আমি।' প্রশংসার দৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে তাকাল রানা। তর্ক করল না। আমেরিকান প্রবাদ আছেঃ ছোটদের সঙ্গে কখনও হাঙর নিয়ে তর্ক কোরো না। হাঙর সম্পর্কে বড়দের চেয়ে অনেক বেশি জানে ছোটরা।

তাক থেকে একটা দুরবিন নিয়ে ভিকির দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। 'নাও, দেখো কোথায় ভেসে ওঠে।'

ভিকির পিছন পিছন আটচল্লিশ ফুট লম্বা বোটের পিছনে খোলা ডেকে এসে দাঁড়াল রানা। মাথার ওপরে তুলে রাখা সানগ্লাসটা টেনে নামাল নাকের উপর। প্রচণ্ড গরম পড়বে বোঝা যাচ্ছে, এই খোলা সাগরেও পঁচানব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি হয়ে যাবে তাপমাত্রা। বিগ বলেছে, বছর কয়েক আগেও নাকি এত গরম পড়ত না এখানে, ইদানীং বাড়তে আরম্ভ করেছে, পঁচানব্বই ডিগ্রি একটা সাধারণ ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে।

জুম লেন্সটাকে টেলিস্কোপের মত ব্যবহার করে দূরের সাগর দেখছে ও। আয়নার মত লাগছে বাতাসহীন সাগরের পানি। ভিকিকে জিজ্ঞেস করল, 'কী, কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'না।' চোখ থেকে দুরবিন সরাল না ভিকি। ভেসে উঠলে চোখে পড়বেই। ষোলো ফুট লম্বা আর প্রায় টনখানেক ওজনের হাঙরটার পিঠের পাখনা এই শান্ত সাগরে নৌকার পালের মত পরিষ্কার দেখা যাবে।

বোট থেকে পানিতে ফেলা হয়েছে রাবার-কোটেড একটা তিনশো ফুট লম্বা তার। মাথায় সেন্সর। ওটার সাহায্যেই হাঙরটাকে অনুসরণ করছে ওরা। বোট এখন যেখানে রয়েছে, সেখানে পানির গভীরতা খুবই কম। তারের মাত্র পঞ্চাশ ফুট রয়েছে পানিতে, বাকিটা কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা আছে ডেকের ওপর।

'স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে হাঙরটাকে?' বিগকে ডেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

স্ক্রিন দেখতে সময় লাগল, তাই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না বিগ। একটু পরে জানাল, 'পঞ্চাশ ফুট দূরে। নড়াচড়া দেখে বোঝা যায় কোন কাজ নেই বেটির, অলস ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করছে। সঙ্কেত স্পষ্ট, জোরাল।'

ভোর থেকে ওটাকে অনুসরণ করছে ওরা। ওটার গতিবেগ, গতিপথ, দেহের তাপমাত্রার ডাটা রেকর্ড করছে। সাগরের দুর্লভ

এই শিকারি প্রাণীটি সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব তথ্য জানতে উদগ্রীব রানা। হাঙরটার গতিবিধি লক্ষ করার জন্য ওটার গায়ে ডার্ট বিঁধিয়ে দিয়েছে। তাতে লাগানো রয়েছে সঙ্কেত পাঠানোর ইলেকট্রনিক যন্ত্র।

স্থানীয় জেলেদের বলে রেখেছিল বিগ, সাদা হাঙরের খোঁজ পেলে যাতে ওকে খবর দেয়। জেলেদের একজন জানিয়েছে, সাদা হাঙর দেখেনি, তবে সাগরে একটা মরা তিমি ভাসতে দেখেছে। ওই জেলেটার মতই বিগও জানে, আশপাশে থেকে থাকলে পচা মাংসের গন্ধ পাবেই গ্রেট হোয়াইট, তিমির মাংস খাওয়ার লোভ ছাড়তে পারবে না। ওর অনুমান ভুল হয়নি। তিমির লাশের কাছে গিয়ে ঠিকই পেয়ে গেছে মস্ত এই সাদা হাঙরটাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মাদী হাঙর, পনেরো থেকে বিশের মধ্যে বয়েস। অন্তঃসত্ত্বা। তিমির মাংস খাওয়ার সময় ওটার ফোলা পেটটা চোখে পড়ছিল।

ম্যারিন-লাইফ, বিশেষ করে সাদা হাঙরের ব্যাপারে খুব আগ্রহ রানার। কোটি কোটি বছর ধরে টিকে রয়েছে ওরা একভাবে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে, কোনও পরিবর্তন হয়নি। কোনও রোগ ওদের কাবু করতে পারে না।

গ্রেট হোয়াইট শার্ক কতদিন বাঁচে, আর ঠিক কোন্ বয়েস থেকে বাচ্চা দিতে শুরু করে কেউ জানে না, তবে বিজ্ঞানীদের অনুমান আশি থেকে একশো বছর আয়ু ওদের, মোটামুটি দশ বছর বয়েস থেকে বাচ্চা দিতে আরম্ভ করে, প্রতি এক বছর পর পর একটা কি দুটো করে বাচ্চা দেয়।

ট্র্যান্সমিটার লাগানো ডার্টটা ডার্টগানের সাহায্যে সহজেই হাঙরের গায়ে গেঁথে দিয়েছে রানা। তারপর কয়েক মিনিট ধরে হাঙরটাকে দেখেছে ও, ছবি তুলেছে।

ভরপেট খেয়ে তিমির কাছ থেকে সরে গেছে হাঙরটা। ট্র্যাকিং সেন্সরের সাহায্যে অনুসরণ করেছে ওরা। প্রথমে কিছুদূর পুবে

এগিয়েছে ওটা, তারপর মোড় নিয়েছে উত্তরে।

সাদা হাঙরের বিচরণের সীমা কতখানি, তা-ও জানতে আগ্রহী রানা। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় গবেষকদের লেখা পড়ে জেনেছে ও, ডেঞ্জারাস বে রিফ আর কফিন বে'র মত জায়গাগুলোতে যেখানে বছরের বিভিন্ন মৌসুমে সাগরের পানির তাপমাত্রা খুব সামান্যই ওঠানামা করে, সেসব জায়গায় নিজের সীমা ছেড়ে বাইরে বিচরণ করে না হোয়াইট শার্ক। সহজেই খাবার পাওয়া যায় ওখানে। ঘুরেফিরে চক্কর দিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিটি হাঙর তার নিজ এলাকায় ফিরে আসে; তারপর আবার ঘুরতে বেরোয়, আবার আসে। বার বার চলতে থাকে এ রকম।

কিন্তু এখানে, আমেরিকার এই পূর্ব উপকূলে, পানির তাপমাত্রা যেখানে গরমকালের তুলনায় শীতকালে তিরিশ ডিগ্রি নেমে যায়, খাবার কখনও একরকম থাকে না, কখন আসবে, কখন যাবে, তা-ও নিশ্চিত করে বলা যায় না, সেখানে বিশেষ কোনও সীমানার ভিতরে থাকাটা নিশ্চয় অস্বাভাবিক। নিশ্চিত করে এখনও বলতে পারেনি কেউ। রানার ধারণা, এখানকার হোয়াইটেরা মাইগ্রেটরি। শীতকালে যতটা সম্ভব দক্ষিণে চলে গিয়ে বসন্তের শেষ কিংবা গ্রীষ্মের শুরুতে ফিরে আসে। কিছু কিছু হোয়াইট বছরের পর বছর ধরে একই জায়গায় ফিরে আসে, যেন নিজ নিজ সীমানা চিহ্নিত করে রেখে যায়, ঠিক ওখানেই ফিরে আসে দখল ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য।

'আবার নীচে নামছে,' কেবিন থেকে ডেকে বলল বিগ।

'নাহ্, বড়ই অস্থির দেখছি!' হাঙরটা ভেসে না ওঠায় কিছুটা হতাশ মনে হলো রানাকে। তীরের দিকে তাকাল। একপাশে ন্যাপাট্রি পয়েন্ট। তার ওপাশে ওয়াটারবোরো শহর। 'এখন কোথায় আছে?'

'মনট্যাউক থেকে সরে যাচ্ছে, মনে হয়। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নেই। স্রেফ ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে।'

কেবিনে এসে ঢুকল রানা। ক্যামেরাটা ঝুলিয়ে রেখে ঘাম মুছল ভুরুর ওপর থেকে। ভিকিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'স্যান্ডউইচ খাবে?'

দুরবিন হাতে কেবিনে ঢুকল ভিকি। সে-ও হতাশ।

'একটা বিয়ারের টিন খুলে দাও তো আমাকে,' ছেলেকে বলল বিগ।

ঘড়ি দেখল ভিকি। 'মাত্র তো সকাল ন'টা। এখনই খাবে?'

'ওই ঘড়ি নষ্ট,' গম্ভীর মুখে জবাব দিল বিগ। 'আমার পেট বলছে এখন বিয়ার-টাইম।'

মুচকি হাসল রানা। বুঝতে পারছে, হাঙরের পিছনে ঘুরতে ঘুরতে বিরক্ত হয়ে গেছে বিগ।

নীচের রান্নাঘরে যাওয়ার মইটার দিকে এগোল রানা। হঠাৎ ঝাঁকি খেল বোট। মুহূর্ত পর আবার সামনে এগোনো থেমে গেল। উঁচু হয়ে যাচ্ছে গলুই, পিছন দিকটা নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে।

'কী হলো?' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'কীসে লাগালেন?'

'কীসে লাগাব? এখানে তো একশো ফুট পানি!' ভুরু কুঁচকে ফ্যাদোমিটারের দিকে তাকিয়ে আছে বিগ। 'এখানে কোন কিছুতে আটকানোর কথা না।'

ইঞ্জিন চলছে। প্রপেলার ঘুরছে। অথচ এগোতে পারছে না বোট। চাপ বাড়ছে ইঞ্জিনের ওপর।

রবার ছেঁড়ার শব্দ কানে এল। মাউন্টের ওপর থেকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছাতে শুরু করল টেলিভিশন মনিটর ও সিগন্যাল রিসিভারটা। ওগুলোতে সংযোগ দেয়া রবারের তারটা টান টান হয়ে গেছে।

'বোট পিছান! জলদি!' চেঁচিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড় দিল রানা।

পিছনে গিয়ার দিল বিগ। কানেকটিং তারটা ঢিল হয়ে ডেকের ওপর পড়ে গেল।

ককপিটের বাইরে এসে রানা দেখল ডেকে রাখা তারের কয়েলটা নেই। তারমানে তিনশো ফুট তার এখন পানিতে। 'নিশ্চয় ছিঁড়ে গেছে তারটা। পানির নীচে সেন্সরটা কোন কিছুতে আটকে গিয়েছে।'

বিগকে ইঞ্জিন নিউট্রাল করতে বলল ও। বোট থেমে গেলে তারটা টেনে তুলতে শুরু করল। পিছনে দাঁড়িয়ে বিগ সেই তার ডেকে গুছিয়ে রাখতে লাগল। ভিকি ওকে সাহায্য করছে।

ধীরে ধীরে তারের স্তূপ জমে যাচ্ছে। একটা সময় তারটা আবার টান টান হয়ে এল, আর উঠছে না। ডানে, বাঁয়ে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে, টেনে, ঢিল দিয়ে, নানানভাবে ওটা ছুটাবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু কোনমতেই খোলা গেল না।

'সেন্সরটাই আটকেছে কোন কিছুতে,' বলল ও।

'কীসে আটকাল বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত মনে হলো বিগকে। 'ওখানে তো বালি ছাড়া কিচ্ছু নেই। গত হপ্তার ঝড়টা অবশ্য...দেড় দিন একটানা চল্লিশ নট বেগে চলেছে, তলার সবকিছু ওলট-পালট করে দিতে পারে। হয়তো বালির নীচে পাথরের চাঙড় আছে ওখানে, বালি সরে যাওয়াতে বেরিয়ে পড়েছে।'

'ডুবে যাওয়া ভাঙা জাহাজে আটকায়নি তো?' ভিকির প্রশ্ন।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল বিগ। 'এখানে ওসব নেই। এই এলাকার যেখানে যেখানে ভাঙা জাহাজ আর বোট আছে, সবগুলোর চিহ্ন দিয়ে রেখেছি চার্টে, যাতে এ ধরনের সমস্যায় পড়তে না হয়।' আনমনে বিড়বিড় করল, 'ট্যাংকও আনা হয়নি...কে জানত, ডাইভ দিতে হবে!'

কেবিনে ঢুকল ও। ফ্যাদোমিটারের স্কেল ঠিক করল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করল। আবার যখন বেরিয়ে এল, ওর হাতে একটা ফেস মাস্ক আর একটা স্নরকেল

'ওই সেন্সরের জন্য ডুব দেবেন আপনি!' ভুরু কুঁচকে গেছে

রানার। 'ফ্রি-ডাইভ! পাগল হয়ে গেলেন নাকি?'

'তো কী করব!' গম্ভীর হয়ে আছে বিগ। 'এত দামি তার আর সেন্সর...খোয়া গেলে অনেক টাকা নষ্ট হবে আপনার...'

'হোক,' রানা বলল। 'তাই বলে মরতে পাঠাব নাকি আপনাকে?'

'দোষটা তো আমার। মনে করে গ্যাস-ট্যাংক নিয়ে এলে...'

'আপনি কি আর জানতেন সেন্সরটা আটকাবে? ভাববেন না, খোয়া যাবে না। এক কাজ করা যাক। আপাতত বয়া লাগিয়ে ভাসিয়ে রাখি। পরে ট্যাংক নিয়ে ফিরে এসে তুলে নিতে পারব।'

'ট্যাংক আনতে গেলে তো হাঙরটাকে খোয়াব।'

'খোয়ালে খোয়াব। একটা যেহেতু খুঁজে বের করতে পেরেছেন, আরেকটাও পারবেন।'

'কিন্তু গ্রেট হোয়াইট তো আর গণ্ডায় গণ্ডায় মেলে না, ওটাকে কপালগুণে পেয়ে গেছি আমরা।'

'আবারও কপালগুণেই পাওয়া যাবে। আর না পেলে নেই। আসুন, সাহায্য করুন আমাকে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে রইল বিগ। বিদেশী এই লোকটাকে যতই দেখছে, ততই অবাক হচ্ছে ও। আশ্চর্য এক মানুষ! অবশেষে হাসি ফুটল মুখে। 'ঠিক আছে, বয়াতেই বেঁধে রেখে যাব। কিন্তু চোরে নিয়ে গেলে?'

'বয়া নেয়ার চোর আছে নাকি এখানে?'

'বয়া হয়তো নেবে না, কিন্তু তার, সেন্সর–এসবের দাম তো অনেক...

'কিছু করার নেই।' কেবিনে ঢুকল রানা। সিগনাল রিসিভার থেকে তারটা খুলে নিল। কখন আবার ফিরে আসতে পারবে জানে না। পানিতে ফেলার আগে গ্রিজ মাখিয়ে দিতে হবে, দীর্ঘ সময় পানিতে থাকলেও যাতে নষ্ট না হয়।

গ্রিজ মাখাতে বিগ সহযোগিতা করল রানাকে। পিছন দিকের

একটা হ্যাচ তুলে কমলা রঙের একটা বয়া বের করল। লাল ডে-গ্লো রঙ দিয়ে 'ও. আই' লেখা—অসপ্রি আইল্যান্ড-এর আদ্যাক্ষর: দিনের বেলায়ও জ্বলজ্বল করে জ্বলে লেখাটা।

বোটের পিছন দিকে হাঁটতে হাঁটতে তারটা কনুই আর কাঁধে জড়াতে লাগল বিগ। ঘামে ভেজা শার্টটা খুলে ফেলেছে। মুষ্টিযোদ্ধার মত দেহ, লাল চকচকে চামড়ায় যেন তেল দেয়া রয়েছে, সামান্য নড়লেই পেশিগুলো কিলবিল করে ওঠে। ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা ও, ওজন দুশো বিশ কেজি, এক ছটাক বাড়তি চর্বি নেই দেহের কোথাও।

বয়ার সঙ্গে তার বাঁধা শেষ হলো। পানিতে ছুঁড়ে ফেলা হলো ওগুলো। ভারি তার, কিন্তু পানিতে ওজন অনেক কমে যায়, তাই ভার বহন করতে কোনই অসুবিধে হলো না বয়াটার। দুশো পাউন্ড ভার বহন করার ক্ষমতা আছে ওটার।

ইঞ্জিনের গিয়ার দিতে চলে গেল বিগ।

দশ

অসপ্রি আইল্যান্ডের দিকে এগোচ্ছে বোট। ফ্লাইং ব্রিজে হুইল ধরে আছে বিগ। পুলপিটের মাথায় দাঁড়ানো ভিকি। পিছনে ডেকে দাঁড়িয়ে আছে রানা। দুটো দ্বীপের মাঝখান দিয়ে চলেছে বোট। প্রণালীর এই জায়গাটাতে পানি বেশ গভীর।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ভিকি, 'আঙ্কেল, দেখুন দেখুন!' হাত তুলে পানির দিকে দেখাল।

কোথা থেকে হাজির হয়েছে একটা ডলফিন। গলুইয়ের

ধাক্কায় বোটের দুই পাশে তীরের মাথার মত ঢেউ সৃষ্টি হচ্ছে। তাতে ভেসে থেকে বোটের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে ডলফিনটা। ধূসর চকচকে পিঠ, চোখা লম্বা নাক, মাথার ওপর ব্লোহোলের ছিদ্র। প্রাণীটার পেটের গভীর থেকে ওই ছিদ্রপথে বেরিয়ে আসছে বিচিত্র শব্দ।

'কথা বলছে ওটা!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল ভিকি। 'এভাবেই কথা বলে নাকি, আঙ্কেল? কী বলছে?'

'ফালতু বকবক করছে নিশ্চয়...ওর বন্ধুদেরও ডাকতে পারে...কী জানি।' হাসল রানা।

চলার জন্য খুব একটা শক্তি খরচ করতে হচ্ছে না ডলফিনটাকে। ঢেউ ওটাকে সাহায্য করছে। মাঝে মাঝে ঢেউ থেকে খাঁজে পড়ে যাচ্ছে। ওপরে-নীচে লেজ নেড়ে আবার উঠে পড়ছে ঢেউয়ের মাথায়। বোটের সঙ্গে ডলফিনকে ছুটতে দেখা নতুন নয় রানার কাছে। বহু দেখেছে। তাই বুঝতে পারল, এই ডলফিনটার লেজ নাড়ানোর ভঙ্গিটা স্বাভাবিক নয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কারণটা। 'লেজটা দেখো!'

পুলপিটের রেলিঙে যতটা সম্ভব ঝুঁকে তাকাল ভিকি। 'লেজে কী হয়েছে?'

'লেজের বাঁ দিকের পাতাটায় দাগ।'

পাঁচটা গভীর আঁচড়ের দাগ, ভিকিও দেখতে পেল। প্রতি দুটো আঁচড়ের মাঝখানের ফাঁক দুই ইঞ্চি। অবাক লাগল তার। 'কীসে আঁচড়েছে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'হাঙর?'

'না, হাঙরের কামড়ের দাগ ওরকম নয়।'

'খুনী তিমি?'

'উঁহুঁ!' ভ্রূকুটি করল রানা। 'নখের দাগের মত লাগছে। অনেকটা বাঘ-ভালুকের নখের মত। কিন্তু পানিতে তো আর ওসব

জানোয়ার বাস করে না।'

'তাহলে নিশ্চয়ই সাগরের কোনও প্রাণীর পাঁচটা নখ আছে?'

'আমি যতদূর জানি, নেই।' বিগকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনি জানেন নাকি?'

'না!'

এগারো

দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা খাঁড়িতে তৈরি করা হয়েছে ডকটা। তাতে এসে ঢুকল বোট।

ডকের পাশে একটা ছোট্ট গর্ত ভরে আছে জোয়ারের পানিতে, তার পাশে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ডানাওয়ালা একটা নীল বক।

'হাই, উইং!' ডাকল ভিকি। গম্ভীর ভঙ্গিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পাখিটা। হেসে রানাকে বলল ভিকি, 'রেগে আগুন হয়ে আছে। খাবার দিতে দেরি হয়ে গেছে তো।'

বছর চারেক আগের কথা, সৈকতে পাখিটাকে পড়ে থাকতে দেখে পশু-ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন ওটাকে বিগের ফুফু মিসেস মেলভিল। ডাক্তার বললেন, ডানাটা এমনভাবে ভেঙেছে, ঠিক করা যাবে না। ডানা ছাড়া বাঁচতে পারবে না ভেবে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মারতে দেননি মিসেস মেলভিল। নষ্ট ডানাটা কেটে ফেলে দিয়েছেন ডাক্তার, পাখিটা সুস্থ হলে বাড়ি নিয়ে এসেছেন তিনি। ডানা হারানোতেই বোধহয়, প্রচণ্ড মেজাজি হয়ে উঠেছে পাখিটা।

'দিনে দু'বার ভাটার সময় পানি জমে যাওয়া গর্তগুলোর কাছে খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়,' প্রথম আলাপেই ভিকি বলেছে রানাকে। 'বাকি সময়টা ঠিক ওইখানটাতে দাঁড়িয়ে থেকে সারাক্ষণ আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে, খাবার দিতে দেরি হয় কেন, আরও বেশি খাবার দিই না কেন। হয়তো ভাবে, ডানা থাকলে অনেক বেশি খাবার ধরে খেতে পারত।'

'খাবার কম পড়ে ওটার?' রানা জিজ্ঞেস করেছে।

'ওর তা-ই ধারণা। কিন্তু আমাদের তা মনে হয় না। দাদী তো সারা দুপুরই কাটান ওটার সঙ্গে—পানিতে ছিপ ফেলে বসে থাকেন পাথরের ওপর। আমাদের পারিবারিক পাখি। আপনারও বন্ধু হবে, যতক্ষণ খাবার দেবেন। যেই দেয়া বন্ধ করবেন, শত্রুরও অধম। আমাদেরকেও ছাড়ে না।'

অপেক্ষাকৃত দুটো ছোট বোটের—একটা ওএইলার, আরেকটা ম্যাকো—মাঝের ফাঁক দিয়ে বোট ঢুকিয়ে দিল বিগ। সবগুলো বোটের মালিক ও। লাফ দিয়ে ডকে নামল ভিকি। বোটের দড়িদড়াগুলো বাঁধল ডকের খুঁটিতে।

রানা আর বিগও নামল। ভিকি গেল পাখিটাকে খাবার দিতে। রানা ও বিগ পাহাড়ি পথ ধরে এগোলো বাড়ির দিকে।

তিন বছর আগে দ্বীপটা লিজ নিয়েছিল রানা। তার আগে প্রায় একশো বছর ধরে একটা পারিবারিক সম্পত্তি ছিল এই অসপ্রি আইল্যান্ড পাঁচটা বিল্ডিং বানানোর অনুমতি ছিল স্থানীয় প্রশাসনের। তাদের আশঙ্কা, এর বেশি বানাতে গেলে চাপ সইতে পারবে না ছোট্ট এই দ্বীপ। কিন্তু চার প্রজন্ম পরে ওই এক পরিবারেরই এত বেশি মানুষ হয়ে গেল, পাঁচটা বাড়িতে আর কুলাল না। একে অন্যের কাছে নিজের অংশ বিক্রি করে মেইনল্যান্ডে সরে গিয়ে দ্বীপের লোকসংখ্যা কমানোর চেষ্টা করল কয়েকটি পরিবার কিন্তু তারপরেও রয়ে গেল মেলা লোক।

বাকিরা কেউ আর কারও কাছে বেচতে রাজি হলো না। জটিলতা বাড়তে থাকল।

মূল ভূখণ্ড ও বন্দর থেকে কয়েক মাইল দূরে পঁয়ত্রিশ একরের এই দ্বীপটা খুব লাভজনক হতে পারে ভেবে সেভাবেই এটার কর নির্ধারণ করেছিল স্থানীয় প্রশাসন। গত দুই দশকে সেই কর দুবার বাড়ানো হয়েছে–প্রথমে দ্বিগুণ, তারপর তার দ্বিগুণ–বছরে দশ হাজার ডলার। দ্বীপের বাসিন্দারা হিসেব করে দেখল এরচেয়ে অনেক কম টাকায় ন্যানটাকেট কিংবা মার্থা'স ভিনিয়ার্ডের মত দামি জায়গায় বাড়ি ভাড়া করে থাকা যায়।

দ্বীপটা বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল তারা। কর্তৃপক্ষের ভ্যালুয়েশনে যে দাম ধরা হয়েছে, সেই দামে কেউ কিনতে রাজি হলো না। শেষে কর আদায়কারীদের ওপর এক ধরনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই যেন মূল দামের অর্ধেক দামে স্থানীয় ব্যাংকের কাছে দ্বীপটা মর্টগেজ রেখে, সেই টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে দ্বীপ ছেড়ে চলে গেল সবাই যে যার মত, দলিলপত্র, করের বোঝা সব ব্যাঙ্কের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে।

ব্যাংক যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল, নিলামে তুলে দ্বীপ বিক্রি করা ছাড়া কিছুই আর করার নেই তখন তাদের। কিন্তু নিলামেও কিনতে রাজি হলো না কেউ। শেষে লিজ দেয়ার কথা ভাবল ব্যাংক। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিল। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখায় কাজে এসে সেই বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল রানার। তিমি ও হাঙর গবেষণার সুপ্ত বাসনাটা নড়েচড়ে উঠল মনের ভিতর। ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলে দ্বীপটা দেখতে এল ও। বিগ আর ভিকি তখন দ্বীপে ছিল না। বিগ গিয়েছিল মাছ ধরতে, আর ভিকি স্কুলে। পঁয়ত্রিশ একর জুড়ে ঝোপ-জঙ্গল ও পাথুরে টিলাটক্করে ভর্তি সৈকতওয়ালা নির্জন দ্বীপটার এমন কোনও আকর্ষণ নেই যে হোটেল বা বোর্ডিং হাউস বানিয়ে টুরিস্টদের ভাড়া দিয়ে ব্যবসা করা যায়। পৌর সুযোগ-সুবিধাও

নেই। মোটকথা বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানোর কোন সুযোগই নেই। তবে রানার খুব পছন্দ হলো। ওর মনে হলো: মাঝে মাঝে ছুটিতে বেড়াতে আসা, আর সেই সুযোগে ইচ্ছে মত সাগরে ঘুরে বেড়ানোর জন্য, তিমি-হাঙর-অক্টোপাসের আচার আচরণ দেখার জন্য অসপ্রি আইল্যান্ডই আদর্শ জায়গা। খুব অল্প টাকাতেই ওকে লিজ দিতে রাজি হয়ে গেল ব্যাংক। আর কিছু করারও ছিল না অবশ্য ওদের।

কিন্তু লিজের টাকা জমা দিতে যেদিন ব্যাংকে গেল রানা, সেদিনই বাধল বিপত্তি। ব্যাংক-কর্মকর্তার অফিসে বসে আছে ও, হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল এক বিশালদেহী লোক। রীতিমত দৈত্য একটা। সঙ্গে নয়-দশ বছরের একটা ছেলে। রানাকে দেখেই কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল দৈত্যটা, 'কে আপনি, মিস্টার? এতবড় সাহস, আমাদের দ্বীপ কেড়ে নিতে চান?'

অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাল রানা। ব্যাংক-কর্মকর্তা পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'উনি মিস্টার হ্যারি ওয়াগনার ওঁর পূর্বপুরুষেরাই এই দ্বীপের মালিক ছিলেন...

'ছিলেন মানে!' চেঁচিয়ে উঠল দৈত্য। 'এখন কী নেই নাকি?' লিজ দেবেন, আগে জানাননি কেন আমাদের?'

'তিন-তিনবার জানিয়েছি। আপনারা গা করেননি

'যাই হোক, এখন করছি এই যে আমি টাকা নিয়ে এসেছি, লিজের প্রথম কিস্তি, দ্বীপটার কাগজপত্র আমার আর আমার ফুপুর নামে করে দিন

'প্রথম কিস্তি মানে?'

'পুরো টাকা একবারে দেয়ার সাধ্য নেই আমাদের, আপনি ভাল করেই জানেন দশ কিস্তিতে ভাগ করে দেব

'সরি, মিস্টার ওয়াগনার' মাথা নাড়লেন কর্মকর্তা, 'দেরি করে ফেলেছেন। সেটা এখন আর সম্ভব না। কাগজপত্র সব মিস্টার রানার নামে করা হয়ে গেছে। তা ছাড়া পুরো টাকা তিনি

একবারেই পরিশোধ করে দিয়েছেন। আপনাকে নিতে হলে নিরানব্বই বছর অপেক্ষা করতে হবে...'

'নিরানব্বই বছর! ইয়ার্কি পেয়েছেন!' সব রাগ রানার ওপর গিয়ে পড়ল দৈত্যের। তাকাল ওর দিকে। 'আপনি আমাদের ভাত মারতে এসেছেন কেন, মিস্টার? ভাল চান তো, টাকাপয়সা সব ফিরিয়ে নিন। কাগজপত্রগুলো আমার আর ফুপুর নামে করাব।'

'আপনি ওঁর ওপর জোর খাটাতে পারেন না, মিস্টার ওয়াগনার,' রানার হয়ে জবাবটা দিলেন কর্মকর্তা।

'খুব পারি!' গোঁয়ারের মত বলল ওয়াগনার। 'এই বিদেশির চেয়ে আমাদের দাবি অনেক বেশি।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'শান্ত হোন, মিস্টার ওয়াগনার। আপনাদের দ্বীপ আপনাদেরই থাকবে, আমি শুধু...

খপ্ করে এক হাতে রানার কোটের ল্যাপেল ধরে জোরে একটা ঝাঁকি দিল বিগ, 'কিছুটা শিক্ষা দিতে হবে, নাকি মানে মানে কেটে পড়বেন?'

কিছু না বলে মাথাটা শুধু এপাশ-ওপাশ নাড়ল রানা।

'অ্যাই! কী হচ্ছে এসব!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ম্যানেজার। 'দেখুন, মিস্টার ওয়াগনার, ব্যাঙ্কের মধ্যে মারপিট...

আরও লোক এসে বাধা দেয়ার আগেই হ্যাঁচকা টানে রানাকে শূন্যে তুলে মেঝের উপর আছড়ে ফেলল বিগ। মেঝেতে পড়েই লাথি চালাল রানা বিগের হাঁটুর পিছন দিকে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে বসে পড়ল বিগ বিশাল দেহ নিয়ে, এমনি সময়ে পাঁজরে এসে লাগল রানার জোড়া পায়ের লাথি। বার দুই ডিগবাজি খেয়ে উঠে দাঁড়াল বিগ। এদিকে রানাও উঠে দাঁড়িয়েছে ছয় ফুট দূর থেকেই দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ঝাঁপ দিল বিগ, টুঁটি টিপে মারবে রানাকে

ব্যাঙ্কের লোকেদের বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখের সামনে বিগের হাতদুটো ধরে ফেলল রানা, তারপর অতি সাবলীল ভঙ্গিতে বসে পড়ল মেঝেতে। বিগ যখন ভাবছে কাবু করা গেছে ব্যাটাকে, ঠিক

তখনই অনুভব করল ওর পেটে এসে ঠেকেছে রানার ভাঁজ করা দুই পায়ের জুতোর সোল। প্রচণ্ড বেগে পা দুটো ছুঁড়ল রানা উপর দিকে। শূন্যে উঠে গেল মিস্টার বিগের বিশাল শরীর, পুরো একটা পাক ঘুরে ধড়াস করে পড়ল চিৎ হয়ে। জোর ঝাঁকি সামলে নিয়ে মাথা ঘুরিয়ে পিছনে চেয়ে দেখল হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে বিদেশী লোকটা। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে করমর্দনের জন্য।

কয়েকজনের সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়াল ওয়াগনার, রানা বুঝল, যতটা না কাহিল হয়েছে, তার চেয়ে ভান করছে বেশি।

মিটমাট করিয়ে দেওয়ার একটা সুযোগ এসেছে মনে করে বিগের হাত ধরে টেনে আনলেন ম্যানেজার রানার কাছে।

'হাত মিলিয়ে নিন, মিস্টার,' বললেন তিনি। 'গোলমালটা আপনিই বাধিয়েছেন। প্রয়োজন হলে কোর্টে সাক্ষ্য দেব আমরা।'

'ওহ্হো, পরিচয়টাই তো সারা হয়নি এখনও,' হেসে বলল রানা, হাতটা বাড়িয়েই রেখেছে। 'আমি মাসুদ রানা। বিশ্বাস করুন, আমার জন্যে আপনাদের কোনও ক্ষতি...'

খপ্ করে রানার হাতটা চেপে ধরল দৈত্য। ব্যঙ্গের হাসি ফুটল মুখে। এইবার! বিশাল থাবায় চেপে গুঁড়ো করে দেবে বেয়াড়া লোকটার আঙুলগুলো। নিচু গলায় বলল, 'টাকাগুলো ফিরিয়ে নিন, মিস্টার রানা!'

আবার মাথা নাড়ল রানা।

ওয়াগনারের উদ্দেশ্য টের পেয়েছে রানাও, এবং সেজন্য প্রস্তুত। হাসি ফুটল ওর মুখেও। রানার হাতে চাপ দিতে গিয়ে চমকে উঠল দৈত্যটা, উধাও হয়ে গেছে ব্যঙ্গের হাসি। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে যেতে চাইছে মুখ। বিস্মিত চোখে তাকাল রানার মুখের দিকে। ওই হাতটায় এত শক্তি থাকে কী করে! ওর অর্ধেক ওজনের এক লোক ওকে এত ব্যথা দিতে পারে, বিশ্বাসই করতে পারছে না যেন।

অবাক হয়ে গেছেন ব্যাংক-কর্মকর্তা, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে

কর্মচারীরা। কিশোর ছেলেটাও অবাক। ওর বাবাকে পরাস্ত করতে পারে কেউ, কল্পনাতেও ছিল না ওর।

রানা চাপ আরেকটু বাড়ালে ভাঙতে শুরু করবে ওয়াগনারের হাতের হাড়। অন্য যে-কেউ হলে আর্তনাদ করত এতক্ষণে, ব্যথায় বিকৃত হয়ে যেত মুখ। কিন্তু ভাবান্তর নেই দৈত্যের মুখে। কোনও শব্দ বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে। অপরিসীম সহ্যশক্তি।

কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে যা বোঝার বুঝে নিল কিশোর ছেলেটা। এগিয়ে এসে রানার হাত ধরল ও। 'ছেড়ে দিন, আঙ্কেল। বাবা আর কোনও ঝামেলা করবে না।'

ছেলেটার অনুরোধ শোনামাত্র বিগের হাতটা অল্প একটু ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল রানা, বলল, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, মিস্টার ওয়াগনার।'

রানা ছেড়ে দিতেই বাবার হাত ধরে টানল ছেলেটা, 'চলো, বাড়ি যাই।'

এক হাত ডলতে ডলতে বেরিয়ে গেল দৈত্য ব্যাঙ্ক থেকে।

ফেরিবোটে আবার ওয়াগনার ও সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা হলো রানার। অসপ্রি আইল্যান্ডে চলেছে ওরা। বিশ-বাইশ জন যাত্রী। আশপাশের দ্বীপগুলোতে নেমে গেল কয়েকজন।

বোটের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে রানা। যেচে এসে নিজের পরিচয় দিল ছেলেটা, 'আঙ্কেল, আমি ভিকি।'

হেসে ওর কাঁধে হাত রাখল রানা 'তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে, ভিকি। কোন ক্লাসে পড়ো?'

ভিকিও হাসল। আলাপ জমে যেতে দেরি হলো না।

দূরে দাঁড়িয়ে বাঘের দৃষ্টিতে রানাকে দেখছে ওয়াগনার। হয়তো ভাবছে, ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে পানিতে ফেলে দেবে কি না। আপদ বিদেয় হয় তাহলে। রানা ওর মনের কথা টের পেয়ে মুচকি হাসল।

ঠিক এই সময় বামদিকের পানিতে একটা বিশাল ত্রিকোণ পাখনা ভেসে উঠল। পঞ্চাশ গজ দূরে মস্ত এক হাঙর। শক্তিশালী লেজের কয়েক ঝাপটায় চলে এল ওটা ফেরিবোটের বিশ গজের মধ্যে। ভাল করে দেখবে বলে এক দৌড়ে বোটের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল ভিকি। প্রচণ্ড এক হাঁক ছেড়ে সাবধান করল ওকে ওয়াগনার। আরও কয়েকজন যাত্রী চেঁচিয়ে উঠল। অন্যমনস্ক ছিল রানা, চেঁচামেচি শুনে তাকাল ওয়াগনারের দিকে। এমনি সময়ে আচমকা বড় একটা ঢেউ এসে দুলিয়ে দিল ফেরিবোট। লোকটার চোখে নিখাদ আতঙ্ক দেখে ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা, দু'হাত দু'পাশে তুলে তাল সামলাবার চেষ্টা করছে ভিকি—কিন্তু পারল না, ভারসাম্য হারিয়ে ঝপাৎ করে পড়ে গেল পানিতে। ঢেউয়ের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে ভিকি।

আকাশ ফাটিয়ে চিৎকাব দিল ওয়াগনার। মূর্তির মত জমে গেছে যাত্রীরা। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না, ধরেই নিয়েছে, চোখের সামনে দেখতে হবে ছেলেটার অকাল মৃত্যু।

হাঙরটার দিকে তাকাল রানা এবার। সামনে শিকার দেখে দ্রুত এগিয়ে আসছে ওটা। বোট থামাতে থামাতে বেশ কয়েক গজ পিছিয়ে পড়ল ভিকি, সাঁতার কেটে ফেরির কাছে আসতে পারবে না, তার আগেই ধরে ফেলবে হাঙর।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিল রানা, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই। ঢেউয়ের মধ্যে ভিকির কাছে পৌঁছে ওকে ধরতে কিছুটা সময় লাগল ওর। ততক্ষণে পাঁচ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে হাঙর।

ওয়াগনারের চিৎকার শুনেই ফেরিবোট থামিয়ে দিয়েছিল পাইলট, এবার রিভার্স গিয়ার দিল। কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে ওয়াগনার। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। সে-ও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু তাহলে তিনজনেই বিপদে পড়বে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে হাত বাড়াল নীচের দিকে। চেঁচিয়ে বলল, 'মিস্টার

রানা, এদিকে! এদিকে!'

ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে ভিকিকে নিয়ে যখন ফেরির কিনারে পৌঁছল রানা, হাঙরটা আর মাত্র দুই গজ দূরে। ফিরে তাকানোর সময় নেই ওর। ভিকিকে ওয়াগনারের বাড়ানো হাতের দিকে উঁচু করে ধরল। এক হাতে ভিকির হাত চেপে ধরল ওয়াগনার। বলল, 'আপনার হাতটা দিন! জলদি!'

এতক্ষণে ফিরে তাকাল রানা। হাঙরটা পৌঁছে গেছে। কামড় বসানোর জন্য কাত হয়ে যাচ্ছে একপাশে। সেদিকে তাকিয়ে যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হাত উঁচু করে দিল ও। টের পেল, কব্জি চেপে ধরছে শক্তিশালী একটা থাবা।

দুই হাতে দুজনকে ধরে একসঙ্গে বোটে টেনে তুলল ওয়াগনার।

শিকার ফসকে যাচ্ছে দেখে লাফ দিল হাঙর। মাথা উঁচু করে কামড়ে ধরতে চাইল রানার পা। কিন্তু পারল না। নাগালের বাইরে চলে গেছে শিকার। ফেরিবোটের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে গেল হাঙরটা–বড়ই হতাশ হয়েছে।

রানাকে অবাক করে দিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল বিশাল দৈত্য, বুকে জড়িয়ে ধরে আছে একমাত্র সন্তানকে। একটু সামলে নিয়ে রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ওয়াগনার। মুখে হাসি, চোখে পানি। 'মিস্টার রানা, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি আজ ওকে না বাঁচালে...' ভিকির দিকে তাকাল ও। আবার ফিরল রানার দিকে। 'আমাকে বিগ বলে ডাকবেন।'

বিগ ও ভিকির সঙ্গে দ্বীপে নামল রানা। পথ দেখিয়ে রানাকে নিয়ে চলল ভিকি, সব ঘুরিয়ে দেখাবে। মূল বাড়িটা ছাড়াও আরও চারটে বিল্ডিং আছে দ্বীপে। এক সময় এগুলো সব বসতবাড়ি ছিল। রানা ভাবছে, মেরামত করে এখন একটাকে করা যাবে ল্যাবরেটরি আর দ্বিতীয়টাকে স্টোররুম। তৃতীয়টা আপাতত

আগের মতই রেখে দেয়া হবে, পরে ভেবে দেখা যাবে কিছু করা যায় কি না।

চারটে বিল্ডিঙের সবচেয়ে ছোটটা রয়েছে পাহাড়ের মাথায়। লিভিং রুম থেকে সমস্ত আসবাব বের করে ফেলে, এটাকে ওর কাজের ঘর বানিয়েছিল বিগ। কার্পেট সরিয়ে মেঝেতে টাইলস বসানো হয়েছে। দেয়ালগুলোতে নতুন প্লাস্টার। ঘরের ঠিক মাঝখানে মেঝেতে বোল্ট দিয়ে আটকানো বারো ফুট লম্বা ও ছয় ফুট উঁচু একটা সিলিন্ডার বসানো হয়েছে। এক প্রান্তে একটা গোলাকার হ্যাচ, মাঝখানে ছোট একটা পোর্টহোল। সিলিন্ডার থেকে কিছু প্লাস্টিকের নল আর বৈদ্যুতিক তার বেরিয়ে গিয়ে যুক্ত হয়েছে দেয়ালে বসানো কন্ট্রোল প্যানেলে। সিলিঙে কয়েকটা চল্লিশ ওয়াটের ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাগিয়ে ঘরে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরটা ডিকম্প্রেশন চেম্বার, আর সিলিন্ডারের মত জিনিসটা ডিকম্প্রেশন মেশিন। গভীর সাগরে ডুব দিতে গিয়ে কেউ নাইট্রোজেন বেন্ডে আক্রান্ত হলে এই মেশিনে ভরে চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলা যায়। খুব সস্তায় বিক্রি করে দিচ্ছিল নেভি। ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিনে নিয়েছে বিগ। এদিকে টুরিস্ট বাড়লে মাছধরা ব্যবসার পাশাপাশি ডাইভিং ব্যবসা খোলারও ইচ্ছে ছিল ওর। বাড়িটাকে নতুন করে সাজানোর উদ্দেশ্যও ডাইভিং ব্যবসা। টুরিস্ট এলে যাতে থাকতে পারে।

সব ঘুরে দেখে মূল বাড়িতে ফিরে এল ভিকি ও রানা। ভিক্টোরিয়ান চেহারার বাইশ কামরার একটা পুরনো বাড়ি এটা। কাঠামো বদল না করে, প্রাচীন, জরাজীর্ণ বিল্ডিংটাকে মেরামত করে নতুনভাবে সাজানো যাবে, ভাবল রানা। শোবার ঘর, বসার ঘর, খাবার ঘর, অফিস-কাম-লাইব্রেরি, যোগাযোগের জন্য রেডিও রুম—সবকিছুর ব্যবস্থা হওয়ার পরেও অনেকগুলো ঘর খালি পড়ে থাকবে। দ্বীপটার মতই বাড়িটাও খুব পছন্দ হয়ে গেল ওর। অফিস-কাম-লাইব্রেরি ঘরটা বিশাল, উঁচু ছাত, খোলামেলা।

বড় ফায়ারপ্লেস আছে। আর আছে বড় বড় ফ্রেঞ্চ ডোর। জানালা দিয়ে ফিশার আইল্যান্ড দেখা যায়। পরিষ্কার দিনে দূরের লং আইল্যান্ডও চোখে পড়ে।

মিসেস মেলভিলের সঙ্গে দেখা করতে গেল রানা, সঙ্গে ভিকি ও তার বাবা। রান্নাঘরে কাজ করছিলেন। একটা চোখ টিভিয় ওয়েদার চ্যানেলের দিকে সাড়া পেয়ে ফিরে তাকালেন। ওয়াগনার ও ভিকির সঙ্গে রানাকে দেখে কুঁচকে গেল ভুরু।

মিসেস মেলভিলের বয়স বাষট্টি, বিধবা, নিঃসন্তান, দ্বীপের প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সদস্যা, বিগের ফুপু। এই দ্বীপেই জন্মেছেন। পরিবারের লোকেরা দ্বীপ ছেড়ে চলে গেলেও তিনি যাননি। বিগ ও ভিকিকে নিয়ে থেকে গিয়েছিলেন। ভিকি ওয়াটারবোরোর স্কুলে পড়ে। হোস্টেলে থাকে ছুটিতে দ্বীপে চলে আসে। আর ওর বাবা বিগ ওয়াগনার তিনটে বোট নিয়ে মাছের ব্যবসা চালায়।

পরিচয় করিয়ে দিল ভিকি, 'দাদী, রানা আঙ্কেল।'

'তারমানে লিজ নিতে পারিসনি?' ভাইপোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন মিসেস মেলভিল।

মাথা নাড়ল ওয়াগনার।

'ও! তাহলে বিদেশী লোকটার হাতেই ছেড়ে দিলি বাপ-দাদার ভিটে!' তারপর আর কোনও কথা না বলে রান্না ফেলে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলেন। মস্ত রান্নাঘরের তাকে সাজানো রয়েছে রান্না ও পরিবেশনের সমস্ত সরঞ্জাম—সপ্তদশ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে তৈরি জিনিস সব, মিউজিয়াম-কোয়ালিটি। তার মধ্যে রয়েছে ডিশ-প্ল্যাটার-মগ, অনেক বড় বড় বোতল, বাসনকোসন, বাটি, কাপ-পিরিচ, মোমদানি।

হেসে এগিয়ে গেল রানা। 'কী ব্যাপার, আন্টি? জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন যে? নিজের বাড়ি ছেড়ে পালাবেন?'

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালেন মিসেস মেলভিল। 'থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না। দ্বীপ থেকে আমাদের তাড়ানোর

ব্যবস্থা করে এলে...তুমিই বলে ফেললাম, কিছু মনে কোরো না। আমার ভাইপোর চেয়ে ছোট তুমি...

'না না, মনে করব কী? তুমিই তো বলবেন, আন্টি।'

ঘুরে দাঁড়ালেন মিসেস মেলভিল। কুঁচকে ফেললেন ভুরু। 'মুখে মিষ্টি কথার তো ফুলঝুরি দেখছি। নাকি এটা ভড়ং?'

'একেবারেই না। যা বলি, সরাসরি সহজ করেই বলি। ভড়ং-ফড়ং কিংবা ন্যাকামি আপনার মত আমারও ভাল লাগে না। শুনুন, যে কারণে আপনার ভাইপো রাগ করেছিল আমার ওপর, আপনি রাগ করছেন, আসলে সেটা কোনও ব্যাপারই নয়। এ বাড়ি, এই দ্বীপ আপনাদের ছিল, আপনাদের আছে, আপনাদেরই থাকবে। আমি লিজ নিয়েছি, তাতে কী? আমাকেও আপনার আরেক ভাইপো মনে করুন না, তা হলেই তো মিটে যায় সব ঝামেলা।'

মিসেস মেলভিলের কোঁচকানো ভুরু স্বাভাবিক তো হলোই না, আরও বেশি কোঁচকাল। 'তোমার মিষ্টি মিষ্টি কথার মধ্যে কী গূঢ় উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে, বলো তো হে, বাপু! আর কী ক্ষতি করবে আমাদের?'

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না!'

'আগে বলো শুনি, কেন বিশ্বাস করব? কী কাজ করো তুমি? এই দ্বীপ নিয়ে কী করবে?'

'আসলে কী কাজ করি, সেটা খুবই গোপনীয়, কাউকে বলা যাবে না। তবে সেটা সরকারী কাজ; অন্যায় বা অসৎ কিছু নয়, এটুকু বিশ্বাস করতে পারেন। আর দ্বীপ নিয়ে কী করব? অ্যাডভেঞ্চার, সাগর, তিমি, হাঙর খুব ভাল লাগে আমার। দ্বীপটা লিজ নিলাম, বছরে-দু'বছরে একবার এখানে এসে সাগরের খোলা হাওয়ায় বেড়াব বলে। সাগর দেখব, ডুব দিয়ে সাগরের প্রাণী দেখব, পাখি দেখব, কিছুটা গবেষণা করব।'

'কিন্তু এর জন্যে গোটা দ্বীপ দখলের কী দরকার ছিল? আমাদের কাছে এসে বললেই তো হতো, থাকতে কি দিতাম না?'

'তা দিতেন। কিন্তু আপনারাই তো দ্বীপের মালিক হতে পারছিলেন না, আমাকে দিতেন কী করে? ওরা ইন্সটলমেন্টে রাজি নয়, আমি না নিলে অন্য কাউকে দিয়ে দিত ব্যাংক, তখন কী করতেন?'

'চলে যেতাম, এখন যেমন যচ্ছি।' আবার জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলেন মিসেস মেলভিল।

'আমার একটা কথা... আন্টি। নিজেই ভেবে দেখুন, এই দ্বীপ ছেড়ে চিরকালের জন্যে চলে যাবেন, কোনদিন আর ফিরবেন না, থাকবেন না, জঙ্গলে ঘুরবেন না, এখানকার সৈকতে হাঁটবেন না...জন্মের পর থেকে এতকাল এই দ্বীপে কাটিয়ে এখন এই বয়েসে আর কোথাও গিয়ে কী শান্তি হবে আপনার?'

'হবে না। কিন্তু কী করব?'

'আপনার বকটাকে খাবার দেবে কে?' এতক্ষণে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ল রানা। 'অন্য কোনখানে নিয়ে গিয়ে মনে হয় না বাঁচাতে পারবেন। ওটাই বা যেতে রাজি হবে কেন?'

থমকে গেলেন মিসেস মেলভিল। 'কিন্তু তাই বলে অন্যের জায়গায় থাকবই বা কেন আমরা?'

'শুনুন, এটা অন্যের জায়গা নয়, আপনাদেরই জায়গা। আমি কথা দিচ্ছি, কোনদিন আপনাদের কোনও কাজে বাধা দেব না। যেভাবে যা চলছিল, সেভাবেই চলবে। আপনার ভাইপোর মাছধরার ব্যবসাও চলবে। ছুটি পেলে মাঝে মাঝে আমি এসে যে ক'দিন থাকি–দু'তিন বছরে হয়তো এক-আধবার–সে ক'দিন নাহয় আমার কিছুটা অত্যাচার মেনেই নিলেন। আমাকে পেয়িং গেস্ট হিসেবে সাত-আটটা দিন সহ্য করতে পারবেন না? আপনি চলে গেলে আমার খাওয়া-দাওয়ার কী হবে? সাতদিন কি আমি না খেয়ে থাকব? আপনারা থাকলে দ্বীপটা ভাল থাকবে, বিগের বোটগুলো তখন কিছুদিনের জন্যে ভাড়া নিতে পারব। তাঁর কিছুটা সময়ও হয়তো আমি নিতে চাইব–আমাকে নিয়ে সাগরে ঘোরার

জন্যে, হাঙর-তিমি দেখব আমি...অবশ্য এরজন্যে উপযুক্ত সম্মানী দেব, আর বোটের তেল ও অন্যান্য খরচখরচা সব আমার...

'করুণা কি চাই আমরা?' নরম হলেন না মিসেস মেলভিল। ভাইপোর দিকে তাকালেন। 'হাঁ করে দেখছিস কী? জিনিসপত্র গুছিয়ে নে। নাকি অন্যের দয়ার ওপর...'

'তুমি ভুল করছ দাদী,' বাধা দিল ভিকি। 'রানা আঙ্কেলের কথা শুনলেই সব দিক থেকে ভাল হবে...'

'ও, তুইও...'

'আগে সব শোনো তো,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ভিকি।

ব্যাংকে ঢোকার পর থেকে ওকে হাঙরের মুখ থেকে উদ্ধার করা পর্যন্ত সব ঘটনা দাদীকে খুলে বলল ভিকি।

ওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাক থেকে নামানো জিনিসগুলো আবার আগের জায়গায় সাজিয়ে রাখতে শুরু করলেন মিসেস মেলভিল। রানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এইজন্যেই তা হলে জামা-কাপড়ের এই হাল! ভিজে একেবারে... হাঁ করে দেখছ কী? কাপড় ছাড়ো। হাতমুখ ধোও। খিদেটিদে পায়নি নাকি?'

এতক্ষণে হাসি ফুটল রানার মুখে। ব্যস্ত হয়ে বলল, 'পায়নি মানে? পেটের মধ্যে ছুঁচো দৌড়ঝাঁপ করছে। ভিকি, বাথরুমটা কোন্‌দিকে দেখাও তো, ভাতিজা!'

তিন বছর আগের কথা ভেবে মুচকি হাসল রানা। অফিসে ঢুকল। দ্বীপে এলে এই ঘরটাতেই কাটে ওর বেশিরভাগ সময়। তিন বছর আগের মতই বাসনপেয়ালা ধুচ্ছিলেন মিসেস মেলভিল। একটা চোখ টিভির ওয়েদার চ্যানেলের দিকে। পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন।

'মর্নিং, আন্টি,' হাসিমুখে রানা বলল।

'এতক্ষণে মর্নিং?' মিসেস মেলভিল জবাব দিলেন। 'সকাল তো সেই কখন শেষ হয়ে গেছে। হাঙরের পিছু নিয়েছিলে নাকি?'

'নিয়েছিলাম। কিন্তু সাগরের নীচে কীসে যেন আটকে গেছে সেন্সরটা। কী আর করব। ফিরে এলাম।'

'ভিকি আর ওর বাপ কই?'

'ভিকি ওয়ান উইংকে খাওয়াচ্ছে। বিগ গেছে ডিকম্প্রেশন চেম্বারে গ্যাস ট্যাংক ভরতে। ডাইভিং ইকু্যইপমেন্ট নিয়ে আবার বেরোব। সেন্সরটা তুলে নিতে পারলে হাঙরটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।'

'স্যান্ডউইচগুলো যে বানিয়ে দিয়েছিলাম, খেয়েছ?'

'খাব না মানে? এত ভাল স্যান্ডউইচ না খেয়ে ফিরিয়ে আনব?' হাসল রানা। 'আরও থাকলেও খালিবাটি ফেরত আসত।'

'বিগ রাক্ষসটাই নিশ্চয় বেশিরভাগ সাবাড় করে দিয়েছে?'

'আরে না, ভিকি আর আমি আছি না? ও আমাদেরকে প্রতিযোগিতায় হারাতে পারেনি। আসলে কারও ভাগেই কম পড়েনি।' প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করল, 'আবহাওয়ার খবর কী?'

'সামান্য বৃষ্টি হবে হয়তো, তাতে ব্যাঙের মোজাও ভিজবে না,' জবাব দিলেন আন্টি। 'তবে পুয়ের্টো-রিকোতে একটা বিপজ্জনক নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে।'

ঝড়কে ভীষণ ভয় পান মিসেস মেলভিল, জানে রানা। সেজন্যই সব সময় টেলিভিশনে আবহাওয়ার খবর দেখেন। তাঁর তিন বছর বয়েসে নিউ ইংল্যান্ডে আঘাত হানে ভয়ঙ্কর হারিকেন, তছনছ করে দেয় সব। প্রচণ্ড ঝড় আস্ত বাড়িঘর উড়িয়ে নিয়ে সাগরে ফেলে, এটা তিনি মনে করতে পারেন। এই দ্বীপে থাকার সময় আরও প্রায় আধ ডজন বড় ঝড়ের কবলে পড়েছেন তিনি। শেষ যে বড় ঝড়টার কবলে পড়েন, ওটার নাম হারিকেন বব। বিশাল বিশাল গাছ উপড়ে তুলে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সাগর থেকে তুলে এনে দ্বীপে ফেলেছিল একটা মস্ত বড় ফিশিং বোট। 'যা ভয় পেয়েছিলাম!' বলেছেন তিনি। 'ঝড়টা আসছে জানলে আগে থেকেই সতর্ক হতে পারতাম। মেইনল্যান্ডে চলে যেতে

পারতাম। তবে এরপর আর ঝুঁকি নিইনি। ধার করে ডিশ কিনেছি।'

'হুঁ, তারমানে আবহাওয়া নিয়ে আপাতত চিন্তা নেই।' মিসেস মেলভিলকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আমার কোন খবর আছে? ফ্যাক্স? টেলিফোন?'

'একটা ফ্যাক্স এসেছে, আর একটা টেলিফোন।'

'টেলিফোনটা কার?'

'বলল সোহেল নামটা বললেই নাকি চিনতে পারবে।'

মুচকি হাসল রানা। ফোনের দিকে এগোল। রিসিভার তুলে ডায়াল করল সোহেলকে।

একবার রিঙ হতেই রিসিভার তোলা হলো ওপাশ থেকে।

রানা বলল, 'এই, শালা, খোঁচাখুঁচি করছিস কেন?'

'আমি না, ওটা করছেন তোর বাপ। বুড়ো ফোন করেছিল। তোকে না পেয়ে প্রচুর ধমকধামক, যেন সব দোষ আমার। আমি যখন বললাম, পাওনা ছুটি নিয়ে অসপ্রি আইল্যান্ডে গেছিস, টেলিফোনে গলা শুনেই বুঝলাম, চেয়ার থেকে উঠে রাগে নাচতে আরম্ভ করেছেন...'

'অ্যাই শালা, আমি না বলে এসেছি তোকে, ফোন করলে বলবি: শরীর ভাল না, বিশ্রাম নিচ্ছি...'

'বললে কী আর শোনে। আমার মুখ থেকে ঠিকই কথা বের করে নিয়েছে। বোধহয় খুব জরুরি...'

'যত জরুরিই হোক, আমি এখন আসতে পারব না। বহুকাল বাদে একটা মজার কাজ পেয়েছি...প্লিজ, দোস্ত, সোনা ভাই আমার, ম্যানেজ কর। দরকার হয় আমিই তোকে দুলাভাই ডাকব এখন থেকে।'

'মেয়েটা কি খুব সুন্দরী?'

'তা বলতে পারিস। তবে প্রেগনেন্ট হয়ে পড়েছে দোস্ত!'

'এই সেরেছে! বুড়ো জানলে...'

'বুড়ো জিজ্ঞেস করলে বলিস, মেয়েটা ষোল্লো ফুট লম্বা। এক টন ওজন...'

'ইয়ার্কি মারছিস?'

'না না, সত্যি। কসম!'

'একটা মেয়ের এত্ত ওজন, বিটলামি? ছাগল পাইছ আমারে?'

'ও একটা গ্রেট হোয়াইট শার্ক।' হাঙরটার কথা খুলে বলল রানা। শুনতে শুনতে সোহেলও আগ্রহী হয়ে উঠল। 'ইস্, এখানে কাজ না থাকলে আমিও তোর কাছে চলে আসতাম রে। দারুণ মৌজে আছিস, বোঝা যাচ্ছে!'

'তাহলেই বোঝ। বোঝা ভাই, বুড়োটাকে একটু...'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, দেখি কী করতে পারি। ওদিকের খবর জানাস। আমিও হাঙরটার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে রইলাম।'

রিসিভার রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। হেলান দিল চেয়ারে। টেবিলে রাখা ফ্যাক্সের কাগজটা টেনে নিল। এই সময় মুখ কালো করে ঘরে ঢুকল বিগ।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'কম্প্রেসরটা কাজ করছে না। প্রথমে ভেবেছিলাম সলিনয়েড গেছে। দেখলাম সলিনয়েড ঠিকই আছে। মনে হচ্ছে ইঞ্জেকটরে ময়লা। খুলে সাফ করতে সময় লাগবে। কালকের আগে হবে না। একটা ট্যাংকেও গ্যাস নেই। সেন্সর তুলতে আজ আর বেরোতে পারছি না। হাঙরটা গেল!'

'যাবে আর কোথায়। ঠিকই খুঁজে বের করব। আপনি অত চিন্তা করবেন না। মেরামতের ব্যবস্থা করুনগে।'

বেরিয়ে গেল বিগ।

ফ্যাক্সটার দিকে তাকাল আবার রানা।

ডক্টর ক্যারোলিন কিন নামে ক্যালিফোর্নিয়ার এক জীববিজ্ঞানী পাঠিয়েছেন। জানিয়েছেন ট্রেনিং দেয়া সি লায়নের সাহায্যে ধূসর

তিমির ভিডিও ছবি তোলার মত কঠিন একটা কাজকে সম্ভব করতে পেরেছেন তিনি। ভীষণ চঞ্চল আর লাজুক এই ধূসর তিমিরা কোনমতেই মানুষকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না, হাতে গোনা কয়েকজন ডাইভার ক্যামেরা নিয়ে ডুব দিয়ে বহু কষ্টে কিছু ছবি তুলতে পেরেছে, তবে সেসব ছবি এতটাই দূর থেকে তোলা, অস্পষ্ট ছায়া ছাড়া আর কিছুই বোঝা যায় না। ডুবুরির উপস্থিতিতে প্রাণীগুলোর আচার-আচরণ স্বাভাবিক ছিল কিনা সেটাও বোঝার উপায় নেই ছবি দেখে। ডক্টর কিনের বিশ্বাস, সাগরে যেহেতু সি লায়নের সঙ্গে বসবাসে অভ্যস্ত এই তিমিরা, কাছে ঘেঁষতে দিতে আপত্তি করবে না, নিজেদের স্বাভাবিক আচরণও বহাল রাখবে। আর তাই সি লায়নের মাথায় ক্যামেরা বেঁধে দিয়ে তিমির একেবারে কাছ থেকে ছবি তোলার বুদ্ধি করেছিলেন তিনি। কয়েকটা লায়নকে ট্রেনিং দিয়ে ছবি তুলতে পাঠিয়ে অসামান্য সাফল্য পেয়েছেন।

ধূসর তিমির ওপর গবেষণার এই সাফল্য উদ্বুদ্ধ করেছে ডক্টর কিনকে, আরেক প্রজাতির তিমির ওপর বর্তমানে গবেষণা চালাচ্ছেন, আটলান্টিকের কুঁজো তিমি। অসপ্রি আইল্যান্ডে রানা সামুদ্রিক জীব-জন্তু নিয়ে গবেষণা করছেন, খবর পেয়েছেন তিনি। হাঙর ও তিমি সম্পর্কে রানার লেখা কিছু অভিনব তথ্য পড়েছেন পত্রিকায়। চমৎকৃত হয়েছেন তিনি। নতুন তথ্য, নতুন আইডিয়া পেয়েছেন।

উত্তরে পাড়ি জমানোর পথে প্রতি গ্রীষ্মে অসপ্রি আইল্যান্ডের পূর্ব দিক ঘেঁষে যায় কুঁজো তিমিরা। ডক্টর কিন জানতে চেয়েছেন সি লায়নের টিম নিয়ে এলে তাঁকে কুঁজো তিমির ছবি তুলতে সাহায্য করতে পারবে কিনা রানা। তিনি জেনেছেন, দ্বীপটা এখন রানার। তাই দ্বীপে থাকা-খাওয়া, বোট ভাড়া ইত্যাদির জন্য প্রতি মাসে দশ হাজার ডলার করে ফি দিতে চান। রানা রাজি থাকলে দেরি না করে জানাতে অনুরোধ করেছেন।

ফ্যাক্সটা পড়ে ভাবতে লাগল রানা। টাকা রানা নেবে না। কিন্তু সি লায়নের সাহায্যে তিমির ছবি তোলার অভিনব আইডিয়াটা কৌতূহলী করে তুলল ওকে। নিশ্চয় তিমির মতই হোয়াইট শার্কের ছবিও তুলে আনতে পারবে ডক্টর কিনের সি লায়ন। এ কাজে বিগের বোটগুলো ব্যবহার করতে হবে। তাই জবাব দেয়ার আগে ওর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। তা ছাড়া সি লায়নগুলোকে রাখার জায়গা করে দেয়ার জন্যও বিগের সাহায্য দরকার।

বারো

পিচ্ছিল পাথরে পা পিছলাল ভিকির। সামলাতে পারল না, হড়হড় করে নেমে যেতে শুরু করল, একটু পরেই অবাক হয়ে দেখল গোড়ালি-পানিতে দাঁড়িয়ে আছে। অসাবধান হওয়ার জন্য নিজেকে বকা দিল ও। পানিতে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে হেঁটে এসে দাঁড়াল একসারি ছোট টিলার কাছে। একটাতে চড়ল। তারপর চূড়া থেকে চূড়ায় লাফিয়ে এগোতে থাকল। আবার যাতে পা না পিছলায় সে-ব্যাপারে খুব সাবধান এখন। জোয়ারের পানি পাথরগুলোকে একেবারে যা-তা রকম পিচ্ছিল করে রাখে।

বকটাকে মাছ খাইয়ে এসেছে। রানা আঙ্কেল ও বাবা এখন ব্যস্ত। ওর কিছু করার নেই। তাই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দ্বীপে ঘুরতে ভাল লাগে ওর। স্কুল ছুটি হলেই চলে আসে। এবারের ছুটিটা অনেক ভাল লাগছে। রানা আঙ্কেল এসেছে। হাঙরের পিছনে ঘুরে বেড়ানোর সময় তাকেও সঙ্গে

নিচ্ছে। দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। ভাগ্য ভাল হলে, সেন্সরটা তুলবার সময় ওকে সঙ্গে নিতে রাজি করিয়ে ফেলতে পারবে রানা আঙ্কেলকে। সব সময় সাগরের কাছাকাছি থাকলেও ডুবুরির পোশাক পরে সাগরে ডুব দেয়ার সুযোগ হয়নি কখনও ওর।

ভাবতে ভাবতে চলেছে ও। দ্বীপের কিনার ধরে প্রায় অর্ধেকটা ঘুরে এসে দূরের দক্ষিণ প্রান্তটার কাছে পৌঁছুল। কিনারে পড়ে থাকা অসংখ্য পাথর পানিতে ভেজা, পিচ্ছিল। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে এগোনোর সময় সাবধান থাকতে হচ্ছে। পা পিছলালেই আগের বারের মত পানিতে পড়বে।

পাথরের মাঝখানে বেসিনের মত তৈরি হয়েছে এক জায়গায়, ছোটখাট একটা ডোবা বলা চলে। জোয়ারের পানি নেমে গেলেও ডোবাটা ভরে আছে পানিতে। সেখানে এসে দাঁড়াল ভিকি। চমৎকার এক প্রাকৃতিক অ্যাকুয়েরিয়াম। কাছে এসে ঝুঁকে তাকাল ও। প্রচুর জলজ প্রাণী আটকা পড়েছে ওখানে। ওকে দেখে বিচিত্র ভঙ্গিতে পাশে হেঁটে পাথরের ফাঁকফোকরে লুকিয়ে পড়ছে ছোট ছোট কাঁকড়া। পানির তলায় স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে গেঁড়ি শামুক, ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে পরবর্তী জোয়ারের, তখন আবার সাগরের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি হবে বেসিনের, বেরিয়ে যেতে পারবে ওগুলো। ভিকিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাহস করে আবার বেরিয়ে এল কাঁকড়ার দল। ব্যস্ত হলো নিজেদের কাজে মূল কাজ ওদের দুটো—খাওয়া ও খাবারের দখল নিয়ে মারামারি। পরাজিতরা বসে থাকছে না, খাবারের আশায় চলে যাচ্ছে অন্য দিকে কিছুক্ষণ দৃশ্যটা উপভোগ করে আবার এগোল ভিকি

বড় বড় পাথরগুলো পাখির বিষ্ঠায় ছাওয়া। পাথরে ছড়িয়ে আছে বড় বড় শামুক আর কাঁকড়ার খোলা। ঠোঁটে চেপে তুলে নিয়ে আকাশ থেকে পাথরের ওপর ফেলে খোসা ভেঙে ভিতরের মাংস খেয়েছে সামুদ্রিক পাখিরা। পানির কিনার ঘেঁষে থাকা ছোট

আকারের পাথর ছেয়ে আছে অ্যালজি আর সামুদ্রিক শৈবালে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জমে রয়েছে দেশলাইয়ের খালি বাক্স, খাবারের প্যাকেটের প্লাস্টিকের মোড়ক, সোডার ক্যান। বোট থেকে ফেলা এসব বর্জ্য ঢেউয়ের ধাক্কায় তীরে এসে জমা হয়।

আরও এগোল ভিকি। একটা জায়গায় পাথর অনেক বেশি পিচ্ছিল। ওগুলোতে চড়া অসম্ভব মনে হলো ওর কাছে। পা পিছলাবেই। পাথর ডিঙানোর অকারণ ঝামেলায় না গিয়ে সরে এসে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগোল। লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে বিশ-তিরিশ গজ এগোতে পাথরের চাঙড়টা চোখে পড়ল। এতবড় পাথর আর দেখেনি। প্রায় পনেরো ফুট উঁচু আর বিশ ফুট লম্বা ওই পাথরটা নিশ্চয় বরফ যুগের শেষ দিকে বরফগলা পানিতে কাটা পড়ে পাহাড়ের গা থেকে আলাদা হয়ে গেছে। অবাক বিস্ময়ে ওটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখল ও। তারপর পাহাড় থেকে নেমে পানির ধারের পাথরগুলোর কাছে যাওয়ার পথ খুঁজল।

দুটো ঝোপের মাঝখান দিয়ে সাবধানে এগোল ও। আলগা পাথরে পা পড়ে কিনা খেয়াল রেখে ঢাল বেয়ে নেমে চলল

চোখ পড়ল পানির দিকে। দশ গজ দূরে কিছু দেখেছে বলে মনে হলো। কী, বুঝতে পারছে না। বড় কোনও জানোয়ার সাঁতরে বেড়াচ্ছে যেন পানির নীচে। ডলফিন? নাকি বড় মাছের ঝাঁক ছোট মাছের ঝাঁককে ঘেরাও করে আক্রমণ চালিয়েছে। তাকিয়ে রইল ও। কিন্তু ভেসে উঠতে দেখল না কোন ডলফিনের পিঠের পাখনা।

আবার নামতে লাগল ও। পৌঁছে গেল পানির কিনারের ভেজা পাথরগুলোর কাছে। সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে চলল। একপাশে সাগর, একপাশে পাহাড়।

পিছনে মৃদু ছলাৎ শব্দ হলো পানিতে। যেন বড় কোনও প্রাণী পানিতে ভেসে উঠে আবার ডুবে গেল। ফিরে তাকাল ও। তীর

থেকে সামান্য দূরের আয়নার মত মসৃণ পানিতে গোল ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে। ঢেউয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে একটা গোলাকার কিছু অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ল। ভিকি তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল।

এই এলাকায় কাছিম বা সিল আছে কি না জানে না ও। প্রাণীটা যা-ই হয়ে থাকুক, দেখার কৌতূহল বেড়ে গেল ওর।

কিন্তু এবারও কিছু দেখল না। পাথরে পাথরে পা রেখে আরও কয়েক গজ এগিয়ে সামনের তরাই অঞ্চলটার দিকে তাকিয়ে রইল। দ্বীপের এদিককার পাথরগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট। জঞ্জালও বেশি। সোডার বাতিল ক্যান, নষ্ট বয়া, প্লাস্টিকের মোড়ক, আর...

কী ওটা?

দশ-পনেরো গজ দূরে কতগুলো বড় পাথর রয়েছে—অর্ধেক পানিতে অর্ধেক ওপরে। সেই পাথরের ফাঁকে আটকে রয়েছে একটা মরা জানোয়ার।

কাছে এসে চিনতে পারল, হরিণের মড়া। প্রচণ্ড খিদেয় ওটাকে খুবলে খেয়েছে যেন কোনও হিংস্র জানোয়ার। চামড়া, মাংস চিরে ফালা ফালা করা। পচেনি এখনও, মাছি ভনভন করছে না, তারমানে হরিণটা মারা হয়েছে অল্প কিছুক্ষণ আগে। মাছিরা খোঁজ পায়নি এখনও। এতবড় একটা প্রাণীকে এভাবে কে মারল? মানুষ? গুলির ফুটো খুঁজল ও। দেখতে পেল না।

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে হঠাৎ কী মনে পড়তে ফিরে তাকাল হরিণটার মাথার দিকে। ঝাঁকি লেগে পিছলে গেল পা। সোজা হয়ে দুই হাত ডানার মত ছড়িয়ে দিয়ে সামলানোর চেষ্টা করল। পারল না। চিত হয়ে পড়ে গেল পানিতে।

পানি বেশি না ওখানে। তিন-চার ফুট হবে। সোজা হয়ে দাঁড়াল। পায়ের নীচে আলগা নুড়ি ছাওয়া।

হঠাৎ মনে হলো পিছন থেকে কেউ দেখছে ওকে। পানি ঠেলে

এগিয়ে আসছে যেন বড় কিছু। ফিরে তাকিয়ে পানিতে সেই অদ্ভুত গোলাকার জিনিসটা দেখল আবার। ওর দিকেই এগোচ্ছে।

পানিতে থাবা দিয়ে ওটাকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করল ও। ভয় পেল না ওটা। একইভাবে এগিয়ে আসতে থাকল।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিপদ সঙ্কেত দিচ্ছে। ভড়কে গেল ভিকি। মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ। আর থাকতে সাহস করল না ওখানে। ঘুরে দাঁড়িয়ে তীরের দিকে এগোল। পানি ঠেলে তাড়াতাড়ি ওঠার জন্য দুই হাত ব্যবহার করছে বৈঠার মত। সামনের দিকে সামান্য কুঁজো হয়ে গেছে শরীর। কোমরসমান পানি ঠেলে এগোচ্ছে...এক গজ...দুই গজ...পা পিছলে যাচ্ছে আলগা নুড়িতে। এগোনো কঠিন করে তুলছে। হাত বাড়িয়ে দিল সামনে কোন কিছু ধরে নিজেকে টেনে তুলতে চাইছে। হাত পড়ল হরিণের মাথাটায়। ওটাই আঁকড়ে ধরল। তীক্ষ্ণ কিছু বিঁধে গেল হাতের তালুতে। ব্যথা পেলেও মাথাটা ছাড়ল না ও, টান কমাল না।

শুকনো পাথরে টেনে তুলল অবশেষে নিজেকে। উঠে দাঁড়াল। টলছে। কিন্তু একটা মুহূর্তও দেরি না করে দৌড়ে উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। হাঁপানোর শব্দ গোঙানির মত বেরিয়ে আসছে মুখ দিয়ে। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার আগে থামল না। ফিরে তাকাল পানির দিকে। অদৃশ্য হয়ে গেছে গোল জিনিসটা। স্থির পানিতে আবার ছড়িয়ে যাচ্ছে সেই গোলাকার ঢেউ।

ঠাণ্ডায় ও আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ির দিকে দৌড়াতে শুরু করল ও। হাত মুঠো করতে গিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যথাটা টের পেল আবার। তাকিয়ে দেখে, চামড়ায় বিঁধে আছে ছোট্ট একটা অদ্ভুত জিনিস।

মুখ তুলে লিভিং রুমের দরজায় ভিকিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। চুপচুপে ভেজা। গা থেকে ঝরে পড়া পানি পায়ের কাছে জমে যাচ্ছে। কাঁপছে ভিকি। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। ঠোঁট

নীল। আতঙ্কিত।

'ভিকি!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ঠেলা লেগে চেয়ারটা উল্টে গিয়ে পড়ল দেয়ালে। ফিরেও তাকাল না। ছুটে এল ভিকির কাছে। 'কী হয়েছে?'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে বসে পড়ে ভিকির জুতোর ফিতে খুলতে শুরু করল রানা। 'পাথর থেকে পড়ে গিয়েছিলে?'

'একটা হরিণ!' জবাব দিল ভিকি।

'হরিণ? কীসের হরিণ?'

কথা বলতে গিয়ে গোঙাতে লাগল ভিকি। বুক-পিঠে এক ধরনের খামচে ধরা অনুভূতি। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেতে লাগল

'থাক, কথা বলার দরকার নেই।' ভিকির জুতো খুলে দিল রানা। মোজা, প্যান্ট, আন্ডারওয়্যার, সব খুলে ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে। হলের আলমারি থেকে দুটো বড় তোয়ালে নিয়ে এসে একটা দিয়ে ভিকির গা মুছে দিল, আরেকটা জড়িয়ে দিল গায়ে হাত ধরে টেনে এনে একটা সোফায় বসাল

'হরিণ এখানে আসে শুনেছি,' রানা বলল। 'সাঁতরে নাকি চলে আসে ব্লক আইল্যান্ড থেকে। মনে হয় মিসেস মেলভিলের চারাগাছগুলোর ওপর লোভ। গা ভর্তি লাইম পোকা, কামড়ালে নাকি পাগল হয়ে যায় মানুষ...

'হরিণটা মরা!' রানাকে থামিয়ে দিল ভিকি

'তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। সাগর সাঁতরে পাড়ি দিতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল...

'না! ডুবে মরেনি। ওটাকে খুন করা হয়েছে...খুন করে খুবলে খেয়েছে...' থেমে থেমে কথা বলছে ভিকি, কাঁপুনি এখনও বন্ধ হয়নি। 'বিশাল একটা পাথরের কাছে চলে গিয়েছিলাম...ওটার নীচে পানিতে পাথরের ফাঁকে আটকে আছে হরিণের মড়িটা...এমন খাওয়া খেয়েছে, এখান থেকে কিছুই নেই,' নিজের পাঁজরে হাত রেখে দেখাল ভিকি। 'প্রথমে ভেবেছি ব্লু-ফিশের

কাজ...

'হতেই পারে,' রানা বলল। 'নিশ্চয় জখম নিয়ে পানিতে নেমেছিল হরিণটা। রক্ত বেরোচ্ছিল। রক্তের গন্ধে এসে হামলা করেছে মাছের ঝাঁক...'

'না,' মাথা নাড়ল ভিকি। 'প্রথমে আমিও ভেবেছি ব্লু-ফিশ। পরে মনে হলো হাঙরের কাজ। কিন্তু হরিণটার চোখ নেই। চোখসহ চারপাশের চামড়া মাংস সব খামচে তুলে নেয়া হয়েছে। হাঙর এ রকম করে না।'

'তাহলে ব্লু-ফিশই...'

আবার বাধা দিল ভিকি। 'চলে আসছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল চোখের পাশে আঁচড়ের যে দাগ, ওরকম দাগ আগেও কোথাও দেখেছি। ভালমত দেখার জন্য ঘুরতে গিয়েই পা পিছলাল...পড়ে গেলাম পানিতে...হরিণের মাথাটা আঁকড়ে ধরে উঠতে গিয়ে হাতে বিঁধল জিনিসটা।'

'কী জিনিস?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

ডান হাতের তালু মেলল ভিকি। ছোট্ট কাটা দাগটা দেখাল। জিনিসটা বাঁ হাতে রেখেছিল। রানাকে দিল।

'হাঙরের দাঁতই তো মনে হচ্ছে,' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল রানা।

টেবিল ল্যাম্পের আলোয় এনে ভাল করে দেখল। ত্রিকোণ। অনেকটা সাদা হাঙরের দাঁতের মত। দুই পাশে করাতের দাঁতের মত খাঁজ কাটা, তবে অনেক বেশি মিহি। আঙুল বুলিয়ে দেখতে গেল ও, চামড়া কেটে গেল, সার্জনের ছুরির মত ধারাল। তৃতীয় পাশটা অপেক্ষাকৃত পুরু, চ্যাপ্টা, দুই কোণায় খুদে দুটো হুক। মাথা দুটো পরস্পরের দিকে মুখ করা। হুকের মাথায় বড়শির উল্টো কাঁটার মত কাঁটা। একটা কাঁটা ভাঙা।

জিনিসটা কোনও স্বাভাবিক প্রাণীর বলে মনে হলো না রানার কাছে। কৌতূহল বাড়ল। একটা রুলার বের করে মেপে দেখল

প্রতিটি পাশ। এক ইঞ্চির ঠিক আট ভাগের পাঁচ ভাগ–একটুও কমবেশি না। গায়ে ময়লা লেগে আছে। দুই আঙুলে টিপে ধরে ডলে ডলে পরিষ্কার করে ফেলল। বেরিয়ে পড়ল চকচকে ধাতু।

অবাক চোখে ভিকির দিকে তাকাল রানা। 'সত্যিই মরা হরিণের মাথায় পেয়েছ?'

আবার হাতের কাটাটা দেখাল ভিকি। 'কাটলাম কী দিয়ে তা হলে?'

ভিকির চেহারাই বলে দিচ্ছে মিথ্যে বলছে না।

'আমার মাথায় ঢুকছে না,' বিড়বিড় করল রানা, 'সাগরে এমন কোন প্রাণী কী করে থাকে যার দাঁত স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি!'

তেরো

রক চেনি ও ডিক চেনি দুই ভাই যখন ডক থেকে সরে এল, বেলা তখন সওয়া দুটো। দেরি হয়ে গেছে অনেক। প্রচণ্ড খেপে গেছে তাতে রক। আরও আগে যেতে চেয়েছিল ও, অন্তত দু'ঘণ্টা আগে, ডিকের জন্য পারেনি। দুটো স্কুবা ট্যাংকে গ্যাস ভরতে বলেছিল ডিককে। কিন্তু ডিক চলে গিয়েছিল ওয়াটারবোরোর ব্লেসিং অভ দা ফ্লিট প্যারেডে পরার জন্য গার্লফ্রেন্ডকে কস্টিউম তৈরিতে সাহায্য করতে। ডিককে বোটের ট্যাংকে তেল ভরা আছে কিনা দেখতে বলে রেখেছিল রক। কিন্তু ডিক গিয়েছিল ভুলে, আর তারপর ফিউয়েল ডকে লাইন দিয়ে তেল নিতে গিয়ে দেরি হয়েছে চল্লিশ মিনিট।

রাগ চেপে চুপ করে রইল রক। পাগল খেপিয়ে লাভ নেই। বেশি বকাবকি করতে গেলে 'ধূর, যাবই না তোমার সঙ্গে' বলে হয়তো চলন্ত বোট থেকেই ঝাঁপ দেবে বদমাইশটা।

ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে আছে রক। ওর জীবনের একটা বিশেষ দিন আজ। অনেকটা সেকারণেও বিরূপ কথা বলে ডিককে রাগাল না। চুপ করে বোটের মাঝখানে গদিমোড়া টুলে ভাইকে বসে থাকতে বলে থ্রটল ঠেলে দিল সামনে।

লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বোট বন্দরে ঝাঁক বেঁধে আছে সেইলবোটগুলো, ওগুলোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢুকছে বেরোচ্ছে ডিঙি নৌকা—পূর্ব প্রান্তের মেইন থেকে শুরু করে জার্সি—সব জায়গা থেকেই লোক এসেছে রেসিঙের প্রস্তুতি দেখতে। রকের অবশ্য এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। ও তার নিজের চিন্তায় বিভোর। পরীক্ষাটা সফল হলে বহু টাকার মালিক হবে ও

সাগরে বড় ঢেউ নেই, কাজেই গতি বাড়াতে অসুবিধে হচ্ছে না। ন্যাপাট্রির পাশ ঘুরে এসে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলল। লক্ষ্য, সাগরের পানিতে ফোঁড়ার মত ফুলে থাকা ব্লক আইল্যান্ড ও অসপ্রি আইল্যান্ডের মাঝখানের জায়গাটা।

'হেলেন জে' নামে একটা স্কুনার ডুবে আছে ওখানে। মোটামুটি অক্ষতই রয়েছে বোটটা। ওটাই লক্ষ্য রকের। গভীরতা কম, পানির নীচে ভাল আলো পাওয়া যাবে, ভিডিওটেপিঙের উপযুক্ত। ডেমো মুভি তৈরি করার জন্য একটা সেট প্রয়োজন ওর এমন সেট, যেটা বাস্তবসম্মত হবে।

হলুদ রঙের একটা বয়া ভাসতে দেখে ভাইকে দেখাল ডিক। 'মনে হয় ভারি কিছু ঝোলানো রয়েছে ওটাতে।'

'থাকুক। এখন দেখার সময় নেই।'

'বোটটোট হতে পারে,' ডিক বলল। 'গত হপ্তার ঝড়ে কারও বোট হয়তো ডুবে গেছে, বয়া বেঁধে চিহ্ন দিয়ে রেখেছে, পরে এসে তুলে নেবে। বোট হলে আমাদের সেট এখানেই পেয়ে যাব।

এতদূরে আর কষ্ট করে যেতে হবে না।'

কথাটা ভেবে দেখল রক। দেখতে অসুবিধে কী? পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না। সত্যি যদি বোট হয়ে থাকে, এই পাঁচটা মিনিট দু'ঘণ্টা সময় বাঁচিয়ে দেবে ওদের। থ্রটল টেনে গতি কমাল ও। মোড় নিল। 'মাথা খাটানো শুরু করেছ, ডিকি। গুড।'

হাসল ডিক। 'ইচ্ছে করলে মাথা আমি সব সময়ই খাটাতে পারি।'

রকও হাসল। গলুইয়ের সামনে দিয়ে ঝুঁকে বয়াটা ধরল ও। টেনে তুলল বোটে। ভীষণ ভারি লাগল।

'ইলেকট্রিক কেবল্,' রক বলল। 'সেজন্যই এত ভারি।'

'কেবল্ দিয়ে নিশানা দিয়েছে কেন? এই দেখো না, বয়ার গায়ে লেখা ও আই। পুরোটা কী হবে?'

'যা খুশি হোকগে। ট্যাংক বেঁধে নেমে যাও। আমি গিয়ার নিউট্রালে রাখছি।' বয়াটাকে একটা হুকে আটকে দিল রক। নোঙরের কাজ করল বয়ায় বাঁধা জিনিসটা। 'দেখেই চলে আসবে, বুঝলে? চিংড়ির ফাঁদ খুঁজে অকারণ সময় নষ্ট কোরো না।'

মাথা ঝাঁকাল ডিক। 'বুঝলাম।'

'কাজ করতে চাইলে আসলেই পারো তুমি,' তেল মেরে কথা বলল রক।

'তা তো পারিই,' খুশি হলো ডিক। গায়ে টি-শার্ট। পিঠে ট্যাংক বাঁধল ও। কোমরে সীসা ভরা ওয়েইট বেল্ট পরল। খাপে ভরা একটা ছুরি বাঁধল গোড়ালির ঠিক ওপরে।

'দেখো আবার, দানবের শিকার না হয়ে যাও—ধরে খেয়ে ফেলবে,' হেসে রসিকতা করল রক।

'অত হেসো না, রকি। সাগরের নীচে দানব থাকতেই পারে।' ফ্লিপার পায়ে বাঁধল ডিক। ফেস মাস্কের কাঁচে থুতু লাগাল। বোটের কিনারে বসে মাস্ক পরে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল পানিতে।

তাকিয়ে আছে রক। এক ঝাঁক ভডভড়ি ছেড়ে তারটা

অনুসরণ করে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে ডিক। ছোট ভাই ধূসর-সবুজ গভীরতায় হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। তারপর কনসোলের সামনে বসানো গদিওয়ালা বাক্সটা খুলল।

ভিতরে স্টাইরোফোমের বিছানায় রাখা আছে দুটো ফুল-ফেস মাস্ক। একটা করে মাইক্রোফোন ও ইয়ারফোন লাগানো এয়ার-রেগুলেটর অ্যাপারেটাস এগুলো। প্রতিটি মাস্কের পিছনে ফিতে দিয়ে শক্ত করে আটকানো রয়েছে সিগারেটের প্যাকেটের সমান একটা করে ছোট রবারে মোড়া বাক্স।

পানির নীচে ডাইভারদের কথা বলার উপযোগী এই যন্ত্রের আবিষ্কারক রক নিজে। দুই থেকে দশজন ডাইভার একসঙ্গে কথা বলতে পারবে। খুব কম খরচে তৈরি করা যায়, দুশো ডলারেরও কম। বেশির ভাগ শখের ডাইভারই ডুবুরির সরঞ্জাম কিনতে হাজার হাজার ডলার খরচ করে, টাকার হিসেব করে না। রকের যন্ত্রটার জন্য বাড়তি দুশো ডলার খরচ করতে কার্পণ্য করবে না।

যন্ত্রটা বাজারে চালু করা গেলে কত আয় হবে, হিসেব করে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল রকের। শুধু আমেরিকাতেই রয়েছে চল্লিশ লাখ ডাইভার। চাহিদা বাড়লে উৎপাদনও বাড়বে। আর উৎপাদন বাড়লে যন্ত্র বানানোর খরচ অর্ধেকে নেমে আসবে, অর্থাৎ একশো ডলার। বাজারজাত করা ও বিজ্ঞাপনের খরচ আরও পঞ্চাশ ডলার। কোনও বড় কোম্পানিকে রাজি করিয়ে তাদের মাধ্যমে উৎপাদন ও বিক্রির ব্যবস্থা যদি করতে পারে, মাত্র দশ পার্সেন্ট কমিশন নিলেও কোটিপতি হয়ে যাবে।

দশ বছর কঠোর সাধনার পর যন্ত্রটা বানিয়েছে রক। বাবার গ্যারেজটাকে কারখানা হিসেবে ব্যবহার করেছিল। অত্যাধুনিক চিপস ও অন্যান্য যন্ত্রাংশের ওপর ও কৃতজ্ঞ। ওসব আবিষ্কৃত না হলে এই যন্ত্র তৈরি করা ওর পক্ষে সম্ভব হতো না, যত মেধাই থাকুক না কেন।

এখন ওর কাজ মিনিট তিনেকের একটা ভিডিওচিত্র গ্রহণ

করা, যেটাতে দেখা যাবে পানির নীচে কথা বলছে ও ডিকের সঙ্গে, ডাঙার মতই পরিষ্কার আর স্পষ্ট শোনা যাবে সেই কথা। টুরিস্টদের এই ভিডিওচিত্র দেখালে হু-হু করে বিক্রি হবে ওর যন্ত্র, কোন সন্দেহ নেই...

'রকি!' পানি থেকে ভুস করে মাথা তুলে নৌকার কিনারা খামচে ধরল ডিক। 'পানির নীচে একটা কফিন!'

ভুরু কোঁচকাল রকি। 'কী বাজে বকছ...'

'খোদার কসম! গুপ্তধনের সিন্দুকও হতে পারে! বিশ্বাস না হলে নিজের চোখেই দেখো এসে...'

'কিন্তু গুপ্তধনের সিন্দুক আসবে কোত্থেকে?'

'কোত্থেকে এসেছে জানি না। কেউ বয়ায় বেঁধে চিহ্ন রেখে গেছে। পরে এসে তুলে নেবে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল রক। বোটে টেনে তুলল ডিককে। আনমনেই বিড়বিড় করল, 'তোমার কথা ঠিক হলে ভাগ্য খুব ভাল বলতে হবে আমাদের। পানির নীচে কফিন...তার পাশে আমাদের ছবি...চমৎকার সেট। ঠিক আছে, চলো, দেখে আসি।'

টকিং মাস্ক দুটো পরল দুজনে। ভিডিও ক্যামেরাটা হাউজিঙে বসাল রকি। একটা ব্র্যাকেট লাগাল যাতে দুটো ২৫০ ওয়াটের ল্যাম্প আটকানো যায়—যদি পানির নীচে অন্ধকার থাকে, দেখা না যায় সেজন্য বাড়তি ব্যবস্থা—হাউজিঙের কানেকটর নিজের মাস্কের সঙ্গে লাগাল। বোটে বসা অবস্থায় নিজেদের ছবি তুলল কয়েক সেকেন্ড, তারপর ভিউফাইন্ডারে সেই ছবি দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল ভিডিওরেকর্ডার আর টেপ ঠিকমত কাজ করছে কিনা। পরিষ্কার ছবি উঠেছে, শব্দও খুব স্পষ্ট। সন্তুষ্ট হলো ও।

বোটের দু'পাশ দিয়ে পানিতে পড়ল দুজনে।

ফ্লিপার নেড়ে আগে আগে দ্রুত নেমে চলল রক। বয়ায় বাঁধা তারটা অনুসরণ করে চলেছে। মাঝে মাঝে এক হাতে ছুঁয়ে

নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে, ঠিক পথে যাচ্ছে কিনা। পানি এখানে ততটা পরিষ্কার নয়, ঘোলাটে, তারটা স্পষ্ট দেখা যায় না। এক সময় পানি এতটাই ঘোলা আর সবুজ হয়ে গেল, ওপরে বা নীচে কয়েক ফুটের বেশি দেখতে পেল না। তারটা এক হাতে ধরে থেমে গেল ও।

'গভীরতা কত এখানে দেখেছিলে?' রক জিজ্ঞেস করল।

'না,' কয়েক ফুট ওপরে তার ধরে ভেসে রয়েছে ডিক। 'তলায় কী আছে দেখেই উঠে গিয়েছিলাম।'

ডিকের কথা এত স্পষ্ট শুনতে পেল রক, মনে হলো ডাঙায় রয়েছে। 'কী বুঝছ, ডিকি, যন্ত্রটা দারুণ না?'

'পঞ্চাশ ফুট নীচে রয়েছি এখন,' রকের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল ডিক। 'আর দশ ফুট নামতে হবে, বড়জোর বিশ।'

মাথা নিচু করে ফ্লিপার নেড়ে আবার নামতে লাগল রক। ভিডিও ক্যামেরাটা সামনে বাড়িয়ে রেখেছে।

সবজে পানিতে হলদে-সবুজ একটা ঝিলিমিলি চোখে পড়ল প্রথমে। আরও কাছে গেলে স্পষ্ট হলো জিনিসটা। বাক্সটা লম্বায় আট-নয় ফুট, চওড়ায় চার-সাড়ে চার। দশ ফুট ওপর থেকে ভিউফাইন্ডারে জিনিসটাকে ফ্রেমবন্দি করল ও। আলো দুটো জ্বেলে দিয়ে ওটার চারপাশে ঘুরে ছবি তুলতে লাগল

ডিকের কথা শোনা গেল, 'বয়ায় বেঁধে রেখেছে যখন, নিশ্চয় দামি কিছুই হবে।'

'বেঁধে রাখেনি, চলতে চলতে আটকে গেছে। দেখো,' রক বলল।

ডিকও দেখল বাক্সটার পাশে বড় একটা পাথর। বাক্স ও পাশের পাথরের মাঝখানে তারের মাথায় বাঁধা একটা সেন্সর আটকে রয়েছে।

'আটকে যাওয়াতেই টেনে তুলতে পারেনি,' রক বলল। 'নিশ্চয় ডাইভিং ইকুইপমেন্ট ছিল না। পরে এসে তুলবে ভেবে

তারের মাথা বয়ায় বেঁধে ফেলে চলে গেছে। বাক্সটার কথা হয়তো জানেই না।' সাঁতরে আরও কাছে গেল রক।

'কিন্তু বাক্সটা এখানে এল কীভাবে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'খুলে দেখবে?'

'দেখব। আমাদের ডেমো মুভি দেখিয়ে চমকে দেব টুরিস্টদের। ব্রোঞ্জের এ রকম বাক্স আজকাল তৈরি করে না কেউ। বহুকাল আগে হয়তো কোনও কাঠের জাহাজ থেকে ঠেলে ফেলা হয়েছিল বাক্সটা। সাংঘাতিক সেট, বুঝলে! হেলেন জে'র চেয়ে হাজার গুণ ভাল। টেলিভিশনের কাছে ডেমো বেচতে পারব; স্টিল ছবি তুলে নিয়ে গেলে মিস্টরি পত্রিকার কাছেও বেচতে পারব। সব দিক থেকেই খালি লাভ আর লাভ!'

'কিন্তু ভিতরে যদি লাশ থাকে?'

'তাহলে তো আরও ভাল। প্রাচীন লাশের ছবির জন্যে অনেক বেশি টাকা দেবে পত্রিকা। তা ছাড়া বাক্সের সাইজ দেখেছ? এই কফিনে যে লাশ থাকবে সেটা কত বড় কল্পনা করো–মানুষ না, দৈত্য!' ক্যামেরার সুইচ অফ করে দিয়ে বালিতে পা রাখল রক। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ল্যাম্পের আলো ফেলল বাক্সটার ওপর। ক্যামেরার লেন্স ফোকাস করল। 'ও-কে, ডিকি, আস্তে আস্তে সাঁতরে গিয়ে বাক্সটার ওপর বসো তো একবার। ছবি তুলি।'

'বসব!' একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল ডিক। তারপর ধীরে ধীরে সাঁতরে এগোল বাক্সটার দিকে। ওপরে পৌঁছে থেমে গেল। বাক্সের ওপর বসতে ভয় লাগছে ওর।

'আরে বসো না, অমন করছ কেন? বিখ্যাত হওয়ার ইচ্ছে নেই?'

চোদ্দ

সিল করা বাক্সটার ভিতরে চাপমাত্রা সব সময় সমান। কিন্তু কাছেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে একটা পরিবর্তন টের পাচ্ছে দানবটা। কাছাকাছি এসেছে বেশ বড় কোনও প্রাণী।

ক্ষুধায় পাগল হয়ে আছে ওটা। আশপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে খুদে প্রাণী আছে, যেগুলো দিয়ে ওর পেট ভরে না। বড় প্রাণীগুলো এত ক্ষিপ্র আর চালাক, ধরা যায় না। থাবা মেরে ধরার চেষ্টা করে। নখও বিঁধিয়েছে দু'একবার। কিন্তু আটকে রাখতে পারেনি। মরিয়া হয়ে শেষে সহজ শিকারের আশায় দূরে চলে গিয়েছিল। বাইরে থেকে আসা একটা বড় প্রাণীকে—পানির জীব নয়—সাঁতার কাটতে দেখে ওটাকে ধরে নীচে নামিয়ে এনে খেয়েছিল। তবে প্রাণীটা এত বড়, একবারে সবটা খেয়ে শেষ করতে পারেনি। অবশিষ্ট অংশটা ছেড়ে দিতেই স্রোতে ভেসে চলে যাচ্ছিল। কোথায় যায় দেখার জন্য পিছন পিছন গিয়েছিল, যাতে পরে আবার খেতে পারে। লাভ হয়নি। একটা বড় ঢেউ ধাক্কা দিয়ে ওটাকে নাগালের বাইরে ডাঙার কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল।

আরেকটা প্রাণীকে দেখেছে ওখানে। একটা দুর্বল প্রাণী। তবে খাবার হিসেবে খুব ভাল। পানিতে পড়ে গিয়েছিল প্রাণীটা। কিন্তু ধরার আগেই পালিয়ে গেল।

দানবটার প্রোগামিং জানান দিচ্ছে দ্রুত খাবার দরকার।

কাছেই ঘোরাঘুরি করছে জ্যান্ত প্রাণী।

ধরে এখন খেতে হবে। কিছুতেই এই শিকার ফসকে যেতে দেয়া চলবে না।

পনেরো

প্রথমে দুই পা ফাঁক করে ঘোড়ায় চড়ার মত বসার চেষ্টা করল ডিক। পারল না। বাক্সটা অতিরিক্ত চওড়া।

'একপাশেই পা ঝুলিয়ে বসো,' রক বলল। 'পোজ দাও। ধরে নাও, স্পোর্টস নিউজ পত্রিকায় ছাপা হয়ে গেছে ছবিটা।'

বসল ডিক। অস্বস্তি বোধ করছে। বাক্সটাকে ভুতুড়ে লাগছে ওর। ড্রাকুলার কফিন কিনা ভাবছে। সাগর পাড়ি দেয়ার সময় বাক্সটায় ভ্যাম্পায়ার আছে বুঝতে পেরেই হয়তো জাহাজ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল আতঙ্কিত নাবিকেরা।

স্রোতের খুব টান। যাতে ভেসে না যায় সেজন্য সেন্সরের ভারি কালো তারটা একহাতে চেপে ধরল ডিক।

ভিউফাইন্ডারের ভিতর দিয়ে তাকাল রক। ক্যামেরার ফিতে কব্জিতে আটকে রেখেছে।

ভয় পাচ্ছে ডিক। যে কোন সময় বাক্স থেকে উঠে পড়বে বোঝা যাচ্ছে। ওর মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর জন্য রক বলল, 'ট্যাংকে বাতাস কতখানি আছে?'

গেইজটা মাস্কের সামনে এনে দেখল ডিক। 'পনেরোশো। আর কতক্ষণ থাকতে হবে?'

'দশ মিনিট। বড়জোর পনেরো।'

কয়েকটা ছবি তুলল রক, তারপর ইশারা করল ডিককে:

'নাও, এখন বাক্স থেকে নামো। ওটার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াও। সামনে বাক্স রেখে একটা শট নিই। তারপর বাক্স পিছনে রেখে

একটা নেব।'

বাক্স থেকে উঠে পিছনে চলে গেল ডিক। পায়ের খোঁচায় বালির মেঘ উড়ল।

রকের চোখ ক্যামেরার দিকে। সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখছে।

হঠাৎ বড় বড় হয়ে গেল ডিকের চোখ। খুলে যাচ্ছে বাক্সের ডালা। চেঁচিয়ে উঠল, 'রকি!'

সাবধান হওয়ার সুযোগ পেল না রক। বাক্স থেকে বেরিয়ে এসে চোখের পলকে ধরে ফেলল ওকে দানবটা। নরম মাংসে বসিয়ে দিল ধারাল নখ।

দ্রুত পিছনে সরে গেল ডিক। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত তাকিয়ে দেখছে রক্তের মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে পানিতে। রকের ঘাড়ের কাটা ধমনী থেকে ফিনকি দিয়ে বেরোচ্ছে রক্ত। এই গভীরতায় লাল রঙকে দেখাচ্ছে ঘন সবুজ। ঝাঁকি খাচ্ছে রকের পা। লাথি লেগে বালির মেঘ উড়ছে। হাত দুটো লম্বা করে দিয়েছে ওপরে।

কীসে ধরেছে রককে বালির মেঘের জন্য পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না ডিক। সাদা বড় কোনও প্রাণী। ঘোলাটে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বার বার রকের গলার কাছে রুপালি ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। ধড় থেকে রকের মুণ্ডটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল।

পিছনে সরতে থাকল ডিক। বুঝল পিছিয়ে গিয়ে লাভ হবে না, বাঁচতে হলে ওপরে যেতে হবে। দ্রুত ফ্লিপার নেড়ে উঠতে শুরু করল ও। হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছে রবারে-মোড়া কালো তারটাকে।

জোরালো স্রোত বইছে পানিতে। টান লেগে ধনুকের মত বেঁকে গেছে তারটা। ওটা ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল ডিক। ডিকের ভারে অনেকখানি সোজা হয়ে গেল ধনুকের বাঁক, ঢিল পড়ল তারে। খুলে চলে এল বাক্স ও পাথরের মাঝে আটকা পড়া সেন্সরটা। মুক্ত হয়ে গিয়ে ঢেউয়ের টানে ভেসে যেতে শুরু করল

বোট। বয়ায় বাঁধা তারের সঙ্গে টেনে নিয়ে চলল ডিক ও সেন্সরটাকে। বালির ওপর লাফাতে লাফাতে ছেঁচড়ে এগোল যন্ত্রটা।

নীচে তাকাল ডিক, তার ছাড়েনি। নিথর হয়ে বালিতে পড়ে থাকতে দেখল রকের ধড়টা। কাটা গলা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে এখনও।

ওপর দিকে মুখ তুলে তাকাল সাদা দানবটা।

ডিক দেখল, চকের মত সাদা ওটার চোখ। পুরোটাই সাদা। মণি নেই। হাতদুটো শুধু কালো।

পা দিয়ে বালিতে ধাক্কা মেরে রকেটের মত লাফিয়ে উঠল দানবটা। ঠিক যেন উড়ে আসতে লাগল ওর দিকে।

এক হাতে তার ধরে রাখল ডিক। আরেক হাত বাড়াল খাপ থেকে ছুরি খোলার জন্য। ছুরিটা যাতে খুলে পড়ে যেতে না পারে সেজন্য রবারের সেফটি রিঙ লাগানো রয়েছে খাপে। রিঙ ধরে টান দিল ও। আতঙ্কে অবশ হয়ে গেছে যেন আঙুল। ছুটে গিয়ে স্প্রিং লাগানো রিঙটা ফিরে গেল আগের জায়গায়। আবার টানল ও। রিঙ খুলে ছুরিটা বের করে আনতে পারল এবার।

ডলফিনের মত নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে উঠে আসছে দানবটা। ডিককে ধরতে কুচকুচে কালো মারাত্মক নখগুলো সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে। দুই হাতে মোট দশটা নখ। বাঁকানো, ছোটখাট কাস্তে যেন একেকটা। ঝকঝক করছে।

ওপর দিকে তাকাল ডিক। পানির ওপর পৌঁছে গেছে প্রায়। সূর্য দেখতে পাচ্ছে সবুজ পানি ভেদ করে তির্যকভাবে এসে পড়ছে সূর্যরশ্মি।

আবার নীচে তাকাল ও। ওর পায়ের কাছে পৌঁছে গেছে দানবটা। হাঁ করা মুখের ভিতর সারি সারি সাদা ত্রিকোণ দাঁতে রোদ পড়ে ঝকঝক করছে।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ডিক। মাস্কের ভিতর চাপা পড়ল ওর

চিৎকার। গোড়ালি আঁকড়ে ধরল ধারাল নখ। চামড়া, মাংস ভেদ করে ঢুকে গেল সহজেই। টেনে নামাতে লাগল ওকে দানবটা।

অন্ধের মত এপাশ-ওপাশ ছুরি চালাল ডিক। ওর কব্জি চেপে ধরল দানব। মাংস, পেশি, শিরা-উপশিরা ফালা-ফালা করে ফেলল তীক্ষ্ণধার নখ দিয়ে। ছুরিটা খুলে পড়ে গেল হাতের মুঠি থেকে।

তারটা ছেড়ে দিল ডিক। থাবা মারতে শুরু করল।

এক হাতে ডিকের হাত চেপে ধরল দানবটা। অন্য হাতে মুখসহ মাথাটা চেপে ধরে পিছনে ঠেলে দিল। ধারালো দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল গলা।

শেষবারের মত মরণচিৎকার দিয়ে উঠল ডিক। চিৎকারটা শেষ হওয়ার আগেই কেটে গেল কণ্ঠনালী। নিজের চোখে নিজের রক্ত পানিতে ছড়াতে দেখল ও। সূর্যের হলুদ আলোয় কমলা কুয়াশা সৃষ্টি করছে যেন ফিনকি দিয়ে বেরোনো লাল রক্ত।

দুটো প্রাণীই মরে গেছে। দ্বিতীয়টাকেও প্রথমটার কাছে বালিতে এনে ফেলল দানবটা। স্রোতের দোলায় এপাশ-ওপাশে মৃদু গড়াচ্ছে লাশ দুটো।

বালিতে আরাম করে বসে খাওয়া শুরু করল দানব।

ওপরে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ভেসে চলল বোটটা। সঙ্গে টেনে নিয়ে চলল বয়ায় বাঁধা তারটা। একটা প্রবাল-প্রাচীরে এসে ঠেকল। আটকে থাকল কিছুক্ষণ। দূর দিয়ে যাওয়া জাহাজের ঢেউ এসে উঁচু করে দিল পানি। কয়েক সেকেন্ডের জন্য ডুবে গেল প্রবাল-প্রাচীর। প্রাচীর পেরিয়ে অন্যপাশে চলে এল বোট। ঢেউয়ের ধাক্কায় আবার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল তীরের দিকে।

ষোলো

নগর পৌরসভার পশ্চিম প্রান্তে ছোট্ট ইয়ট ক্লাবটার ভাসমান ডকের একটা খালি স্লিপে বোটের গলুই ঢুকিয়ে দিল রানা। ওএইলার বোটটা নিয়ে এসেছে। এখনও এখানকার ক্লাবের মেম্বার নয় ও, টেনিস খেলে না, সেইলবোট রেসিঙে অংশ নেয় না, ক্লাবের হাঁসমার্কা ছবি লাগানো ঢোলা পোশাক পরে না, কিন্তু ক্লাবের সব সদস্যই ওকে চেনে। অসপ্রি আইল্যান্ডের নতুন মালিক হিসেবে। স্লিপ ব্যবহার করতে দিতে তাই আপত্তি করে না। ধরেই নিয়েছে শীঘ্রি রানাও ওদের ক্লাবের সদস্য হবে।

ভোরের এ সময়টায় পানিতে ঢেউ নেই—কারণ বাতাস নেই, যেন ভোরের বাতাস এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কোনদিক থেকে বইতে শুরু করবে। পানি এখন নিথর, ওপরটা আয়নার মত চকচকে। সামুদ্রিক পাখিরাও নাস্তা শুরু করেনি, তাই ওগুলোর প্রধান খাবার খুদে মাছের ঝাঁক বিপদের কোনও সম্ভাবনা না দেখে পানিতে মৃদু আলোড়ন তুলে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটছে নোঙর করা বোটগুলোর মাঝের ফাঁকফোকর দিয়ে।

লিভার টেনে গিয়ার নিউট্রালে নিয়ে এল রানা। চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। আপনগতিতে ধীরে ধীরে বোটটা ঢুকছে স্লিপের ভিতর। গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ভিকি। যেভাবে দাঁড়িয়েছে ও, তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। বোট ডকে ভেড়ার সময় ধাক্কা সামলাতে না পেরে ডিগবাজি খেয়ে পানিতে পড়তে পারে। সাবধান করে দিল ওকে রানা।

লাফ দিয়ে নিরাপদেই ডকে নামল ভিকি। গোঁজের মাথায়

বোটের দড়ি বাঁধল নিপুণভাবে।

মনে মনে ওর প্রশংসা না করে পারল না রানা। ছেলেটা সত্যি কাজের। বুদ্ধিমানও। ন্যাপস্যাকটা ওর হাতে দিয়ে বোট থেকে ডকে লাফিয়ে নামল রানা।

পার্কিং লটের দিকে এগোল দুজনে। একটিমাত্র গালের চিৎকার শোনা গেল দূরে। পৌরসভা বিল্ডিঙের কাছ থেকে চেঁচিয়ে উঠল একটা কুকুর। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই, কেবল শিশিরভেজা লম্বা ঘাস মাড়িয়ে ওদের হেঁটে চলার মৃদু শব্দ ছাড়া।

একটু পরে গাছের মাথার ওপর দিয়ে যেন ভেসে এল গির্জার ঘণ্টার শব্দ। ছয়বার।

'মাত্র ছয়টা বাজে,' ভিকি বলল। মুগ্ধ চোখে দেখছে ভোরের প্রকৃতি। 'এত সকালে আর কখনও উঠিনি। সকাল যে এত সুন্দর হয়, জানতাম না।'

'ওঠা উচিত,' রানা বলল। 'দিনের এ সময়টায় বাতাস থাকে তাজা, পরিষ্কার। মানুষকে সজীব করে ভোরের প্রকৃতি, মনের জোর বাড়ায়, সাহস তৈরি করে।'

'ইস্, আঙ্কেল, কেন যে আরও আগে আপনার সঙ্গে দেখা হলো না আমার!'

পার্কিং লটে ঢুকল ওরা। ন্যাপস্যাক খুলে ভিতরের জিনিস বের করে চত্বরে ছড়িয়ে ফেলতে লাগল ভিকি। চুপচাপ দেখছে রানা।

দ্বীপে কম্প্রেসর মেরামত নিয়ে ব্যস্ত বিগ। মেশিনটা মেরামত করতে পারেনি এখনও। ইঞ্জেক্টরের ময়লা পরিষ্কার করেও চালু হয়নি। কারণ খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে, আরও সমস্যা হয়েছে মেশিনে। একটা যন্ত্রাংশ ভেঙেই গেছে। মেরামতের চেষ্টা করছে ও। না পারলে মেইন থেকে আনাতে হবে।

কম্প্রেসর মেরামত না হলে ট্যাংকে অক্সিজেন ভরা যাবে না, ট্যাংক ছাড়া সাগরে ডুব দেয়া যাবে না, সেন্সরটা তোলা যাবে না,

হোয়াইট শার্কের পিছু নেয়া যাবে না। অর্থাৎ রানা ও ভিকি আপাতত বেকার। কাজেই সময় কাটানোর অন্য কোনও উপায় না দেখে ভিকিকে নিয়ে শহরে চলে এসেছে রানা। অবশ্য ভিকির চাপাচাপিতেই বলা যায়।

দ্বীপে আসার পর থেকে সকালে ব্যায়ামের কাজটা ওখানেই সেরে নেয় রানা। ভোর পাঁচটায় উঠে দৌড়ানো শুরু করে। পুরো দ্বীপটা ছ'বার চক্কর দেয়। তাতে মোটামুটি বারো মাইল দৌড়ানো হয়। ব্যায়াম সেরে ঘরে ফিরে শেভ করে, শাওয়ারে গোসল করে নাস্তা সারে তারপর হয় ঢোকে অফিসে, নয়তো বিগকে নিয়ে বেরোয়। এতদিন এটাই ছিল ওর দৈনন্দিন কাজ। কিন্তু ভিকি আসার পর নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম হচ্ছে। এই যেমন আজ, ব্যায়ামের কাজটা দ্বীপে না সেরে চলে এসেছে মূল ভুখণ্ডে। ভিকির টিচার ভালমত রোলারব্লেড প্র্যাকটিস করতে বলে দিয়েছেন। আসছে শীতে স্কুলের হকি টিমে ঢুকতে হলে স্কেটিঙে উন্নতি করতে হবে ওকে। দ্বীপে রোলারব্লেড করার উপযোগী পাকা রাস্তা নেই। আছে শহরে।

বিগ অবশ্য বাধা দিয়েছিল, এত টাকার তেল খরচ করে শহরে যাওয়ার দরকার নেই। কয়েক দিন প্র্যাকটিস বন্ধ থাকলে কিছু হবে না।

'আহ্, তেলের টাকা নিয়ে আর কিপ্‌টেমি করবেন না তো,' রানা বলেছে। 'কাল্ সকালে আমি নিয়ে যাব ওকে। তেলের টাকাটাও আমিই দেব।' সুতরাং ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই ভিকিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ও।

নী প্যাড, এলবো প্যাড, হেলমেট এবং সবশেষে একজোড়া হাই-টপ লেস-আপ শু পরল ভিকি, শু'র নীচে হলুদ রঙের চাকা লাগানো। অনেকটা রোবটের মত দেখাচ্ছে এখন ওকে।

মুচকি হেসে রানা জিজ্ঞেস করল, 'এত কিছুর কি দরকার আছে?'

'আছে।'

'প্যাড পরেছ কেন?'

'না পরলে পড়ে গেলে হাত-পা ছিলবে।'

'হুঁ। এসো, শুরু করা যাক।'

'কোনখান থেকে?'

'এখান থেকেই। অসুবিধে আছে?'

'না।' সোজা হয়ে দাঁড়াল ভিকি। এক পা দিয়ে ঠেলা মেরে গড়িয়ে দিল জুতোর নীচে লাগানো চাকা। টলমল করে উঠল দেহ, দুই হাত ডানার মত ছড়িয়ে দিল দুদিকে, পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল। বিব্রত হাসি হেসে রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এইজন্যেই প্র্যাকটিস বন্ধ রাখা উচিত না। মাত্র কয়েকদিন করিনি, তাতেই...'

তবে সামলে নিতে দেরি হলো না ওর। সামনে ঝুঁকে জোরে আবার ঠেলা দিল। পাখির ডানার মত দু'পাশে ছড়ানো দুই হাত। কয়েক মুহূর্ত টলমল করে ভারসাম্য ঠিক করে ফেলল। ছুটতে শুরু করল দ্রুতগতিতে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা। ওর ভয়, ডিগবাজি খেয়ে পড়বে ভিকি। কিন্তু পড়ল না। পার্কিং লটের চারপাশে এক চক্কর দিয়ে ফিরে তাকাল। রানার দিকে তাকিয়ে হাত উঁচু করে ঝাঁকি দিয়ে যেন নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করল। তারপর ছুটল শহরে ঢোকার রাস্তাটার দিকে।

যানবাহন আর পথচারীদের ভিড় বাড়তে আরম্ভ করবে একটু পরেই। ওদের ব্যাপারে ভিকিকে সাবধান করতে গিয়েও কী ভেবে করল না রানা। রানিং শু পরাই আছে। দৌড় শুরু করল।

নিচু পাহাড়ের গোড়ায় পৌরসভায় যাওয়ার রাস্তাটা ধরে ছুটল। বিচ স্ট্রিটের দুটো রেস্টুরেন্ট থেকে নাকে আসছে সিনামোন বান আর মাংস ভাজার সুবাস। এত সকালেও তড়িঘড়ি নাস্তা রেডি করে ফেলছে রেস্টুরেন্টগুলো, ইলেকট্রিক বোটে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য।

যানবাহনের ভিড় নেই তেমন। বিচ স্ট্রিটের ঠিক মাঝখান দিয়ে দৌড়াচ্ছে ও। বোরো মার্কেটে সব্জির দোকানে সব্জি সাজাচ্ছে স্যালি, পাশ দিয়ে যাবার সময় তার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল রানা। হাত নাড়ল লেস্টারের দিকে–লিকার স্টোরের মালিক, দোকানের পিছনে ট্রাক থেকে বিয়ারের বাক্স নামাচ্ছে। তারপর হাত নাড়ল আর্লের দিকে–খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, সিগারেট, চিউয়িং গাম ও পেপারব্যাক বই বিক্রি হয় তার স্টলে। গত তিন বছরে দু'বার এসেছে ও এখানে। সবাই ওকে চেনে এখন, অসপ্রি আইল্যান্ডের নিরহঙ্কার, নতুন মালিক হিসেবে; হাত নাড়ার জবাব দিচ্ছে ওরা খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে। মানুষগুলো সহজ ভাবে ওকে মেনে নিয়েছে বলে ভাল লাগছে রানার।

ভেটারান স্কয়্যার আর পুরনো ব্যাংক বিল্ডিংটা পেরিয়ে এল। পুরনো একটা পতাকা উড়ছে এখনও বাড়িটার মাথায় খুঁটিতে। ১৮১২ সালের যুদ্ধে যখন হিংস্র আক্রোশে ওয়াটারবোরোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ব্রিটিশরা, সেই তখন প্রথম পতাকা উড়ানো হয়েছিল ওই খুঁটিতে।

ওয়াটারবোরো পয়েন্টের শেষ মাথায় এসে আবার ভিকির সঙ্গে দেখা হলো। ওখানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখল দুজন। তারপর আবার দৌড়ানো শুরু করল। রানার আগে আগে এঁকেবেঁকে ছুটছে ভিকি। সরু কয়েকটা গলি পার হয়ে ওক স্ট্রিটে উঠল। রাস্তার দুই পাশে এখানে তিমি শিকারি ক্যাপ্টেনদের বাড়ি। শিকার বন্ধ হয়ে গেছে বহুকাল আগে, তাই বাড়িগুলোর এখন আর সেই জৌলুস নেই।

ওক স্ট্রিটটা বেশ চওড়া, সোজা, খোলা, নির্জন।

'এখানে ঠিকমত ছোটা যাবে,' ভিকি বলল। 'চলি, আঙ্কেল। ক্লাবের কাছে দেখা হবে।'

দ্রুত পা ঠেলে ঠেলে, হাত আগুপিছু, মাথা নিচু, পিঠ বাঁকা করে ছুটছে ও। রাস্তায় দ্রুত গড়াচ্ছে ওর জুতোর চাকা।

পিছনে দৌড়াচ্ছে রানা। ভিকিকে চোখে চোখে রাখছে। কিন্তু চাকাওয়ালা জুতোর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দুই ব্লক পেরিয়েই হাঁপিয়ে গেল। গতি কমিয়ে আবার স্বাভাবিক গতিতে দৌড়াতে থাকল।

এক ব্লক আগে রয়েছে ভিকি। দ্রুত বাড়ছে দুজনের দূরত্ব।

মেয়েটাকে চোখে পড়ল রানার। একটা বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ঘুরে দরজা লাগাল মেয়েটা। হাতের ব্যাগটা শক্ত করে চেপে ধরে রাস্তায় নামল।

চেঁচিয়ে উঠল রানা।

মেয়েটাকে দেখতে দেরি করে ফেলল ভিকি। দ্রুত পাশ কাটানোর চেষ্টা করল। পারল না। নিজেকে থামানোর চেষ্টা করল। তা-ও পারল না। ধাক্কা খেল মেয়েটার গায়ে। পার্ক করে রাখা একটা গাড়ির বনেটে পড়ল মেয়েটা সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। উড়ে গিয়ে রাস্তায় পড়েছে হাতের ব্যাগটা।

রাস্তা থেকে দুটো পা-ই শূন্যে উঠে পড়েছে ভিকির। গুলি খাওয়া পাখির মত দুই হাত ছড়িয়ে ডিগবাজি খেয়ে রাস্তায় পড়ল। উল্টেপুল্টে গড়ান খেল। তারপর স্থির হয়ে পড়ে রইল। নীল পোশাক পরা মেয়েটা পড়ে আছে নীল রঙের একটা পুঁটুলির মত।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল রানা। প্রাণপণে ছুটছে। ফুসফুস ফেটে যাবার জোগাড়। অক্সিজেন সাপ্লাই দিয়ে কুলাতে পারছে না।

প্রথম নড়ল মেয়েটা। গাড়ির বাম্পার ধরে উঠে বসল। ধীরে ধীরে টেনে তুলল দেহটাকে। ভিকির কাছে গিয়ে নিচু হয়ে ওর গালে হাত রাখল।

ভিকিও নড়ল। উঠে বসল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল দুজনে। ভিকি কিছু বলল মনে হলো। মাথা নাড়ল মেয়েটা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। মেয়েটা ফিরে তাকাল ওর দিকে। মাটি থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে, আরেকবার ভিকির দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে দৌড়ে ঢুকে পড়ল দুটো বাড়ির মাঝখানের

একটা গলিতে।

রানা যখন ভিকির কাছে পৌঁছল, মেয়েটা উধাও।

একটা হাত বাড়িয়ে দিল ভিকি। তাকে টেনে তুলল রানা। কাঁপছে ভিকি। ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে রাখল রানা। 'কী, লেগেছে খুব?'

'নাহ্!' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ভিকির মুখ। 'এই কারণেই প্যাড পরতে হয়।' হাঁটু দেখাল ও। প্যাডের ওপরের কাপড় ছিঁড়ে ভিতরের তুলো বেরিয়ে পড়েছে।

'মেয়েটার কী অবস্থা?'

'ভাল। চমকে গেছে, আর কিছু না।'

'বলেছে তোমাকে?'

'না...তা অবশ্য বলেনি।'

'তাহলে বুঝলে কীভাবে?'

'যেভাবে দৌড়ে পালাল, জখম হলে পারত না।'

'পালাল কেন?'

'জানি না।'

'তোমার সঙ্গে কী কথা বলল?'

'ও কিছু বলেনি, আমি বলেছি। বলেছি, আমি সত্যিই দুঃখিত। ও কোন জবাব দিল না। শুধু আমার গাল ছুঁয়ে হাসল।'

'তোমার চেনা?'

'নাহ্।'

'কাজটা ভাল হলো না। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা উচিত ছিল তোমার।' মেয়েটা যেদিকে গেছে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল রানা। নির্জন রাস্তা। আবার ফিরল ভিকির দিকে। 'জুতো খোলো। ক্লাব পর্যন্ত হেঁটে যাই।'

'জুতোর তো সমস্যা নেই, যত নষ্টের মূল এই হেলমেটটা,' মাথায় হাত দিল ভিকি। 'কান বন্ধ করে রেখেছে, সেজন্যেই মেয়েটাকে আসতে শুনিনি।'

'তাহলে হেলমেটটাই খোলো।'

'এখন আর খুলে কী হবে?'

'তাহলে আর জোরে ছুটবে না বলে দিলাম। আমার পাশে পাশে থাকো।'

দৌড়াতে দৌড়াতে ভিকির দিকে ফিরে তাকাল রানা। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চাকার ওপর ছুটতে ছুটতে হকিস্টিক ছাড়াই শরীর বাঁকিয়ে, হাত দিয়ে অদৃশ্য বলকে বাড়ি মারার ভঙ্গি করছে। না, ভালই আছে ও। পড়ে গিয়ে ব্যথাট্যথা তেমন পায়নি। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

ডানে ঘুরে ওক স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে এল ওরা। লাল ইঁটের একটা বিল্ডিঙের দিকে দৌড়ে চলল। এক সময় ওটা পৌরসভার স্কুল ছিল, এখন অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স।

বুক সমান উঁচু একটা দেয়ালের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে রাস্তা। ওপাশে সৈকত। কয়েকটা টার্নকে খাবার খেতে দেখা গেল। রোদের আলো চমকাচ্ছে পাখিগুলোর সাদা পালকে। আগাছায় ভরা পানিতে ডাইভ দিয়ে পড়ে উঠে আসার সময় পালকের পানি ছিটকে যাচ্ছে হীরার কুচির মত।

দেয়ালটার দিকে এগোল রানা। রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে ঘুরবে। ভিকিও দেখেছে টার্নগুলোকে। সাঁ করে রানার পাশ কাটিয়ে চলে গেল দেয়ালটার কাছে।

পাশে এসে দাঁড়াল রানা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করল কী খাচ্ছে টার্নগুলো। মাছ নয়। আগাছায় ভরা জায়গা। ছোট মাছের ঝাঁক এরকম আগাছার মধ্যে ঢোকে না।

'কী খাচ্ছে?' ভিকিও কিছু দেখছে না। দেয়ালের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে।

'বুঝতে পারছি না।' তাকিয়ে আছে রানা। নুড়ি ও ছোট-বড় নানারকম পাথরে ভর্তি ছোট্ট সৈকত। বিড়বিড় করল, 'ওই আগাছার জঙ্গলের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে!'

সতেরো

জোরে বাতাস বইল। চেপে বসিয়ে দিল পানির ওপর খাড়া হয়ে থাকা জলজ আগাছার মাথা।

'আঙ্কেল!' চেঁচিয়ে উঠল ভিকি। 'একটা হাত!'

রানাও দেখেছে এখন। বাঁকা হয়ে আছে আঙুলগুলো। মৃত্যুর আগে যেন কিছু ধরে বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল ওই হাতের মালিক, কিংবা কাউকে খামচি মারতে চেয়েছিল।

'থাকো এখানে,' ভিকিকে বলে দেয়ালে উঠে বসল রানা। পা দুটো অন্যপাশে ঝুলিয়ে দিয়ে লাফিয়ে নামল নুড়িতে ভরা এক চিলতে সৈকতে।

'আঙ্কেল...' রোলারব্লেডের ফিতে খুলতে আরম্ভ করেছে ততক্ষণে ভিকি।

'না, এসো না, ওখানেই থাকো!' বলে আগাছার জঙ্গলের দিকে হেঁটে চলল রানা। টেলিভিশনে কোনও নিখোঁজ সংবাদ শুনেছে বলে মনে করতে পারছে না।

আগাছাগুলোর কাছে এসে মাথাটাও চোখে পড়ল ওর। ভয়ানক বিকৃত। সাদাটে ধূসর হয়ে গেছে মুণ্ডুটার চামড়া। চোখ, কানের লতি ও ঠোঁটের মাংস নেই।

'পুলিশকে খবর দাও,' ভিকিকে বলল রানা।

'কার লাশ?'

'কী করে বলব? যাও, দেরি কোরো না।'

আর প্রশ্ন করল না ভিকি। পাকা রাস্তায় ওর জুতোর চাকার

শব্দ কানে এল রানার। আবার লাশটার দিকে ফিরল ও। মুখ দেখে চেহারা চেনার উপায় নেই, তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, টিন এজার। পা লম্বা করে দিয়ে আগাছা সরানোর চেষ্টা করল। লাশের দেহের খানিকটাও চোখে পড়ল। গায়ে ওয়েট সুট, হাতে ডাইভারের ঘড়ি। তারমানে ডাইভিং করতে গিয়ে মারা গেছে।

কিন্তু মৃত্যুর কারণটা কী? ট্যাংকের বাতাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল? নষ্ট অক্সিজেনে শ্বাস নিতে গিয়ে কার্বন মনোক্সাইডের বিষক্রিয়ায় মারা যায় অনেক সময় ডুবুরি। পানির নীচে হার্ট অ্যাটাক হয়, স্ট্রোক করে, জাহাজ কিংবা বোটের প্রপেলারে লেগেও দুর্ঘটনা ঘটে। এর বেলায় কী হয়েছিল?

কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত মাংস বলতে কিছু নেই একটা হাতের। বড় বড় আঁচড়ের দাগ হাড় কেটে বসেছে। মৃত্যুর পর খেয়েছে কোন কিছুতে। হাঙর এ ভাবে খায় না। আর ব্লু-ফিশ হলে কিছুই অবশিষ্ট রাখত না, সব খেয়ে ফেলত।

কব্জিতে জড়ানো ক্যামেরার ফিতেটা চোখে পড়ল এবার। ভিডিও ক্যামেরা। এখনও রয়েছে ফিতের মাথায়।

'আচ্ছা, মিস্টার রানা, কী মনে হয়? হাঙরের কাজ?' বললেন পুলিশ চিফ স্টিভ ম্যাককুইন, 'বড় কোনও হাঙর। এই ধরুন, হোয়াইট শার্ক।'

'আমার মনে হয় না,' জবাব দিল রানা।

ম্যাককুইনের অফিসে বসে কথা বলছে ওরা। লাশটার অনেকগুলো ছবি ছড়িয়ে রয়েছে চিফের ডেস্কে। বুককেসের ভিতরে বসানো একটা টেলিভিশন সেটের সঙ্গে সংযোগ দেয়া হয়েছে লাশের ক্যামেরাটার।

ভিকি খবর দেয়ার পর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিল পুলিশের গাড়ি, আরও কয়েকটা মিনিট পর একটা অ্যামবুলেন্স। লাশের কিছ ছবি নেয়ার পর ওটাকে ডাক্তারী পরীক্ষা করতে নিউ

ইংল্যান্ডে পাঠানোর জন্য ব্যাগে ভরা হচ্ছিল, ততক্ষণে পাথরের দেয়ালের অন্য পাশে উৎসুক দর্শকের ভিড় জমে গিয়েছিল।

ম্যাককুইনের অনুরোধে থানায় এসেছে রানা ও ভিকি। ওদের স্টেটমেন্টও নেয়া হয়ে গেছে। ভিকি এখন লবিতে বসা। ম্যাককুইনের সঙ্গে কথা বলছে রানা।

'হাঙর নয়, কেন মনে হচ্ছে আপনার?' ম্যাককুইন প্রশ্ন করলেন।

'হাঙর এভাবে খায় না। খাওয়ার ধরন দেখে বুঝতে পারছেন না? পানিতে বাঘ-ভালুক নেই–বিশেষ করে ভালুক। যেভাবে খেয়েছে, নখ দিয়ে আঁচড়েছে, ডাঙায় হলে ভালুকে খেয়েছে বলতে পারতাম।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে ম্যাককুইনকে। 'এম. ই. কী বলে, জানার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। হয়তো পানির নীচে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, কিংবা স্ট্রোক...'

'কথা তো সেটা না। কথা হলো, মৃত্যুর পর এভাবে খেল কীসে লাশটাকে...' দরজায় থাবার শব্দে থেমে গেল রানা।

একজন পেট্রলম্যান ঢুকল ঘরে। জানাল, 'লাশের পরিচয় পাওয়া গেছে, চিফ। রক চেনি। ওর ভাই ডিক চেনির লাশও পাওয়া গেছে, সি-গাল পয়েন্টে।'

পেট্রলম্যানকে দ্বিধা করতে দেখে চিফ জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু বলবে, টমি?'

'ডিকের অবস্থাও ওর ভাইয়ের মতই। চেনির হাতে ক্যামেরা ছিল, আর ডিকের এক পায়ে বাঁধা ছুরির খাপ।'

'শুধু খাপ? ছুরিটা?'

'না, ছুরি নেই। রবারের সেফটি রিং লাগানো খাপ। আপনাআপনি ছুরিটা খুলে পড়ার কথা নয়।'

'হুঁ! তারমানে খুলে হাতে নিয়েছিল।' রানার দিকে তাকালেন ম্যাককুইন। 'তার মানে, স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক নয়, খুন।' হাত

নেড়ে পেট্রলম্যানকে চলে যেতে ইশারা করলেন।

কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল টমি।

'আরও কিছু বলবে?' চিফ জিজ্ঞেস করলেন।

'গ্যারি কুনার এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

'আমি জানতাম! জানতাম, ওর কানে যাবেই, আর দেখা করতে আসবেই!' ফোঁস করে যেন হতাশার নিঃশ্বাস ফেললেন ম্যাককুইন। 'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও। কথা বলাটাই নিরাপদ, নইলে কালকের মধ্যেই কানেকটিকাটের কারও আর জানতে বাকি থাকবে না ওয়াটারবোরোর সাগরে লক নেস মনস্টারের দাদা এসে হাজির হয়েছে, পানিতে নামলেই খাবে।' টমি চলে গেলে রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'তা-ও রক্ষে যে শুধু গ্যারিটাই এসেছে, বাকি পত্রিকাগুলো আসেনি। ওকে হয়তো সামান্য কিছু তথ্য দিয়ে আর স্কচ খাইয়ে বিদেয় করতে পারব।'

ওয়াটারবোরো ক্রনিকল পত্রিকার ঝানু সাংবাদিক গ্যারি কুনার। তিরিশ বছর ধরে সাংবাদিকতা করছে। এক সময় বড় শহরের দৈনিক পত্রিকায় কাজ করত। পরে সাগরপাড়ের এই ছোট্ট শহরে কম পরিশ্রমের আয়েশী জীবন বেছে নিয়ে সাময়িক পত্রিকায় কাজ করছে।

ঘরে ঢুকে পিছনে দরজাটা লাগিয়ে দিল কুন্যার। বয়েস পঞ্চান্ন। ওজন বেশি। প্রচুর মদ খায়। ছাপ পড়েছে চোখের চারপাশে আর মুখের বিভিন্ন জায়গায়।

'খবরটা পেয়ে আর এক সেকেন্ড দেরি করিনি, স্টিভ, চলে এলাম,' ম্যাককুইনের দিকে তাকিয়ে বলল ও। রানার সঙ্গে হাত মেলাল। 'পত্রিকায় আপনার ছবি দেখেছি। অসপ্রি আইল্যান্ড লিজ নিয়েছেন। কেন যে ওই অকাজের দ্বীপটা নিতে গেলেন...যাকগে, সেটা আপনার ব্যাপার।'

'এসো, গ্যারি, বসো,' হাসিমুখে বললেন ম্যাককুইন।

হাসিটা যে জোর করে ফোটানো সেটা না বোঝার মত বোকা

নয় কুনার। ম্যাককুইনের মুখোমুখি একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল ও। 'শুনলাম, রকের হাতে একটা ভিডিও ক্যামেরা বাঁধা ছিল?'

দ্বিধা করলেন ম্যাককুইন। মাথা ঝাঁকালেন। 'হ্যাঁ, ছিল। তবে পানি ঢুকে টেপটা ভিজে গেছে।'

'ভিজবে কেন? পানিতে ডুবে ছবি তুলতে গিয়েছিল। আন্ডারওয়াটার ক্যামেরা নেয়নি?'

'নিয়েছিল। আসলে আমাদের জিনিয়াসদের কর্ম। খোলার সময় সর্বনাশটা করেছে, পানি ঢুকিয়ে ফেলেছে ক্যামেরায়। যা-ই হোক, টেপে এমন কিছু নেই।'

'কী করে জানলে?'

'দেখেছি তো?'

'টেপটা ভিজে গেছে বললে না?'

'মুছে নিয়েছি।'

'ওই মোছা টেপটা আমি দেখলে কোন অসুবিধে আছে?'

'না, নেই। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।' টেলিভিশন অন করে ভিডিও ক্যামেরার 'প্লে' বাটনটা টিপলেন ম্যাককুইন। 'তবে আমাকে কথা দিতে হবে, যা দেখবে কাউকে বলবে না, পত্রিকায় ছাপানোর সময় হয়নি এখনও। আসলে কী ঘটেছে, এখনও জানি না আমরা।'

'আমাকে তুমি চেনো, স্টিভ,' কুনার বলল। 'যা দেখব সব ভুলে যাব, এখান থেকে বেরিয়ে কিচ্ছু আর মনে থাকবে না।' চোখের আগ্রহী দৃষ্টি টেলিভিশনের স্ক্রিনে নিবদ্ধ।

ডিক চেনির একটা অস্পষ্ট ছায়া স্ক্রিনে ফুটে উঠল। ঝাঁকি খাচ্ছে ছবি, লাফাচ্ছে, সিগন্যাল স্থির হতে পারছে না। এক মুহূর্তের জন্য ডিকের ছবি স্পষ্ট হলো। ওর চেহারায় আতঙ্ক। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। মুখ হাঁ। চিৎকার করে ভাইকে সাবধান করছে

'কী দেখল?' কুনারের প্রশ্ন।

'দানব!' রসিকতা করে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন ম্যাককুইন।

হঠাৎ ক্যামেরার চোখ ঘুরে গেল নীচে বালির দিকে। আর্তনাদ ও গোঙানি শোনা গেল। আবার ঝাঁকি দিয়ে সোজা হলো ক্যামেরার চোখ। সবুজ, ধোঁয়াটে কী যেন দেখা গেল পানিতে।

'রক্ত না?' কুনারের প্রশ্ন।

'মনে তো হচ্ছে,' জবাব দিল রানা। 'তেত্রিশ ফুট নীচে রক্তের রঙ সবুজ দেখায়।'

ক্যামেরার চোখ সরে গেল আবার। এবার শুধু পানি, আর কিছু নেই। শেষ একটা আতঙ্কিত চিৎকার শোনা গেল। তারপর আর কোন শব্দ নেই।

'চিৎকার করল কেন ডিক? কী দেখেছিল?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কুনার।

'আরেকবার চালিয়ে দেখা যাক,' ম্যাককুইন বললেন।

টেপটা ঘুরিয়ে আবার শুরুতে এনে 'প্লে' টিপলেন তিনি। মনোযোগ দিয়ে আরও একবার দেখা শেষ করে বললেন, 'মনে হচ্ছে ডিকই রককে খুন করেছে।'

'তাহলে ডিককে খুন করল কে?' কুনারের প্রশ্ন।

'হয়তো একে অন্যকে খুন করেছে ওরা।'

মাথা নাড়ল কুনার। 'ধূর, তাই কী হয় নাকি! দুই ভাইয়ে খুব মিল ছিল। ওদের আমি ভাল করেই চিনতাম। ডিক রককে ওস্তাদ মানত। ও কেন খুন করতে যাবে?'

'ড্রাগ,' ম্যাককুইন বললেন। 'কোনও একজন হয়তো ড্রাগ নিত। ধরা যাক, ডিক। ডুব দেয়ার আগে ড্রাগ নিয়েছিল ও। পানির নীচে নেমে মাথা গরম করে অঘটনটা ঘটিয়েছে।'

'উঁহু,' আবার মাথা নাড়ল কুনার। 'প্রচণ্ড ড্রাগবিরোধী ছিল ডিক। ড্রাগে নিরুৎসাহিত করতে যত মিটিং ডাকা হতো এ শহরে,

সবগুলোতে যোগ দিত ও। নিজেও মিটিং ডাকত। ধর্মেও বিশ্বাস ছিল ওর। নিয়মিত না হলেও, গির্জায় যেত। ড্রাগ তো দূরের কথা, মদ, সিগারেট, কিছুই খেত না। ডিক রককে খুন করেছে, আমি বিশ্বাস করি না।'

'কী বিশ্বাস করবে তাহলে?' ভুরু নাচালেন ম্যাককুইন।

'আপাতত এটা একটা রহস্য,' জবাব দিল কুনার। 'সেভাবে লিখেই ছাপব। জানো তো, ভাল রহস্য সব সময়ই পত্রিকার কাটতি বাড়ায়।'

'আজেবাজে লেখা অকারণে মানুষকে আতঙ্কিতও করে,' ম্যাককুইন বললেন। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। কুনারকে কীভাবে ঠেকানো যায় ভাবছেন হয়তো। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। 'মাত্র সাড়ে ন'টা বাজে, কিন্তু মনে হচ্ছে গলাটা না ভিজিয়ে আর থাকতে পারব না!' পকেট থেকে চাবি বের করে ফাইল কেবিনেটের নীচের ড্রয়ারটা খুললেন তিনি। একটা স্কচের বোতল আর তিনটে কাগজের কাপ নিয়ে ফিরে এলেন। একটা কাপে দুই ইঞ্চি পরিমাণ স্কচ ঢেলে কুনারের দিকে ঠেলে দিলেন আরেকটাতে ঢেলে রানাকে সাধলেন। মাথা নেড়ে মানা করে দিল রানা। সেই কাপটা তখন নিজেই নিলেন ম্যাককুইন। চুমুক দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন। 'ব্লেসিং অভ দা ফ্লিটে এবার কোনও গেস্ট আসছে নাকি তোমার, কুনার?'

'বোন আসছে। সাথে ভাগ্নেভাগ্নিরা। আর এলে তো দিন সাতেক অন্তত যাওয়ার নাম করবে না।' নিজের কাপে চুমুক দিল কুনার।

হঠাৎ করে ব্লেসিঙের আলোচনা শুরু করলেন কেন চিফ, বুঝল না রানা। শোনার আগ্রহও নেই। ওঠার ভঙ্গি করল।

বাধা দিলেন ম্যাককুইন। 'থাকুন না আরেকটু।' কুনারের দিকে তাকালেন। 'সবার ধারণা এবারকার ব্লেসিংটা অন্যান্যবারের চেয়ে বড় হবে। সব জায়গা থেকে লোক আসা শুরু হয়েছে।

কানায় কানায় ভর্তি হয়ে যাবে ক্যাসিনোগুলো।'

'সে-রকমই তো শোনা যাচ্ছে,' কুনার বলল।

'মানুষ যত বেশি হয়, ঝামেলাও বাড়ে। সমস্যার অন্ত থাকবে না আমাদের।'

'তা ঠিক।'

'শোনো, গ্যারি,' ম্যাককুইন বললেন 'আমি জানি, তোমার পত্রিকার জন্যে খবর দরকার। গরম গরম খবর দিতে পারলে পত্রিকার কাটতি বাড়বে। তবে এমন কিছু ছাপতে যেয়ো না, যাতে টুরিস্টরা তোমাকে পাগল ভাবে, কাটতি বাড়ার বদলে আরও কমে।'

'কী বলতে চাও?'

'তেমন কিছুই না। বলতে চাই, ওয়াটারবোরোর সাগরে হাঙরের আক্রমণের কোন সম্ভাবনাই নেই। লোকে নিশ্চিন্তে বোট নিয়ে বেরোতে পারে।' রানার দিকে ফিরলেন ম্যাককুইন। 'কী বলেন, মিস্টার রানা?'

'না, হাঙরে খায়নি, এটা ঠিক...'

রানাকে কথা শেষ করতে দিলেন না ম্যাককুইন। কুনারকে বললেন, 'ওই যে, শোনো, মিস্টার মাসুদ রানা কী বলছেন। টেপে কী আছে তা-ও নিজের চোখেই দেখলে। হাঙরের ছায়াও নেই। এখন তো নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবে, পানির নীচে হঠাৎ করেই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ডিকের?'

'কিংবা এমন কিছু দেখেছিল, যেটা ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছিল।'

'নাবিকের ভূত দেখেছিল! হাহ্-হাহ্-হাহ্!'

কিন্তু এত সহজে ভোলার পাত্র নয় কুনার। হাসল না। 'দেখতেও তো পারে?'

'দুই চুমুক গিলেই মাথা গড়বড় হয়ে গেল নাকি তোমার? আমি বলছি, দেখার মত কিছুই ছিল না ওখানে। হঠাৎ করে খেপে

গিয়ে ভাইকে খুন করেছে ডিক। রকও ছেড়ে কথা কয়নি। পানির নীচে মারামারি করতে গিয়ে মরেছে দুজনেই।'

'মাথাটা আসলে তোমার খারাপ হয়েছে। এ যেন সেই ছেলে ভুলানো সাপের ছড়া শোনাচ্ছ–দুটো সাপ একটা আরেকটাকে লেজের দিক থেকে গিলতে গিলতে একসময় নেই হয়ে গেল দুটোই। প্র্যাকটিক্যাল কথায় এসো, স্টিভ। এক এক করে প্রশ্নগুলো খতিয়ে দেখা যাক। প্রথম প্রশ্ন: চিৎকার করল কেন ডিক? কী দেখেছিল? রক্ত কীসের?'

'সহজ জবাব। ভাইয়ের ওপর রেগে গিয়ে চিৎকার করেছে ডিক। ছুরি দিয়ে খোঁচা মেরেছে...'

'ও, ডিকের একটা ছুরিও ছিল?'

'ছিল,' ম্যাককুইন জবাব দিলেন। মনে মনে হাসল রানা। চিফের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বেফাঁস কথাটা বলে ফেলে মনে মনে গালাগাল করছেন নিজেকে। 'ও তোমাকে বলিনি বুঝি? ওর পায়ের সাথে বাঁধা খাপের মধ্যে ছিল ছুরিটা। কিন্তু ওর লাশ যখন পাওয়া গেল, তখন ছিল না। তোমার জন্য আরেকটা বিরাট খবর, তাই না? হাহ্ হাহ্ হা!'

এবারও হাসল না কুনার। কাপটা টেবিলে রেখে রানার দিকে তাকাল। 'আপনার কী মনে হয়, মিস্টার রানা?'

'কী বলব বুঝতে পারছি না,' রানা জবাব দিল। 'তবে কিছুটা যে...

'কিছুটা কী?' বাধা দিয়ে বললেন ম্যাককুইন। রুক্ষ হলো কণ্ঠস্বর। 'আমি যা বললাম, তারচেয়ে ভাল আর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন?'

'না,' মাথা নাড়ল রানা।

'তুমি একজন ভাল রিপোর্টার, গ্যারি,' ম্যাককুইন বললেন। 'আজেবাজে খবর ছেপে নিজের সুনাম নষ্ট কোরো না।'

সন্তুষ্ট হতে পারছে না কুনার। 'মেডিক্যাল এক্সপার্টের

রিপোর্টটা এলে আমাকে দেখাবে?'

'অবশ্যই। মৃত্যুর কারণটা আমি জানার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে খবর দেব।' কুনারের ক্যাপে আরেকটু স্কচ ঢেলে দিলেন ম্যাককুইন। 'তবে এখনই বলে দিতে পারি, রিপোর্টে কী আসবে। ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে খুনগুলো করা হয়েছে। তোমার পাঠকদেরকে একটা কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দাওগে, নেশা করে কেউ যাতে ডুব দিতে না যায়। হার্টের অবস্থা যাদের ভাল না, ব্লাড প্রেশার বেশি, তাদেরও সতর্ক করে দিয়ো...

দরজায় আবার থাবা পড়ল। দরজা খুলে উঁকি দিল টমি। রানাকে বলল, 'আপনার ফোন, সার।'

'আসছি,' উঠে দাঁড়াল রানা।

'না, আসতে হবে না, কেটে দিয়েছে,' হাত নাড়ল টমি। 'মিস্টার ওয়াগনার ফোন করেছিলেন। আপনার আর ভিকির খোঁজ নিচ্ছিলেন। আপনাকে জানাতে বলেছেন, সি লায়নগুলো এসে গেছে।'

'তাই নাকি। থ্যাংকস, টমি।' ম্যাককুইনের দিকে ফিরল রানা। 'এবার আমাকে ছাড়ুন, চিফ। দরকার হয়, পরে কথা বলা যাবে।'

'ঠিক আছে, মাথা কাত করলেন ম্যাককুইন। কুনারের দিকে ফিরলেন আবার। 'তাহলে ওই কথাই রইল, গ্যারি। ডিক ও রক পরস্পর মারামারি করে খুন হয়েছে, এর বেশি ছাপবে না পত্রিকায়।' রানাকে বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার রানা, আমাদেরকে সময় দেয়ার জন্যে। এখন যা করার পুলিশই করবে। অসপ্রি আইল্যান্ডে এসে সামুদ্রিক প্রাণী নিয়ে গবেষণার জন্যে আমরা আপনার ওপর ভীষণ খুশি, মিস্টার রানা। আশা করি, আপনার টানে অনেক টুরিস্ট আসবে। বুঝতে পেরেছেন?'

রক ও ডিকের মৃত্যু নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে পুলিশ যে সেটা ভাল চোখে দেখবে না. স্পষ্ট করেই ইঙ্গিতটা দিয়ে দিলেন

চিফ। একরাশ অস্বস্তি নিয়ে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা। দুই ভাই মাথা গরম করে পরস্পরকে খুন করেছে—চিফের এই ব্যাখ্যা কোনমতেই মেনে নিতে পারছে না। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে ও। মনে হচ্ছে ভয়ানক বিপদ এসে পড়েছে প্রায় ঘরের কাছে।

লবিতে এসে দেখল, টুলে বসে পত্রিকা পড়ছে ভিকি। পুলিশের গাড়িতে করে দুজনকে ডকে পৌঁছে দিতে চলল টমি।

'মিস্টার রানা,' গাড়ি চালাতে চালাতে পেট্রলম্যান বলল, 'ডিককে যেখানে পাওয়া গেছে, সেখান থেকে একশো গজ দূরে সি-গাল পয়েন্টের কাছে আপনাদের একটা বয়া ভাসতে দেখা গেছে। রবারে মোড়া অনেক লম্বা একটা তার বাঁধা বয়াটায়। সৈকতে তুলে রাখতে বলেছি জিনিসগুলো। ফেরার পথে নিয়ে যেতে পারেন।'

'থ্যাংকস,' রানা বলল। 'পানির নীচে কোন কিছুতে আটকে গিয়েছিল সেন্সরটা। খুলতে না পেরে বয়ায় বেঁধে ফেলে এসেছিলাম। পরে গিয়ে আর তুলে আনা হয়নি। সেন্সরটা নিশ্চয় ছুটে গিয়ে ভেসে চলে গেছে বয়াটা।'

'না, ভেসে যায়নি। বয়াটা চেনিদের বোটে পাওয়া গেছে, হুকে আটকানো।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। রক ও ডিকের মৃত্যুরহস্য নিয়ে ভাবতে লাগল।

ভিকি ও রানাকে ডকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল পেট্রলম্যান।

বোটে ওঠার পর রানাকে বলল ভিকি, 'আঙ্কেল, ওকে দেখেছি।'

নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল রানা। 'উঁ! কাকে?'

'মেয়েটাকে।'

'মেয়েটাকে মানে?'

'ভুলে গেছেন? যাকে ধাক্কা দিয়েছিলাম।'

'কোথায় দেখলে?'

'খবরের কাগজে। একটা পুরস্কার পেয়েছে। তাই পত্রিকায় ওর ছবি ছাপা হয়েছে। আমার রোলারব্লেডের চাকার শব্দ না শোনার কারণও জেনে গেছি। মেয়েটা কানে শোনে না।'

'নাম কী?'

'সান্তা।'

আঠারো

মূল ভূখণ্ড থেকে বেরিয়ে থাকা একটা নিচু জায়গার নাম সি-গাল পয়েন্ট। একটা উপদ্বীপ। কাছাকাছি এসে বোটের মুখ ঘোরাল রানা। গতি কমাল। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সৈকতের দিকে।

অসপ্রি আইল্যান্ডের মতই সি-গাল পয়েন্টও একসময় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। মূল বাসিন্দারা চলে গেলে পাখিরা এসে দখল নিয়েছে। এখন বার্ড স্যাংচুয়ারিই হয়ে গেছে দ্বীপটা। গাল, টার্ন, এসব পাখির জন্মস্থান। মাঝেসাঝে বোট নিয়ে লোকে পিকনিক করতে কিংবা সাঁতার কাটতে চলে আসে এখানে।

পাখির কলরব কানে আসছে দূর থেকেও। চক্কর দিয়ে দিয়ে উড়ছে। কিন্তু একটা পাখিও সৈকতে আসছে না। পানিতে নামছে না। ব্যাপারটা অবাক করল রানাকে। এমন শান্ত দিনে পানিতে নেমে মাছ খাওয়ার কথা পাখিগুলোর।

'আঙ্কেল, দেখুন!' সামনে ডানদিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল ভিকি।

ফিরে তাকাল রানা। নিউট্রাল করে দিল ইঞ্জিন। আপনগতিতে ভাসতে ভাসতে এগোল বোট। পানিতে ভাসছে সাদা কিছু। বোটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বোট-হুক দিয়ে ওটাকে ঠেকাল ও।

একটা মরা পাখি। সি-গাল। পেট ওপরের দিকে করে ভাসছে। পাখিটা তুলে আনল রানা। মাথা নেই।

বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ভিকি।

পাখিটার কাটা গলাটা ভাল করে দেখল রানা। দাঁতের দাগ খুঁজছে। কিংবা আঁচড়ের দাগ—রকের লাশের গায়ে যে রকম দাগ দেখেছে। কিন্তু নেই। মাথা ধরে স্রেফ টান দিয়ে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলেছে গলা থেকে।

'ওই যে আরেকটা!' চেঁচিয়ে বলল ভিকি।

হাতের মরা পাখিটা বোটের খোলে রেখে দিল রানা।

দ্বিতীয় পাখিটার কাছে এসে দেখল, এটা ভাসছে উপুড় হয়ে। মাথাটাও গলার সঙ্গে যুক্তই আছে। অল্প পানিতে এমনভাবে গলা লম্বা করে দিয়ে ভেসে রয়েছে, যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাসছে। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। গলা ধরে পাখিটাকে তুলে নিল রানা। এটার দুই পা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। পেট ফেড়ে দেয়ায় বেরিয়ে পড়েছে নাড়ীভুঁড়ি।

'কার কাজ?' ভিকির প্রশ্ন। 'ব্লু-ফিশ?'

'না। ব্লু-ফিশ হলে খেয়ে ফেলত।'

'তাহলে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'জানি না। বুঝতে পারছি না কিছু।'

দড়ি ধরে প্রায় ঝুঁকে পড়ে গলা লম্বা করে দিয়ে সৈকতের দিকে তাকাল ভিকি। 'ওই যে আমাদের তার...আরে দেখুন, দেখুন, আরও মরা পাখি!'

অগভীর পানিতে পৌঁছে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা। আউটবোর্ড ইঞ্জিন, উঁচু করে তুলে রাখল পানি থেকে, যাতে প্রপেলার বালিতে আটকে না যায়। আপন গতিতে ভাসতে ভাসতে বোটের সামনের দিকের তলাটা এসে ঠেকল সৈকতের বালিতে।

সাগরে ভাসছে অসংখ্য মৃত পাখি, ঢেউয়ের খাঁজে ওঠানামা

করছে। কোনটার গলা ছেঁড়া, কোনটার পেট চেরা, কোনটার ডানা, পা, মাথা ছিঁড়ে কয়েক টুকরো করে ফেলা হয়েছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। দু'একটা পাখি তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল রানা। আবার পানিতে ফেলে দিল।

'উন্মাদের কাজ!' বিড়বিড় করল রানা। 'রক্তলোভী খুনে কোন উন্মাদ!'

'মানুষ?' ভিকি জিজ্ঞেস করল।

'যেভাবে মেরেছে, তাতে তো মানুষ মনে হচ্ছে না। কিন্তু সাগরের কোনও প্রাণী এভাবে শুধু নিষ্ঠুর খেলা খেলার জন্য খুন করেছে পাখিগুলোকে, এটাও বিশ্বাস করতে পারছি না। বুনো প্রাণীরা অন্য প্রাণীকে খুন করে হয় খাওয়ার জন্যে, নয়তো আত্মরক্ষার জন্যে। কিন্তু পাইকারি হারে মেরে রেখে যায় না।'

'আমাদেরকে কিছু করবে না তো?' ভিকির চোখে ভয়।

'বলা যায় না,' দুশ্চিন্তা দেখা যাচ্ছে রানার চোখে। 'সাবধান থাকতে হবে আমাদের।'

গলুই থেকে লাফিয়ে সৈকতে নামল ভিকি। রানাও নামল। বোটটাকে টেনে ওপরে তুলে রাখল যাতে ভেসে না যায়। তারের বান্ডিলের কাছে এসে দাঁড়াল। কুণ্ডলী পাকিয়ে সুন্দর করে বেঁধে রেখে গেছে পুলিশ।

ধরাধরি করে সেন্সর সহ তারের বান্ডিলটা নৌকার কাছে নিয়ে এল দুজনে। বোটে তুলল। ঠেলে আবার পানিতে নামাল বোটটা। বালিতে ঠেকলে প্রপেলারের পাখা ভেঙে যেতে পারে, সেজন্য কোমর পানি পর্যন্ত লগি দিয়ে ঠেলে সরিয়ে আনল বোটটা। তারপর ইঞ্জিন চালু করল। একটা মরা পাখি এসে ধাক্কা খেল খোলের গায়ে। অল্প বয়েসী একটা টার্ন। ডানা দুটো গোড়া থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

বোটের নাক পুব দিকে ঘোরাল রানা।

চলল অসপ্রি আইল্যান্ডে

উনিশ

বমি পাচ্ছে পিটার সোয়ানসনের। শ্বাস নেয়ার সময় রক্ত, নাড়ীভুঁড়ি ও ডিজেলের ধোঁয়ার মিশ্র দুর্গন্ধ ফুসফুসে ঢুকছে। ঢেউয়ের মধ্যে বোটের মোচড় খাওয়া, দুলুনি আর ওঠানামার সময় মনে হচ্ছে পাকস্থলীটা হঠাৎ করে পায়ের কাছে নেমে গিয়ে পরক্ষণে লাফ দিয়ে উঠে আসছে গলায়।

বমি করে ফেলতে পারলে হয়তো আরাম হতো, কিন্তু ক্যাপ্টেনের ভয়ে পারছে না। ক্যাপ্টেন জর্জ অ্যাংলার ওর এমন অবস্থা করে ছাড়বে, চিরকাল তাকে দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে ফিরবে ওই স্মৃতি।

ডেকের কিনারে এসে দাঁড়াল ও। যেখানে ইঞ্জিনের পোড়া ডিজেল আর মরা মাছের ভয়াবহ দুর্গন্ধ নাকে ঢোকে কম। রক্তমাখা হাত যাতে বোটের চকচকে ফাইবারগ্লাসে না লাগে সে-ব্যাপারে সাবধান রইল। পিছনে অসপ্রি আইল্যান্ড চোখে পড়ছে। তার ওপাশে ন্যাপাট্রি পয়েন্ট। এবং তারও ওপাশে অনেকটাই দূরে ওয়াটারবোরো শহরের উঁচু ওয়াটার টাওয়ার।

'এই, গাধা,' ফ্লাইং ব্রিজ থেকে হাঁক দিল অ্যাংলার, 'আলসেমির সময় নাকি এটা? ডেক মোছো, ডেক মোছো, রক্ত শুকিয়ে যাবে তো।'

'মুছছি, সার, মুছছি,' বলে রক্তাক্ত ডেকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল পিটার। ইতিমধ্যেই দশটা বড় ব্লু-ফিশ কেটেছে ও। আঁশ ছুলেছে। পেট কেটে নাড়ীভুঁড়ি সব বের করে ফেলে দিয়ে মাংসটা

খবরের কাগজ দিয়ে মুড়েছে। বোটের সামনের ডেকে মাছ রাখার বাক্সে আরও বিশটা মাছ রয়েছে, সেগুলোকেও একইভাবে কেটে কাগজে মোড়াতে হবে।

দুজন মানুষ তিরিশটা মাছ দিয়ে কী করবে, বুঝতে পারছে না ও। একটা, বড়জোর দুটো খেতে পারবে, তার বেশি না। অহেতুক তিরিশটা মাছ মেরেছে। বাড়ি নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে। এ ধরনের সৌখিন মাছ শিকারীদের ঘৃণা করে পিটার।

প্রপেলারের ঢেউ অনুসরণ করে বোটের পিছন পিছন উড়ে আসছে ডজনখানেক সি-গাল, কর্কশ চিৎকারে কান ঝালাপালা করছে, অ্যাংলারের মতই যেন বিরক্তিকর ভঙ্গিতে কাজ শেষ করার তাগাদা দিচ্ছে পিটারকে।

বড় একটা বালতি তুলে নিল ও। ছয় ফুট লম্বা দড়ি বাঁধা রয়েছে হাতলে। বোটের পিছনের ট্র্যানসামে গিয়ে দাঁড়াল। দড়ি ধরে পানিতে ছুঁড়ে দিল বালতিটা। ঢেউয়ের মাথায় বাড়ি খেল বালতিটা, লাফিয়ে উঠল, তারপর কাত হয়ে গিয়ে এত দ্রুত পানিতে ভরে গেল, হ্যাঁচকা টান লেগে আরেকটু হলেই পানিতে পড়ে যাচ্ছিল পিটার। পানি ভর্তি বালতিটা তুলে আনল ও। সমস্ত পানি ঢেলে দিল রক্তাক্ত ডেকে। ব্রাশের সাহায্যে রক্ত ও আঁশগুলো ঠেলে নিয়ে গিয়ে বোটের এক পাশের নালি দিয়ে পানিতে ফেলতে লাগল।

সাগরের পানিতে রক্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাখির দল। মাংস না পেয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, যেন ঝগড়া করছে পিটারের সঙ্গে।

বালতিটা একপাশে ঠেলে সরিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল পিটার। কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে টেনে বের করল মাছ কাটার বড় ছুরি। বাক্স থেকে একটা ব্লু-ফিশ বের করে এনে ডেকে ফেলল। প্রথমে ফুলকো কেটে ফেলে দিয়ে রক্তটুকু বেরিয়ে যাবার অপেক্ষা করল। তারপর পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি টেনে বের করল। কেটে

আলাদা করে ডেকের কিনার দিয়ে ছুঁড়ে দিল পানিতে।

পানিতে ডাইভ দিয়ে পড়ল গালগুলো। খাবার দেখে খেপে উঠল যেন। একটা নাড়ি নিয়ে টানাটানি শুরু করল দুটো পাখি। পানিতে দাপাচ্ছে। রবারের মত নাড়িটা পরস্পরের কাছ থেকে কেড়ে নিতে মরিয়া।

চেরা মাছটাকে একপাশে কাত করে ফেলে আঁশ চাঁছতে আরম্ভ করল পিটার। মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছে নিজের দুর্ভাগ্যকে, বাবাকে, আর অ্যাংলারকে।

এ রকম একটা জঘন্য চাকরি করতে আসার কোনই ইচ্ছে ওর ছিল না। সামার স্কুলে লেখাপড়া করতে চেয়েছিল ও। কিন্তু বাবাকে রাজি করাতে পারেনি। বাবা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে, লেখাপড়ার খরচ দিতে পারবে না। বাবার যুক্তি, পড়ে কী হবে? চাকরি তো পাওয়া যায় না। তাই যখন খবর পেল অ্যাংলারের বোটের মেইট জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে, লোক খুঁজছে অ্যাংলার, সঙ্গে সঙ্গে ওকে ফোন করে পিটারের জন্য চাকরিটা নিয়ে ফেলল বাবা।

স্পোর্টসশিপ বোটের মেইট, ঘণ্টা হিসেবে মাইনে–দশ ডলার করে–সেই সঙ্গে যাত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া টিপস। আবহাওয়া ভাল থাকলে শিকারের অভাব হয় না। তখন দিনে এক-দেড়শো ডলার আয়। আবহাওয়া খারাপ না থাকলে সপ্তাহের সাতদিনই কাজ করতে হবে।

টাকাটা হিসেব করেই কাজটা নিতে আপত্তি করেনি পিটার। শিকারের মৌসুমে কাজ করে কিছু টাকা জমিয়ে ফেলতে পারলে সেই টাকা দিয়েই নিজের লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারবে। কিন্তু বোটে কাজ শুরু করার পর বুঝল, পরিশ্রমটা অমানুষিক। ও ভেবেছিল মেইট মানে অফিসার। বোট চালাবে, মাঝে সাঝে মাছ ধরতে সাহায্য করবে যাত্রীদের। কিন্তু অ্যাংলার ওকে দিয়ে ওয়েইটারের কাজ থেকে শুরু করে যাত্রীদের ফাইফরমাস

খাটানো, মাছ কাটানো, খালাসির কাজ, বোট পরিষ্কার, সবই করিয়ে নিতে লাগল। যন্ত্রণার এখানেই শেষ নয়। কোনও যাত্রীর বড়শি থেকে মাছ ছুটে গেলে পিটারকে দোষ দিতে থাকবে অ্যাংলার, বলবে বড়শিটা ঠিকমত বাঁধেনি। সাগরযাত্রা সইতে না পেরে কিংবা অতিরিক্ত মদ খেয়ে কোন যাত্রী বমি করে ফেললে সেটা পরিষ্কার করার দায়িত্বও মেইটের।

অ্যাংলার মানসিক রোগী। অসহায় কাউকে পেলে নির্যাতন করে আনন্দ পায়, জানা ছিল না পিটারের। তার উপর সারাক্ষণ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে। ব্রিজের দেয়ালে একটা হুকে ঝোলানো থাকে মদের ফ্লাস্ক। একটু পর পরই চুমুক দেয়।

অনেক যাত্রীই কিছু মনে করে না তাতে। ক্যাপ্টেন বোট চালানোর সময় মদ খায়, তাতে কার কী? ঠিকমত চালাতে পারলে আর ওদেরকে শিকারের সুযোগ করে দিতে পারলেই হলো। এই যেমন আজকের দুজন। ব্লু-ফিশগুলোকে মারার পর কেবিনে বসে মদ খাচ্ছে।

মাছের পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি বের করছে পিটার, এ সময় এয়ার-কন্ডিশনড কেবিনের দরজা খুলে উঁকি দিল একজন শিকারী। 'এই ছেলে, আমাদের বরফ শেষ। জলদি নিয়ে এসো তো।'

'আনছি, সার।' বালতি দিয়ে পানি তুলে হাতের রক্ত ধুলো পিটার। হাতে লেগে থাকা মাছের দুর্গন্ধ তাতে একটুও কমল না। এই হাত দিয়ে বরফ ধরলে তাতে মাছের গন্ধ লেগে যাবে তবে লোকগুলো এতটাই মাতাল, হয়তো খেয়ালই করবে না।

পানির মাত্র দু'তিন ফুট নীচে থেকে রক্তাক্ত বর্জ্যের লোভনীয় গন্ধের মধ্যে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে দানবটা। কিন্তু কিছুই পাচ্ছে না। গন্ধ অনুসরণ করে অ্যাংলারের বোটের পিছন পিছন সাঁতরে চলেছে। ফুলকো দিয়ে ঢুকছে-বেরোচ্ছে রক্তমেশানো

তেলতেলে পানি।

কেবিনে বরফ দিয়ে এসে আবার মাছ কাটতে বসল পিটার। মাংস রেখে বর্জ্যগুলো ছুঁড়ে ফেলছে ডেকের কিনার দিয়ে। ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সি-গালের দল।

ডেকে আবার রক্ত জমে গেছে। বালতি দিয়ে পানি তুলে ডেকে ঢেলে দিল পিটার। ব্রাশ দিয়ে ঠেলে সরাল রক্ত ও আঁশ।

সব রক্ত পরিষ্কার হলো না। ধোয়ার জন্য আরও পানি দরকার। বালতিটা তুলে দড়ির মাথা হাত ও কব্জিতে পেঁচিয়ে বোটের পিছন দিকে চলল।

'অ্যাই, গাধা,' ধমকে উঠল অ্যাংলার, 'ধোয়া শেষ হয়নি?'

'এই যে, সার, হয়ে এল।'

'তাড়াতাড়ি করো। কয়েকটা মাছ কাটতেই সারা দিন লাগিয়ে দেবে নাকি? আর কাজ নেই?' মদের বোতলে চুমুক দিল অ্যাংলার। সামনের দিকে তাকিয়ে বোট চালানোয় মন দিল।

পানিতে বালতি ফেলল পিটার। কাত হয়ে ডুবে গেল বালতি। দড়ি ধরে টান দিল। আচমকা পিছলে গেল পা থাবা দিয়ে রেলিঙ ধরতে চাইল। কিন্তু রেলিং অনেক দূরে। হাতে লাগল না। এক হাতে পানি ভরা বালতির দড়ি পেঁচানো। ওটার টান সামলাতে না পেরে ডিগবাজি খেয়ে পানিতে পড়ল ও।

অনেক অপেক্ষার পর পেয়েছে পছন্দের শিকার। বাঁকানো নখে আঁকড়ে ধরে দ্রুত নীচে নেমে চলল দানবটা। শিকারের ছটফটানি অনেক আগেই থেমে গেছে। মেরে ফেলতে কয়েক সেকেন্ডও লাগেনি।

নীচে নেমে সাদা নরম মাংস কামড়ে ছিঁড়ে গিলতে আরম্ভ করল। বুভুক্ষের মত শুষে খেতে লাগল গরম রক্ত-রস। খেতে খেতে গলা পর্যন্ত ভরে গেল। আর জায়গা নেই পেটে। আরাম

করে বালিতে বসে তখন ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে টুকরো টুকরো করতে লাগল। কাজটা ওর কাছে এক মজার খেলা।

বেশ কিছুক্ষণ পিটারের কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে ফিরে তাকাল অ্যাংলার। পিটারকে না দেখে গর্জন করে উঠল, 'এই, গাধার বাচ্চা গাধা! হারামজাদাটা গেল কোথায়?'

কিন্তু সাড়া এল না কারও কাছ থেকে।

বিশ

দুপুরের ঠিক পর পর ওএইলারটাকে স্লিপে ঢোকাল রানা। আন্টি মিসেস মেলভিলকে হেঁটে আসতে দেখল ডকের দিকে। তাঁর হাতে পুরনো আমলের একটা বেতের ঝুড়ি। ওতে কী আছে রানা জানে: একটা স্যান্ডউইচ, এক থার্মোফ্লাস্ক ভর্তি বরফ মিশানো চা, মাছ ধরার সরঞ্জাম ও মাছের টোপ–ফেলে দেয়া মাংস ও চর্বির টুকরো, নষ্ট হয়ে যাওয়া রুটি ইত্যাদি। এ সময়টায় এখানে বসতে ভাল লাগে তাঁর। লাঞ্চ সারেন। বড়শি দিয়ে ছোট ছোট মাছ ধরেন নীল বকটার জন্য। পাখিটা তাঁকে দেখে সরু লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা। পাহাড়ের ওপারের খাঁড়ি থেকে জানোয়ারের ডাক কানে এল।

'সি লায়ন ডাকছে!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল ভিকি। 'আঙ্কেল, যাই?'

'যাও,' রানা বলল। 'আমি আসছি।'

বোট থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড় দিল ভিকি।

বোটের তলায় পড়ে থাকা মৃত পাখিগুলোর ওপর চোখ পড়ল মিসেস মেলভিলের। 'ওগুলো এনেছ কেন?'

'খুনের নেশা চেপেছে কারও, আন্টি,' জবাব দিল রানা। 'কিংবা বলতে পারেন "কোন কিছুর"।' একটা মরা পাখি উঁচু করে ধরল। 'ডক্টর কিনকে দেখাতে নিয়ে এলাম। ম্যারিন ম্যাম্ল্ এক্সপার্ট। আলামত দেখে হয়তো বলতে পারবেন কীসে খুন করেছে।'

'খুন?'

'হ্যাঁ। সি-গাল পয়েন্টের কাছে মেরে রেখে গেছে। একটা-দুটো নয়, পাইকারি হারে।' পাখিটা আবার বোটের খোলে ফেলে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ডক্টর কিনের থাকার ঘর ঠিক হয়েছে?'

'হ্যাঁ। বিগ ওর জিনিসপত্র গোছাচ্ছে।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল। চূড়ায় পৌঁছে ভিকির হাসি কানে এল। নীচে তাকিয়ে সি লায়নের ট্যাংকে দাপাদাপি করতে দেখল ওকে। ভিকিকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে চারটে কালো ছায়া। পানির নীচে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটছে ছায়াগুলো, ভিকির পিঠে ধাক্কা মারছে। ও ধরার জন্য হাত বাড়ালেই সরে যাচ্ছে চোখের পলকে।

ট্যাংকের কিনারে দাঁড়ানো একজন মহিলা। হাত নেড়ে কী যেন বলছে লায়নগুলোকে। ভিকির সঙ্গে হাসছে।

রানাকে দেখেনি ওরা। পাহাড় বেয়ে নামতে নামতে মহিলাকে ভাল করে দেখল রানা। ও ভেবেছিল, ডক্টর কিনের বয়স হবে পঞ্চান্ন থেকে ষাট, দেখতে হবে শুকনো, হাড্ডিসার। পুরুষের মত খাটো করে ছাঁটা চুল। চোখে সরু তারের ফ্রেমে গোল গোল কাঁচ লাগানো চশমা। পায়ে পাতলা স্যান্ডেল।

কিন্তু ওর ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যে কোনও উঁচু দরের মডেল-ম্যাগাজিনে কভারের ছবি হতে পারে ডক্টর কিন। পরনে শর্ট, গায়ে

খাকি শার্ট, পায়ে নরম চামড়ার গোড়ালি-ঢাকা বুট। রূপালি চেইনে বাঁধা দামি একটা সানগ্লাস গলায় ঝুলছে। এক হাতের কব্জিতে স্টেইনলেস স্টিলে তৈরি একটা ডুবুরির ঘড়ি। বয়েস রানারই কাছাকাছি, সাতাশ-আটাশ।

রানার ওপর চোখ পড়তে চেঁচিয়ে উঠল ভিকি, 'ওই যে আঙ্কেল!'

ফিরে তাকাল ডক্টর কিন।

কাছে এসে দাঁড়াল রানা। হাত বাড়িয়ে দিল, 'মাসুদ রানা।'

'আমি ক্যারোলিন কিন,' রানার হাতটা চেপে ধরল কেরি আন্তরিক হাসি হাসল।

ভিকিকে দেখিয়ে রানা বলল, 'ও-ও তো সি লায়ন হয়ে গেছে।'

'তাই তো দেখছি,' হেসে জবাব দিল কেরি। 'ট্যালেন্টেড ছেলে। আমাকে বলল, সি লায়নগুলোর বন্ধু হতে চায়। সোজা পানিতে ঝাঁপ দিতে বললাম। তারপর আর কিছুই বলতে হয়নি, নিজে নিজেই শিখে নিচ্ছে।'

'আঙ্কেল!' চেঁচিয়ে বলল ভিকি। 'দেখুন।'

ট্যাংকের দিকে তাকাল রানা। পানি থেকে মাথা তুলে ভিকির দিকে তাকিয়ে আছে দুটো সি লায়ন। একটা লায়নের দিকে পানি ছিটাল ও। জবাবে ফ্লিপার নেড়ে ওর দিকেও পানি ছিটানো শুরু করল লায়ন দুটো, যেন বাচ্চাদের মত খেলছে। জোরে হেসে উঠে পানিতে ডুব দিল ভিকি। লায়ন দুটো ছুটে গেল ওর দিকে। মখমলের মত মসৃণ চামড়াওয়ালা শরীর ঘষে দিল ওর গায়ে।

'আশ্চর্য!' কেরি বলল। 'নতুন কারও সঙ্গে সহজ হতে, কাউকে বিশ্বাস করতে অনেক সময় নেয় ওরা। বাচ্চাদের সরলতা অবশ্য সহজেই টের পেয়ে যায়, তবে এই ছেলেটাকে এমনভাবে নিয়েছে, যেন...'

'কামড়াবে না তো?'

হেসে উঠল কেরি। 'একজন বিজ্ঞানীর মত প্রশ্ন হলো না কিন্তু।'

'আমি বিজ্ঞানী কে তা বলল আপনাকে?' হাসল রানা। 'যা জিজ্ঞেস করছি জবাব দিন।'

'এ ধরনের বুদ্ধিমান প্রাণীরা অকারণে কাউকে কামড়ায় না,' কিছুটা অবাক হয়েই রানার দিকে তাকিয়ে আছে ডক্টর কিন। 'ভয় পেলে কিংবা ভয়ানক রেগে গেলে অবশ্য আলাদা কথা। তা ছাড়া সবগুলোই মেয়ে, পুরুষ লায়নদের মত অল্পতে রেগে যায় না। সহজে বিরক্তও হয় না। তা ছাড়া পেট ভর্তি আছে। এখানে ভয় পাবার মতও কিছু দেখছে না।'

সি লায়নগুলোর সঙ্গে মিশে যাওয়া ভিকির ওপর চোখ ঘুরছে রানার। 'বুঝলাম।'

রানার সন্দেহ যাচ্ছে না বুঝতে পেরে কিন বলল, 'ওরা শিশুকাল থেকে আমার কাছেই বড় হয়েছে। ওদের আমি চিনি। চিন্তা করবেন না।'

ভুস করে পানির ওপরে মাথা তুলল ভিকি। হাসছে। হাত নেড়ে ডাকল রানা, 'অনেক হয়েছে, উঠে এসো। নীল হয়ে গেছো তো।'

'কিন্তু, আঙ্কেল...'

ভিকির দিকে তাকাল কেরি। 'লায়নগুলোরও বিশ্রাম দরকার, ভিকি। তোমারও।'

ট্যাংক থেকে উঠে এল ভিকি। ওর কাঁধ, পিঠ ডলে ডলে গরম করে দিতে লাগল রানা। বকা দিল, 'ভিজে কী অবস্থা হয়েছে দেখো...তোমার বাবা দেখলে...'

লায়নগুলোর দিকে তাকাল ভিকি। ও উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলোও উঠে পড়েছে। পাথরের ওপর বসে রোদ পোয়াচ্ছে।

'আঙ্কেল, ওদের নাম জানেন? রিটি, সুজি, মেট ও বারকি,' ভিকি বলল। 'তবে কোনটা যে কে বুঝতে পারছি না। সবগুলোকে

একরকম লাগছে আমার কাছে। কেরি আন্টি বললেন, দেখতে দেখতে নাকি চিনে ফেলব। আমার স্পেশাল ফ্রেন্ডও নাকি বানাতে পারব।'

ঠাণ্ডায় কাঁপছে ভিকি। রানা বলল, 'যাও, বাড়ি গিয়ে গোসল করে কাপড় পরে নাও।'

পা বাড়াতে গিয়ে কেরির দিকে ফিরল ভিকি। 'পরে আবার খেলতে পারব তো, আন্টি?'

'পারবে,' হেসে বলল কেরি। 'তবে আমার সামনে। ওদের সঙ্গে একা খেলার চেষ্টা কোরো না।'

চলে গেল ভিকি।

পাথরে ঘেরা ছোট একটা ডোবার মত খাঁড়ির সঙ্গে সাগরের যোগাযোগ করে দিয়ে সি লায়নের থাকার জায়গা করে দিয়েছে বিগ ও রানা। ট্যাংকের পাশে একটা ছাউনিও তুলে দিয়েছে। ওটাতে ঢুকে এক বালতি মাছ নিয়ে এল কেরি। ডাকল, 'এসো মেয়েরা, খেতে এসো!' পাথর থেকে পিছলে পানিতে নেমে পড়ল লায়নগুলো। অধৈর্য ভঙ্গিতে ডাকাডাকি করতে করতে সাঁতরে এল ট্যাংকের কিনারে। সারি দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রত্যেককে একটা করে মাছ দিল কেরি। খাওয়া শেষ হলে আরেকটা। তারপর আরও একটা। পাঁচটা করে মাছ খাওয়ানোর পর ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে, কানের পিছন চুলকে আদর করে দিল।

বালতিটা ছাউনিতে রেখে ফিরে এল ও। রানাকে বলল, 'জায়গাটা খুব সুন্দর।'

'সেজন্যেই তো লিজ নেয়ার লোভ সামলাতে পারিনি,' হেসে বলল রানা।

'পছন্দ আছে আপনার। আপনি কি শুধু হাঙরের ওপরই পিএইচডি করেছেন, না কি তিমিও আপনার...?'

'কোন কিছুর ওপরেই পিএইচডি করিনি আমি।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কেরি। 'করেননি? তাহলে ওদের সম্পর্কে পত্রিকায় এত বিচিত্র তথ্য জানান কী করে?'

'আমি আসলে, বলতে পারেন, একজন সাগর প্রেমিক। তা ছাড়া হাঙর, তিমি, স্কুইড, জায়ান্ট অক্টোপাস... সাগরের সব রকম প্রাণীতে আগ্রহ আছে আমার। মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে ছবি তুলি। নজর রাখি। ধরতে পারেন, স্রেফ বিনোদনের জন্যে। ওসব প্রাণীর যে-সব ব্যাপার অবাক করে আমাকে, তথ্য টুকে রেখে পত্রিকায় পাঠাই। অনেকটা খেয়ালের বশে। ওরা ছেপে দিয়েছে সে-সব। ছাপবে ভাবিনি।'

'না ছাপার কোনই কারণ নেই। ওসব তথ্য পড়ে আমার তো মনে হয়েছিল—শুধু আমার কেন, যে কারোরই মনে হবেঃ হাঙর ও তিমির ওপর একাধিক ডক্টরেট করেছেন বুঝি!'

হাসল রানা। ভুরু নাচাল। 'তা হলে, পিএইচডি না করেও কিছু কিছু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়?'

জবাব দিতে একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল কেরি। হাসল। 'যায় যে, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ তো সামনেই উপস্থিত দেখছি। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পার করার পর আরও পাঁচ বছর লেগেছে আমার ডক্টরেট করতে। অথচ আপনি...'

'হয়েছে, হয়েছে, বেশি প্রশংসা করলে অহঙ্কারে ফেটে যেতে পারি,' তাড়াতাড়ি কেরিকে থামিয়ে দিল রানা। 'এখানে কাজ শেষ হয়েছে আপনার?'

'আপাতত।'

'চলুন তাহলে, বাড়ি ফেরা যাক।'

একসঙ্গে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল দুজনে।

'এখন কী করছেন?' কেরি জিজ্ঞেস করল।

'এবার একটা হোয়াইট শার্ক খুঁজে পেয়েছি। বিশাল। গায়ে ট্র্যান্সমিটার লাগিয়ে দিয়ে নজর রাখছিলাম। আমাদের সেন্সরটা পানির নীচে কোন কিছুতে আটকে যাওয়ায় আর পিছু নিতে

পারিনি।'

'আবার খুঁজে বের করতে পারবেন? মজা হবে তা হলে!'

'মনে হয় পারব।' দাঁড়িয়ে গিয়ে কেরির দিকে তাকাল রানা। 'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম শুধু তিমির ব্যাপারেই আগ্রহী আপনি।'

'বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বাড়াতে অসুবিধে কোথায়?'

'তা নেই,' রানা বলল। 'বরং, আপনি হাঙরের প্রতি আগ্রহী হলে দারুণ হবে–অনেক কিছু শিখতে পারব আপনার কাছ থেকে। হাঙরের বেলায়ও কি সি লায়ন ব্যবহার করা যাবে?'

'পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সি লায়নগুলোকে ব্যবহার করে এতটাই সুফল পেয়েছি, সাগরের অন্য প্রাণীর প্রতিও আগ্রহ জন্মাচ্ছে। ওগুলোর ছবিও তুলতে চাই।'

'সি লায়নের বিশেষ সুবিধেটা কী?'

'আপনি তো জানেনই, গভীর পানিতে ডুব দিয়ে ছবি তোলার জন্য সাবমার্সিবল ব্যবহার করতে হয়,' কেরি বলল। 'মানুষের তৈরি ওই জিনিসটাকে সহজভাবে নিতে পারে না জলচর জীবেরা। কাছে গেলেই সতর্ক হয়ে যায়। আচার-আচরণ আর স্বাভাবিক থাকে না। কিন্তু সি লায়ন ওদেরই মত সামুদ্রিক প্রাণী হওয়াতে কাছে ঘেঁষতে দিতে আপত্তি করে না। সতর্কও হয় না। ওদের ক্রিয়াকর্মের স্বাভাবিক ছবি পাওয়া যায়। তা ছাড়া সাবমার্সিবলের খরচও অনেক। সি লায়ন পোষার খরচ সেই তুলনায় অনেক কম, প্রতিদিন কয়েক কেজি মাছ খাওয়ালেই হয়ে যায়।' একটু থেমে কেরি বলল, 'ও, ভাল কথা, একটা স্পটার প্লেন ভাড়া করে রেখে এসেছি, তিমি খোঁজার জন্যে। আজ বিকেল থেকেই কাজ শুরু করবে পাইলট।'

'প্লেন?' কুঁচকে গেল রানার ভুরু। 'তারমানে অনেক টাকা অনুদান পেয়েছেন? অত টাকা দিল কোন্ ইউনিভার্সিটি? আমি তো জানতাম, ওরা যা দেয়, তাতে বোট ভাড়ার টাকাও হয় না।'

'না, হয় না। যে ধরনের গবেষণা করি, ওদের টাকায় সত্যিই

করা সম্ভব হতো না। এজন্যে আমি আমার পূর্বপুরুষদের কাছে ঋণী। প্রচুর টাকা জমিয়ে রেখে গেছেন তাঁরা। এত বেশি যে, দু'হাতে খরচ করেও শেষ করতে পারব না। আমার দাদার-বাবার-বাবা ছিলেন তিমির তেল ব্যবসায়ী। তাঁর ছেলে যখন বুঝলেন, তিমির তেলের দিন শেষ, তখন অন্য তেলের ব্যবসা শুরু করলেন। পেট্রোলিয়াম। যে প্রাণীদের বাঁচাতে আমি টাকা খরচ করছি, সেটার ভিত রচনা করে গেছে ওদেরই পূর্বপুরুষরা, নিজেদের জীবন দিয়ে, ভাবলে কেমন লাগে না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

পাহাড় চূড়ার ছোট্ট বাড়িটাতে পৌঁছল দুজনে, ডিকম্প্রেশন চেম্বার যেটাতে রয়েছে। এখানেই কেরির থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা বেডরুম আছে, একটা রান্নাঘর। লিভিং রুমটাকে ডিকম্প্রেশন চেম্বার বানিয়ে ফেলাতে আরেকটা বেডরুমকে বসার ঘর হিসেবে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে।

'খিদে পায়নি?' রানা জিজ্ঞেস করল। 'খাবার আনতে বলব?'

'পরে,' কেরি বলল। 'আগে একটা জিনিস দেখাতে চাই আপনাকে।'

'কী?'

'আসুন, দেখাচ্ছি।' রানাকে বাড়ির পিছনে নিয়ে এল কেরি। হাত তুলে ঢালের নীচে দেখাল, 'ওই যে।'

খাঁড়ির কিনারে একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর রাখা জিনিসটা দেখে অবাক হলো রানা।

'অতিরিক্ত ভারি,' কেরি বলল, 'তুলতেও কষ্ট, নামাতেও কষ্ট। তাই ওখানেই রেখে দিতে বলেছি মিস্টার বিগকে।'

জিনিসটা একটা অ্যান্টি-শার্ক কেস। অ্যালয়-স্টিলের দণ্ড আর ইস্পাতের জাল দিয়ে তৈরি একটা খাঁচা। আট ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া ও সাত ফুট উঁচু। ছাতের কাছে খাঁচার ভিতরে দুটো ক্যামেরা পোর্ট—এক ঘনফুট সাইজের দুটো বাক্স। ওগুলোর

ভিতরে ভিডিও ক্যামেরা রেখে ছবি তোলা যায়। খাঁচার উপর দুই প্রান্তে ঝালাই করে লাগানো দুটো ফ্লোটেশন ট্যাংক। তামার ফিটিংস। ওগুলোর মধ্যে বাতাস থাকে। পানির নীচে খাঁচার ভারসাম্য বজায় রাখার কাজ করে ওগুলো। ছাতে ঢাকনা লাগানো ফোকর আছে, সেখান দিয়ে ঢুকতে হয়।

হাঙর গবেষকদের জন্য এই ধাতব খাঁচা খুব জরুরি একটা জিনিস। খোলা সাগরে নেমে হাঙর দেখার সময় এই খাঁচার ভিতরে থাকাটা অনেক বেশি নিরাপদ। খাঁচার শিক ভেঙে সহজে মানুষের উপর হামলা চালাতে পারে না হাঙর। বড় আকারের টাইগার শার্ক কিংবা গ্রেট হোয়াইটেরাও যাতে কামড় দিয়ে ভাঙতে না পারে, সে-রকম মজবুত করেই তৈরি করা হয় এই খাঁচা।

ভাল নতুন একটা খাঁচার দাম পঁচিশ হাজার ডলার থেকে এক লাখ ডলার পর্যন্ত। কেরি যেটা নিয়ে এসেছে, সেটা সত্যিই ভাল জিনিস, অনেক দামি।

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। 'কিন্তু, আপনি এত দাম দিয়ে...'

'কিনিনি,' রানার সঙ্গে নামতে নামতে জবাব দিল কেরি। 'এটা আমার এক্স-হাজব্যান্ডের জিনিস। ম্যাকো শার্ক ফটোগ্রাফার হতে চেয়েছিল। পারেনি। হাঙরের ছবি তুলতে কষ্ট করতে হয়, ধৈর্যও দরকার। হাঙর বাদ দিয়ে শেষে ভোঁদড়ের দিকে ঝুঁকল। কিন্তু ওখানেও ব্যর্থ। শেষে শুরু করল পরকীয়া প্রেম। এতে সফল না ব্যর্থ, তা ওই মেয়েরাই বলতে পারবে। তারপর আর কী, ছাড়াছাড়ি। ডিভোর্সের পর ও নিয়ে গেল আমাদের টয়োটা গাড়িটা; আমি নিলাম খাঁচাটা। পড়ে ছিল। আপনার কাজে লাগবে মনে করে নিয়ে এসেছি।'

'খুব ভাল করেছেন। অনেক সুবিধে হবে আমার মেয়েটার কাছে যেতে। দারুণ কাজের জিনিস। আমি নিজেই একটা কিনব ভাবছিলাম। আমি এখনই চেক লিখে দামটা...

'কীসের দাম? বিনা খরচায় আমার ছবি তোলার ব্যবস্থা করে দিলেন, কিছুই নিতে চাইলেন না...ধরে নিন, এটা আমার তরফ থেকে সামান্য উপহার।'

খুশি মনে ধন্যবাদ জানাল রানা। কিন্তু কেরি ধরল ওকে ক্যাঁক করে। 'মেয়ে মানে?'

'আরে!' অবাক হওয়ার ভান করল রানা। 'আপনার চার-চারটে থাকতে পারে, আমার একটাও থাকতে পারবে না?'

'কিন্তু কোনও মেয়ের কাছে যেতে খাঁচা লাগবে কেন আপনার? আমরা কি বাঘ-ভালুক?'

'না-না! আমার ওই প্রেমিকাটা প্রেগনেন্ট। খালি খাই খাই করে। ষোলো ফুট লম্বা, এক টন ওজন।'

হেসে উঠল কেরি। বুঝে ফেলেছে।

'হোয়াইট বুঝি?'

'ঠিক ধরেছেন। আমার মত কালা-আদমি না।'

আবার হাসল কেরি। বলল, 'খাঁচায় ঢুকে পানিতে নামলে ওকে দেখতে অনেক সুবিধে হবে আপনার। কী, হবে না?'

'হ্যাঁ, খুব সুবিধে হবে,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

খাঁচার কাছে এসে শিকগুলোতে হাত বুলিয়ে দেখল ও। ঝালাই করা জোড়াগুলো পরীক্ষা করল। 'হুঁ, খুবই ভাল জিনিস।'

'পছন্দ হয়েছে? যাক, শুনে ভাল লাগল। আজই বেরোনো যাবে। কী বলেন?'

'আজ?'

'অসুবিধে আছে?'

ঘড়ি দেখল রানা। নিজেকেই যেন বোঝাল, 'সাত-আট ঘণ্টা সময় আছে অবশ্য...'

'অনেক সময়। কতদূর যেতে হবে?'

'বেশি না। ঘণ্টাখানেকের পথ।'

একুশ

বোঝার ভারে বোটের খোলের ওয়াটার-লাইন পানিতে ডুবে গেছে। প্রচুর মালপত্র তোলা হয়েছে। খাবার পানি, ছবি তোলার ও ডাইভিঙের নানারকম যন্ত্রপাতি, কয়েল করা রাবার-মোড়া তারের মাথায় সেনসর ছাড়াও বোটের পিছন দিকে রাখা হয়েছে দুশো পাউন্ড ওজনের খাঁচাটা—কপিকলের সাহায্যে তুলেছে বিগ ও রানা। এ ছাড়া রয়েছে কেসে ভরা চারটে ভিডিও ক্যামেরা, একটা ভিডিও টেপ রেকর্ডার, আটটা স্কুবা ট্যাংক, সি লায়নগুলোর খাওয়ার জন্য পঞ্চাশ কেজি ছোট মাছ, তিনটে দশ গ্যালনের টিনে ভরা ছোট-ছোট টুকরো করা পচানো ম্যাকারেল ও টিউনা... এত দুর্গন্ধ, পানিতে ছড়িয়ে কয়েক মাইল দূর থেকেও হাঙরকে টেনে আনা যাবে; দুটো বিশ কেজি বাক্স ভর্তি বরফ দিয়ে রাখা বেইটফিশ—এখন খোলা ডেকে রোদে রেখে দেয়া হয়েছে গরম হওয়ার জন্য, ব্যাগে ভরা তিনটে ওয়েট সুট, মাস্ক ও ফ্লিপার, এক কুলার ভর্তি সোডা ও আন্টির বানিয়ে দেয়া একগাদা স্যান্ডউইচ।

বোটের সামনের দিকে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে সি লায়নগুলো। বার বার হাস্যকর ভঙ্গিতে মাথা ওঠাচ্ছে-নামাচ্ছে, উত্তেজনায় কাঁপছে লম্বা লম্বা গোঁফ। মাথা চাপড়ে আদর করে দিল কেরি।

ওগুলোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ভিকি। কেরিকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার আদর করাতে কোনও অসুবিধে হবে?'

'না,' কেরি বলল।

'কিন্তু এত অস্থির কেন?'

'বোট জিনিসটা ওদের পরিচিত। বোটে ওঠা মানেই কাজে যাওয়া বোঝে। আর সেটাই করতে চাইছে এখন, অপেক্ষা করতে রাজি নয়। বেশি উত্তেজনা সহ্য করতে পারে না ওরা। কাজ না দিয়ে বসিয়ে রাখলে বিরক্ত হয়।'

সাবধানে একটা লায়নের দিকে হাত বাড়াল ভিকি। কানের পিছনে চুলকানোর জন্য মাথা নামিয়ে দিল লায়নটা। ভিকি জিজ্ঞেস করল, 'এটার নাম কী?'

'রিটি।'

'আমাকে বোধহয় অপছন্দ করে না।'

কেরি হাসল। 'না, করে না।'

রিটি আদর নিচ্ছে দেখে কাছ ঘেঁষে এল আরেকটা। তারও আদর চাই।

ফ্লাইং ব্রিজে রয়েছে বিগ। ইঞ্জিন রিভার্স দিয়ে পিছাতে লাগল বোট। লগি হাতে পিছনে দাঁড়ানো রানা। বোটের গলুই পাথরে ঘষা লাগার উপক্রম হলেই ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে এল বোট। খোলা সাগরের দিকে নাক ঘুরিয়ে সামনে এগোল বিগ।

পুলপিট থেকে এসে কেবিনে ঢুকল রানা। একটু পরেই বেরিয়ে এসে কেরিকে জানাল, 'আপনার স্পটার প্লেনের পাইলট রেডিওতে খবর পাঠিয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আকাশে উঠে তিমি খোঁজা শুরু করবে। চ্যানেল টোয়েন্টি সেভেনে যোগাযোগ করতে বলে দিলাম।' ফ্লাইং ব্রিজের দিকে মুখ তুলে তাকাল ও। 'বিগ, সিক্সটিন চ্যানেলে পুলিশ একটা বুলেটিন পাঠিয়েছে। একটা ছেলের খোঁজ পেলে জানাতে বলেছে।'

'কী নাম?' বিগ জিজ্ঞেস করল।

'পিটার সোয়ানসন, জর্জ অ্যাংলারের বোটের মেইট। বোট থেকে নাকি পড়ে গেছে ছেলেটা। অ্যাংলার বলেছে, অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে, পায়নি।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে সাগরের দিকে তাকিয়ে রইল রানা।

ব্লক আইল্যান্ডের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে এগোনোর সময় ভিকিকে কয়েকটা মাছ দিল কেরি, লায়নগুলোকে খাওয়ানোর জন্য। তারপর রানার পাশে এসে দাঁড়াল।

দ্বীপ থেকে চোখা হয়ে বেরোনো একটা সৈকতের পাশ ঘুরে এগোলো বোট। সৈকতে বিশ-পঁচিশজন মানুষ দেখতে পেল। বাতাসে ফোলানো রবারের ওয়াটার উইং পরা বাচ্চারা খেলছে ঢেউয়ের মধ্যে। সার্ফ লাইনের অন্য পাশে বিশ গজ দূরে সাঁতার কাটছে মাথায় বেদিং ক্যাপ পরা দুজন বয়স্ক লোক। একটা টিনএজার ছেলে অলস ভঙ্গিতে চিত হয়ে শুয়ে আছে সার্ফবোর্ডের উপর।

সৈকত থেকে একশো গজ দূরে কপিকলের সাহায্যে পানি থেকে লবস্টার-পট তুলছে একজন চিংড়ি শিকারী। ইঞ্জিনের শব্দে ফিরে তাকাল। ওর দিকে হাত নাড়ল রানা। লোকটাও হাত নেড়ে জবাব দিতে গিয়ে আচমকা থেমে গেল। রানাকে চিনতে পেরে ঘুসি দেখাল।

'বাহ্, দারুণ জবাব তো!' কেরি বলল।

হাসল রানা। 'ওর নাম জন্টি গ্র্যাহাম। আমি দ্বীপটা লিজ নেয়াতে হাতে গোনা যে দু'চারজন আমার শত্রু হয়েছে, ও তাদের একজন।'

'শত্রুতা কেন?'

'আমি অসপ্রি আইল্যান্ড লিজ নেয়ার আগে দ্বীপটাকে ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করত জন্টি। চিংড়ি রাখার স্টোর বানিয়েছিল। জঞ্জাল ফেলারও জায়গা। দ্বীপে ঢোকার চ্যানেলে প্রচুর চিংড়ি পড়ে। ওখানে ফাঁদ পাতত। বোটের প্রপেলারে ফাঁদের দড়ি জড়িয়ে গিয়ে অসুবিধে করে। প্রথমে কিছু বলিনি। ভে ছি, আপনিই চলে যাবে। কিন্তু গেল না। গতবছর বেড়াতে এসে

দেখি, ফাঁদের সংখ্যা ও জঞ্জাল আরও বেড়েছে, আমার উপস্থিতি কেয়ার করছে না–বরং মস্তানির ভঙ্গি নিয়েছে। ওকে এই দ্বীপে বর্জ্য ফেলতে আর ফাঁদ পাততে নিষেধ করে দিলাম। শুনল না। কোস্ট গার্ডকে জানালাম। ওরা বলল এত সাধারণ ব্যাপারে ওদের মাথা ঘামানোর সময় নেই, আমাদেরই মিটমাট করে নিতে হবে। শেষে তাই করতে হলো। একদিন সমস্ত ফাঁদ তুলে, চিংড়িগুলোকে ছেড়ে দিয়ে, বয়াসহ ফাঁদগুলো এখানে ফেলে রেখে গেলাম। খুঁজে বের করতে পুরো দুই হপ্তা লেগেছিল ওর।

'ও বুঝেছে আমিই করেছি। আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল শুরু করল। আমি কিছু বলার আগেই হুমকি দিল বিগ, বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঘাড় মটকে দেবে। গালাগাল বন্ধ করল জন্টি। চ্যানেলে আর ফাঁদ পাততে গেল না–আবার যদি তুলে ফেলে দিই। তবে আসল কারণ হলো, যখন দেখল এখানেও ভাল চিংড়ি পড়ে, অকারণে আর ঝামেলা করতে চায়নি।'

'এখন তাহলে রাগ দেখাচ্ছে কেন?'

'আক্রোশে। আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারেনি, তাই।'

ফিরে তাকাল রানা। দূরে ব্লক আইল্যান্ডকে দেখে এখন মনে হচ্ছে, পানিতে পিঠ ভাসিয়ে রাখা একটা ধূসর সামুদ্রিক প্রাণী।

কিছুদূর গিয়ে থ্রটল টেনে গতি কমাল ব্রিগ। ইঞ্জিন নিউট্রাল করল।

কেরিকে বলল রানা, 'এসে গেছি।'

'এখানে?' চারপাশে তাকাচ্ছে কেরি। 'কই, কিছুই তো দেখছি না। একটা পাখি নেই, একটা মাছ নেই, কিচ্ছু না; শুধু শূন্য সাগর।'

'আপনার তাই মনে হচ্ছে,' হাসল রানা। 'কিন্তু আমি জানি এখানেই আছে ওরা।'

'কারা?'

'হাঙর!'

বাইশ

বোটটাকে দ্রুত পুবদিকে চলে যেতে দেখল জন্টি গ্র্যাহাম। সাদা খোলটাকে ধীরে ধীরে যেন গিলে নিল সাগরের ঢেউ। এক সময় আর কিছুই দেখা গেল না, মাঝে মাঝে ইস্পাতের ফ্লাইং ব্রিজে রোদের ঝিলিক ছাড়া।

মনে মনে গালি দিল জন্টি। ইস্, যদি ডুবে যেত বোটটা! মনে মনে বলল, ঈশ্বর, ডুবিয়ে দাও! পাথরের খোঁচা লাগিয়ে তলা ফুটো করে দাও! না না, আগুন লাগিয়ে দাও! তাহলে বেশি কষ্ট পেয়ে মরবে হারামজাদা বিদেশীটা! সঙ্গে বিগটাও মরুক! ওটাও কম পাজি না! তবে ওর ওই ছেলেটা সত্যিই ভাল, ওটাকে বাঁচিয়ে রেখো, প্রভু!

ফাঁদগুলো যখন তুলে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল, নিজেই দ্বীপে গিয়ে আগুন লাগানোর কথা ভেবেছিল ও। কিন্তু ওই কিং কং-টার কথা ভেবে সাহস পায়নি। এক হাতে গলা টিপে ধরলেই...নিজে কিছু করতে না পেরে এখন শুধু অভিশাপ দেয় জন্টি। ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানায়।

একটা বয়ার দিকে এগোল ও। বয়ায় লম্বা দড়ি বেঁধে দড়ির অন্য মাথায় কাঠ ও তার দিয়ে তৈরি খাঁচার মত ফাঁদগুলো পানিতে ফেলে রাখে। ফাঁদে ঢোকার পথ আছে। সেই পথ দিয়ে ঢোকা গেলেও বেরোনো যায় না। ফাঁদের ভিতর টোপ থাকে। খাবারের লোভে ভিতরে ঢোকে চিংড়ি, আটকা পড়ে।

বোট হুক দিয়ে বয়াটা বোটে তুলে আনল জন্টি। দড়িটা

পরিয়ে দিল কপিকলের চাকায়। বয়া থেকে দড়ি খুলে একটা ড্রামে পেঁচাল। ইঞ্জিন চালু করে দিতেই ঘুরতে শুরু করল ড্রাম। খাঁচাটা তুলে আনছে। বোটের কিনার দিয়ে ঝুঁকে তাকিয়ে রইল জন্টি। ফাঁদটা পানির ওপর উঠে আসতেই ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। হাত দিয়ে বোটের কিনার পার করিয়ে এনে ডেকে রাখল খাঁচাটা। ভিতরে দুটো চিংড়ি শুঁড় নাড়ছে। একটা চিংড়ি দুই পাউন্ডের। উপযুক্ত শিকার। দরজা খুলে শক্ত দাঁড়া এড়িয়ে মাথা ধরে চিংড়িটাকে বের করে আনল ও। ডেকে রাখা বাক্সে ছুঁড়ে ফেলল।

অন্য চিংড়িটা বেশি ছোট। চিংড়ি শিকারীদের ভাষায় 'শর্ট', অর্থাৎ কিশোর চিংড়ি। এগুলো ধরা পড়লে বড় হওয়ার জন্য সাগরে ফেলে দেয়াই নিয়ম।

ফেলবে কিনা ভাবল একবার। পরক্ষণে মনে হলো, বড় হয়ে আবার ওর ফাঁদেই ধরা পড়বে ওটা, তার নিশ্চয়তা কী? অন্য কারও ফাঁদে পড়তে পারে। সামুদ্রিক প্রাণীতে খেয়ে ফেলতে পারে। অত ভবিষ্যতের আশায় থেকে লাভ নেই। যা পাওয়া গেছে, সেটারই সদ্ব্যবহার করা ভাল। চিংড়িটাকে টান দিয়ে বের করে এনে এক মোচড়ে ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে পানিতে ছুঁড়ে ফেলল। মগজটা তখনও মরেনি। শুঁড়, পা, দাঁড়া নাড়তে নাড়তে ডুবে গেল মাথাটা।

ধড়টা কাটিং বোর্ডে ফেলে রাখল ও। পরে খোসা ছাড়িয়ে লবস্টার স্যালাড বানানোর জন্য বিক্রি করতে পারবে। নিজের বুদ্ধিকে বাহবা দিল। ছেড়ে না দিয়ে খুব ভাল কাজ করেছে।

ফাঁদে নতুন টোপ ভরল ও। দরজা লাগাল। দড়ি ধরে রেখে নৌকার কিনার থেকে পানিতে ঠেলে ফেলল ফাঁদটা। আস্তে আস্তে ছাডতে লাগল দড়ি, যতক্ষণ না ঢিল হয়ে এলো। তলায় পৌঁছেছে ফাঁদ। বয়াটা তুলে নিয়ে পানিতে ফেলল। ইঞ্জিন চালুই আছে। গিয়ার দিয়ে বোট নিয়ে এগোল পরের ফাঁদটার দিকে।

দশটা ফাঁদ তুলল জন্টি। আরও দশটা বাকি। ইতিমধ্যেই

আঠারোটা চিংড়ি জমা হয়েছে বাক্সে। বাকি ফাঁদগুলো তুললে কম করেও তিরিশটা তো হবেই, বেশিও হতে পারে। এক দিনের জন্যে যথেষ্ট।

পরের বয়াটার কাছে পৌঁছল জন্টি। নিউট্রাল করল ইঞ্জিন। বোটের কিনার দিয়ে উঁকি দিয়ে নীচে তাকাল। বয়াটা তুলে এনে বোটের ডেকে ফেলল। দড়িটা কপিকলের সাহায্যে টেনে তুলতে শুরু করল।

তীরের দিক থেকে একটা চিৎকার কানে আসতে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। সোনালি চুলওয়ালা একটা টিনেজ মেয়েকে তাড়া করেছে তার বয়ফ্রেন্ড। বালির ওপর দিয়ে ছুটছে দুজনে। বিকিনি না কী যেন বলে, ওই জিনিস পরেছে মেয়েটা। গায়ের বেশির ভাগ খোলা। এর চেয়ে ন্যাংটো হয়ে যা না!—মনে মনে বলল জন্টি। মেয়েটার প্রায় নগ্ন দেহটাকে চোখ দিয়ে যেন গিলতে লাগল।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে লাথি মেরে বালি ছিটাতে লাগল ছেলেটাকে লক্ষ্য করে। হেসে, চিৎকার করে মেয়েটাকে কী যেন বলতে বলতে দুই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল ছেলেটা। কিন্তু ধরা দিল না মেয়েটা। সাঁই করে পাশ কাটিয়ে সরে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিল পানিতে।

ঢেউয়ের সীমানার বাইরে চলে যাচ্ছে মেয়েটা। ছেলেটাকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে কথা বলছে। পৌরুষে লাগল ছেলেটার, সে-ও ঝাঁপ দিল পানিতে। সাঁতরে চলে গেল মেয়েটার কাছে। কয়েক মুহূর্ত দাপাদাপি করে চিত হয়ে থেকে জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিল দুজন। ঢেউ ওদের ঠেলে নিয়ে চলল তীরের দিকে।

ওদের দিক থেকে চোখ সরায়নি জন্টি। ফাঁদটা উঠে এসে নৌকার খোলে বাড়ি খেতে যেন হুঁশ ফিরল। দড়িটা যতদূর সম্ভব নৌকার কিনার থেকে সরিয়ে, টেনে খোলের নীচ থেকে বের করে আনল ফাঁদটা। পানির উপর তুলল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ফাঁদটার দিকে। ফাঁদের একটা

অংশ গায়েব। ছেঁড়া তারের মাথায় আটকে থেকে ঝুলছে ভাঙা কাঠি।

ভিতরে তাকাল ও। টোপ নেই, চিংড়ি নেই, কিছুই নেই। চিংড়ির দুটো ছেঁড়া পা পড়ে আছে কেবল ভাঙা ফাঁদের ভিতর।

কার কাজ? ভাবছে জন্টি। অন্য কোন চিংড়ি শিকারী করেনি, তাহলে সহজ কাজটাই করত: ফাঁদ তুলে, দরজা খুলে চিংড়িগুলো বের করে নিয়ে আবার ফাঁদটা পানিতে ছুঁড়ে ফেলত। হাঙর? হতে পারে। কিন্তু হাঙরকে এভাবে ফাঁদ ভেঙে চিংড়ি নিয়ে যেতে আজ পর্যন্ত কখনও দেখেনি ও।

চিন্তিত ভঙ্গিতে দড়ি খুলে নিয়ে ভাঙা ফাঁদটা পানিতে ফেলে দিল জন্টি। দড়ির মাথাটা হাতে নিয়ে নৌকার পিছনে হেঁটে গেল নতুন আরেকটা ফাঁদে বাঁধার জন্য। সঙ্গে সব সময় চারটে বাড়তি ফাঁদ রাখে ও। দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে: ফাঁদ চুরি হয়, প্রপেলারে লেগে দড়ি কেটে গিয়ে হারিয়ে যায়, ঝড়ের সময় বয়া ভেসে চলে যায়, সঙ্গে ফাঁদটাকেও নিয়ে যায়।

নতুন ফাঁদে দড়ি বেঁধে, ভিতরে টোপ রেখে, পানিতে ঠেলে ফেলল জন্টি। তারপর গেল আরেকটা ফাঁদের কাছে। তুলে দেখে এটারও আগেরটার মত একই অবস্থা। কে যেন টেনে দরজাটা ছিঁড়ে খুলে ফেলেছে। ভিতরে চিংড়ি নেই।

হাঙরের কাজ আর ভাবতে পারছে না ও। হাঙর হলে ফাঁদটা কামড়ে দলামোচড়া করত, কিংবা কেটে ফেলে ভিতরের চিংড়িগুলো নিয়ে চলে যেত। ফাঁদটা আস্ত রেখে শুধু দরজা খুলে চিংড়ি চুরি করার সাধ্য নেই হাঙরের।

হাঙর না হলে কীসে করল?

অক্টোপাস?

উঁহুঁ। শুঁড় দিয়ে আর যা-ই করুক, চিংড়ির খাঁচার দরজা খুলতে পারবে না। জায়ান্ট ঈল, বড় স্কুইড, কেউই পারবে না।

খাঁচার দরজা খোলার জন্য মানুষের আঙুল দরকার।

মানুষ?

কোন্ মানুষ?

মাসুদ রানা! কিংবা ওর চামচাটা, বিগ ওয়াগনার!

ঠিক, এটাই একমাত্র জবাব। এজন্যই হাত নেড়েছে। ওকে ব্যঙ্গ করেছে। অসপ্রি আইল্যান্ডের চ্যানেল থেকে সরিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, ওকে এলাকা ছাড়া করতে চায়।

'ওকে! অনেক সহ্য করেছি, মিস্টার ভিনদেশী, আর না,' মনে মনে বলল জন্টি। 'আমার আর কোন ক্ষতি করার আগেই আমি তোমাকে দ্বীপছাড়া করব। তোমার ওই দ্বীপে আমি আগুন দেব। গায়ে পড়ে লাগতে এসেছ তো? ঠিক আছে। নিলাম আমি তোমার চ্যালেঞ্জ!'

প্রতিশোধ নেয়ার নানারকম ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করতে করতে ফাঁদ বদল করে পানিতে ফেলল ও। ইঞ্জিনের থ্রটল বাড়িয়ে দিয়ে অকারণে গোঁ-গোঁ শব্দ করাল, ঝাল ঝাড়ল যেন ইঞ্জিনটার ওপর। এগিয়ে চলল পরের ফাঁদটার দিকে। প্রচণ্ড রাগ যেন আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভার মত বয়ে যাচ্ছে ওর ধমনীতে।

পরের বয়াটার কাছে পৌঁছল ও। রেগে না থাকলে নিশ্চয় চোখে পড়ত বয়াটা ওঠানামা করছে, যেন নীচ থেকে কোনও কিছু দড়ি ধরে টানছে।

হুক দিয়ে টেনে বয়াটা তুলে এনে ডেকে ফেলল জন্টি। দড়িটা ড্রামে পেঁচিয়ে ইঞ্জিন চালু করল। ঘুরতে শুরু করল ড্রাম। দড়িতে টান পড়ল। একপাশে কাত হয়ে যাচ্ছে বোট।

ভুরু কোঁচকাল জন্টি। তলায় কোন কিছুতে আটকে গেল নাকি ফাঁদটা?

না, আটকায়নি তো! উঠে আসছে। তবে মনে হচ্ছে ভার রয়েছে দড়ির মাথায়। শ্যাওলার দঙ্গলে পেঁচিয়ে গেছে হয়তো, ওর মনে হলো।

ছয় ফুট লম্বা একটা গ্যাফ হুক তুলে বোটের কিনার দিয়ে

ঝুঁকে তাকাল ও। আগাছার দঙ্গল উঠে এলে হুক দিয়ে সরিয়ে তারপর ফাঁদটা তুলবে।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। আচমকা ঝাঁকি দিয়ে সোজা হয়ে গেল নৌকাটা। ঢিল হয়ে গেল দড়ি। দ্রুত উঠে আসতে লাগল।

আগাছা বোধহয় খসে পড়ে গেছে। হয়তো...

ফাঁদটা নজরে এল। সবুজ ধোঁয়াটে পানিতে কালো একটা ছায়া।

ওটার পাশে আরও কিছু রয়েছে। শ্যাওলা নয়।

'জিযাস ক্রিস্ট!' চিৎকার করে উঠল জন্টি। 'একটা লাশ!'

না না, লাশও তো না! সাদা চামড়া। হাঁ করা মুখ। সাদা চোখ। হাতদুটো কুচকুচে কালো। আঙুলের মাথায় বড় বড় বাঁকানো নখ। ওপরে এসেই থাবা মেরে গ্যাফ হুকটা আঁকড়ে ধরল।

চেঁচিয়ে উঠল জন্টি। হুকটা টেনে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু হ্যাঁচকা টানে ওটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নিল সাদা দানবটা। পিছনে উল্টে পড়ল ও। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে চলেছে। কাঁধের ধাক্কায় সামনে চলে গেল থ্রটল। শরীরটা চেপে রইল থ্রটলের উপর।

প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল ইঞ্জিন। সর্বশক্তি দিয়ে প্রপেলার পানিতে কামড় বসানোয় নিচু হয়ে গেল বোটের পিছনের অংশ। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বোট। উইঞ্চ থেকে তীব্র গতিতে সরে যাচ্ছে দড়িটা। নৌকার কিনার টপকে উড়ে গিয়ে পড়ল পানিতে।

নড়ছে না জন্টি। একই ভঙ্গিতে পড়ে থেকে চিৎকার করছে। নিজের চিৎকারেই সম্বিত ফিরল একসময়। থ্রটল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হুইল ধরল।

ফুল স্পিডে রাখল ইঞ্জিন। বার বার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে দেখছে, বোটের পিছন দিয়ে উঠে ওকে ধরতে

আসছে কি না দানবটা।

পাঁচশো গজমত এগিয়ে, থ্রটল টেনে কিছুটা গতি কমাল। ইঞ্জিনের 'রেভ' রাখল পনেরোশোতে, যাতে যে কোন মুহূর্তে বোটের গতি বারো থেকে পনেরো নটে তুলে দিতে পারে আবার। মনে হচ্ছে যা দেখেছে ঠিক দেখেনি। দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে।

আরেকটু হলেই ধরে ফেলেছিল ওকে দানবটা।

মেরুদণ্ডে বয়ে গেল ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত।

বমি পাচ্ছে।

চিংড়ি তুলতে যেতে আর সাহস হলো না। বাড়ি ফিরে চলল।

পানি থেকে সৈকতে উঠে বসেছে টিনেজ ছেলেমেয়ে দুটো। এগযোস্টের মুখ দিয়ে ধোঁয়ার মেঘ উড়িয়ে গর্জন করে ছুটে যেতে দেখল বোটটাকে।

'কী হলো ওর?' মেয়েটার প্রশ্ন।

'প্রপেলার খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়, শিয়ার পিন ঢিল হয়ে গেছে, ভেঙে যাবার আগেই ডকে ফিরতে চাইছে,' ছেলেটা জবাব দিল। 'হয় ওরকম। আমার বোটেরও একবার পিন ঢিলা হয়েছিল।' সৈকতের এমাথা-ওমাথায় চোখ বোলাল ও। 'আরে, আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।'

'তো?'

'না, কিছু না।'

'কেউ নেই বলে কি নামতে ভয় পাচ্ছ?'

'না, তা কেন...'

'তাহলে এসো। জিরানো শেষ। আবার সাঁতার!'

বালি থেকে উঠে পানির দিকে ছুটে গেল মেয়েটা। হাঁটু পানিতে এসে ডাইভ দিয়ে পড়ল।

সমুদ্রতলে বালির উপর উদ্দেশ্যহীনভাবে সাঁতরে বেড়াচ্ছে

দানবটা। শিকারের খোঁজে।

দৃষ্টিসীমার বাইরে, সামনে কোথাও নড়াচড়া টের পেল ওটার রেডার-অনুভূতি। শব্দ অনুসরণ করে দ্রুত এগোল। কাঠ ও তার দিয়ে তৈরি আরেকটা খাঁচার কাছে এসে পৌঁছল। ছোট ছোট দুটো জ্যান্ত প্রাণী রয়েছে ভিতরে। খাঁচা ভেঙে ভিতরের প্রাণী দুটোকে বের করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল। আগেও অনেকগুলো খেয়েছে। কিন্তু এত ছোট্ট খাবারে পেটের কোণও ভরে না ওটার।

আরও খাবারের খোঁজে বালির ঢাল বেয়ে গভীর পানির দিকে এগিয়ে চলল ওটা। হঠাৎ নড়াচড়া টের পেল ওপরে। থেমে গেল ওটা। ফুলকোর স্পন্দন থামিয়ে দিল। খুলির দুই পাশে কৃত্রিমভাবে বসানো সংবেদনশীল গ্রাহকযন্ত্রের সাহায্যে পানির চাপমাত্রার পরিবর্তন টের পেল।

ঠিক কোনখানে সৃষ্টি হয়েছে চাপটা, বুঝতে পারেনি। তবে দিক নির্দেশনা পাচ্ছে। ভয়ঙ্কর মুখটা হাঁ করে, ত্রিকোণ ধারাল দাঁতের সারি বের করে, মারাত্মক নখওয়ালা থাবা মেলে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ঠল শিকারের দিকে।

মেয়েটা আগে আগে সাঁতরাচ্ছে। দ্রুত সাঁতরে ওকে ধরে ফেলল ছেলেটা।

'পানির গভীরতা কত এখানে?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'কী করে বলি? পঞ্চাশ ফুট। কিংবা আরও বেশি।'

'নীচে তাকিয়ে তল দেখা না গেলে কেমন ভয় ভয় লাগে।'

'কীসের ভয়? সাগরের দানো উঠে এসে তোমাকে খেয়ে ফেলবে?' হেসে উঠল ছেলেটা।

'ইয়ার্কি মেরো না তো। চলো, যাই।'

'তারমানে সাঁতারের শখ মিটেছে।' তীরের দিকে দু'তিন গজ এগিয়েই আচমকা বলে উঠল ছেলেটা, 'আরে!'

'কী?'

'নীচে কী যেন আছে। টের পাচ্ছ না?'

'থাকুক,' মেয়েটা বলল। 'ফালতু কথা বলে ভয় দেখাতে পারবে না আমাকে।'

'না, সত্যি বলছি। এইমাত্র পানির নীচে কিছু নড়ছিল মনে হয়েছে। তবে এখন আর নেই।'

'বললাম তো, ভয় দেখাতে পারবে না।'

'না, সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো...'

ছেলেটার পাশ কাটাল মেয়েটা। দ্রুত সাঁতরে চলেছে তীরের দিকে। ভয় পায়নি বললেও আসলে ভয় পেয়েছে।

অনেক ওপরে দুটো জ্যান্ত প্রাণী দেখল দানবটা। বড় আকারের দুর্বল সেই প্রাণীগুলো, যেগুলো কোনরকম বাধা দিতে পারে না, মারা খুবই সহজ, পেটও ভরে।

দ্রুত ওপরে উঠতে শুরু করল ওটা।

হঠাৎ কীসে যেন ধাক্কা মারল। পাক খেয়ে ঘুরে গিয়ে তাকাল, কীসে মেরেছে দেখার জন্য।

মস্ত একটা প্রাণীকে দেখতে পেল দানবটা। নিজের চেয়ে অনেক বড়। চারপাশের পানির রঙের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে দেহের রঙ। পিঠে আর দেহের দুই পাশে বড় বড় পাখনা আছে। বিশাল লেজ নেড়ে নেড়ে চলছে। ধীরে ধীরে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে দানবটাকে ঘিরে। বিশাল মুখটা হাঁ করে রেখেছে।

প্রাণীটাকে খুব পরিচিত লাগছে দানবটার। ধোঁয়াটে অতীতের অন্ধকার থেকে যেন একটা বিশেষ শব্দ অস্পষ্টভাবে উদয় হলো মগজে–'হাঙর'। হাঙর মানেই বিপজ্জনক প্রাণী, পুরনো অস্পষ্ট স্মৃতি জানিয়ে দিল দানবটাকে। প্রাণীটার দিকে ঘুরল দানবটা। আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত।

লেজ নাড়া দ্রুত হলো হাঙরটার। মুখ হাঁ করে আক্রমণ

করতে এগোল।

ঝট করে নিচু হয়ে গেল দানবটা। ওপর দিয়ে চলে গেল হাঙর। পরক্ষণে ঘুরে গিয়ে আবার ছুটে এল। মারাত্মক নখ বাড়িয়ে নীচ থেকে হাঙরের পেটে থাবা মারল দানবটা। শক্ত মাংসে বসে গেল নখগুলো। গভীর আঁচড় কাটল।

ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল হাঙরটা। তবে আর ঘুরল না। আক্রমণ করতে এল না। মস্ত লেজের আন্দোলনে পানিতে প্রবল আলোড়ন তুলে দ্রুত সাঁতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সবজে-ধূসর গভীরতায়।

তলার বালিতে এসে নামল দানবটা। লড়াইয়ের ধকলটা সামলে নিয়ে ওপরে তাকাল। দুর্বল প্রাণী দুটোকে খুঁজছে চোখ।

নেই ও দুটো। চলে গেছে। পানিতে প্রাণীগুলোর নড়াচড়ার কোন লক্ষণ টের পাচ্ছে না আর।

শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখানে ঘুর ঘুর করে আর লাভ নেই। এবার গভীর পানির দিকে রওনা হলো দানবটা, নতুন শিকারের খোঁজে।

তোয়ালে দিয়ে ভেজা চুল আর গা মুছছে মেয়েটা। মোছা শেষ করে ভেজা পোশাক খুলে ফেলে দিয়ে শুকনো কাপড় পরল। ছেলেটা একটু দূরে ভেজা বালিতে বসে গায়ে লেগে থাকা পানি রোদে শুকাচ্ছে। জানতেই পারল না, মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে ওরা দুজন।

তেইশ

দুশো ফুট পানিতে নোঙর ফেলেছে বিগের বোট। খাঁচাটা মাথা তুলে ভাসছে বিশ ফুট পিছনে, দড়িতে বাঁধা।

এক ঘণ্টা ধরে কাটা পচা মাছ পানিতে ফেলছে রানা ও বিগ। বাতাস রক্ত আর মাছের তেলের গন্ধে ভারি হয়ে আছে। বোটের পিছনে পানিতে মাছের তেলের হালকা আস্তরণ ছড়িয়ে পড়েছে। শান্ত পানিতে চকচকে ওই তেলে রামধনুর রঙ দেখা যাচ্ছে।

ডেকে ফেলে রাখা হয়েছে হার্নেস ও রেগুলেটর লাগানো দুটো স্কুবা ট্যাংক। পাশে রাখা ফ্লিপার, মাস্ক। ওয়েট সুট পরছে রানা ও কেরি। হাত আর কাঁধে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কেরির পিঠ রোদে পুড়ে ফ্যাকাসে গোলাপি হয়ে গেছে।

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে ঘুমাচ্ছে লায়নগুলো। একটা বালতিতে করে ড্রামের পরিষ্কার পানি নিয়ে এসে ওগুলোর গায়ে ঢেলে দিল কেরি। পানি ঢালার কারণ ব্যাখ্যা করল, 'এই গরম আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবে না ওরা। শীঘ্রি পানিতে নামাতে হবে।'

'আবহাওয়ার খবরে বলেছে একশো ডিগ্রি,' মুখের ঘাম মুছল রানা। 'মনে হচ্ছে আরও বাড়বে...'

'হাঙর! হাঙর!' ফ্লাইং ব্রিজ থেকে শোনা গেল ভিকির চিৎকার।

বোটের পিছন দিকে তাকাল সবাই। পঞ্চাশ গজ দূরে সাগরের পানিতে পিঠের একটা ত্রিকোণ পাখনা দেখা গেল। কয়েক ফুট দূরে পাখনাটাকে অনুসরণ করে আসছে যেন কাস্তের

মত বাঁকা লেজ। এপাশ-ওপাশ নড়ছে।

'ব্লু-শার্ক,' রানা বলল।

'এত দূর থেকে কী করে বুঝলেন?' কেরির প্রশ্ন।

'পিঠের পাখনাটা খাটো, মোটা। কালচে নীল রঙ।'

'হাঙরটা কত বড়?'

'পিঠের পাখনা ও লেজের মাঝখানের দূরত্ব দেখে মনে হচ্ছে দশ কি এগারো ফুট।' ভিকির দিকে তাকাল রানা। 'ভালমত নজর রাখো। আরও আসবে।'

'ওই যে!' হাত তুলে আবার চেঁচিয়ে উঠল ভিকি। 'প্রথমটার পিছনে আরেকটা...না না, দুটো!'

ভিকির কণ্ঠের উত্তেজনা টের পেয়েই যেন নড়েচড়ে উঠল সি লায়নগুলো। ফ্লিপারে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকছে।

'চলো মেয়েরা, রেডি হও,' কেরি বলল। কাটা মাছের বালতিতে হাতা ডোবাল ও।

ওয়েট সুট পরা শেষ করেছে আগেই, ট্যাংক আর মাস্ক তুলে নিল রানা ও কেরি। ছ'টা হাঙর হাজির হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, বোটের পিছনে ছড়িয়ে পড়া তেলের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে, খাঁচাটার কাছাকাছি।

'একটা দুটো করে মাছ ছুঁড়ে দিতে থাকুন,' বিগকে বলল রানা। 'আগ্রহ ধরে রাখুন ওদের। যেন চলে না যায়।' একটা বাক্স খুলল ও। সাদা প্লাস্টিকে তৈরি দুটো জিনিস বের করল। ইঞ্চি দশেক লম্বা দুই টুকরো শক্ত প্লাস্টিক একটার ওপর আরেকটা রেখে দুদিকের মাথা সেলাই করে দেয়া হয়েছে। এক টুকরো করে নাইলনের শক্ত সরু দড়ি আটকে দেয়া এক প্রান্তে।

'কী ওটা?' কেরি জিজ্ঞেস করল। 'প্লাস্টিক স্যান্ডউইচ?'

'হ্যাঁ,' হাসল রানা।

'সত্যি কাজ হয় এটা দিয়ে? বাইট প্রেশার মাপা যায়?'

'যায়। সাধারণ জিনিস, কিন্তু খুবই কাজের। সেনসিটাইজড ল্যাবরেটরি প্লাস্টিক এগুলো। আর এই যে ভিতরে দেখুন,' প্লাস্টিক ফাঁক করে ভিতরে দেখাল ও, 'এক টুকরো করে পচানো ম্যাকারেলের মাংস রয়েছে। বিগ ওপরে বসে হাঙরগুলোকে খাওয়ানো শুরু করলে খাঁচার ক্যামেরা পোর্ট দিয়ে এই স্যান্ডউইচ বাইরে বের করে দেব। ম্যাকারেলের গন্ধ পেলে প্লাস্টিকের গায়ে কামড় বসাবেই হাঙর। কিছুক্ষণ ইচ্ছেমত কামড়াতে দেব এটা, তারপর সরিয়ে নেব। প্লাস্টিকের টুকরোটা পরে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে মাইক্রোমিটারে পরীক্ষা করে দেখব দাঁতের দাগগুলো কতখানি গভীর। সবশেষে এক সেট কামড়ের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব কোন্‌টার সঙ্গে মেলে, তাতে বুঝে যাব কতটা চাপে কামড় দিয়েছে।'

'দারুণ!' মুগ্ধ হলো কেরি। 'বানাতে কত খরচ হয়েছে? তিন ডলার? নামমাত্র খরচে জটিল একটা পরীক্ষা...'

'যত কম ভাবছেন তত কম না। এগুলোতে বানাতে লাগে দশ ডলারের মত। এর সঙ্গে খাঁচার ভাড়া, বোট ভাড়া, তেল আর শ্রম দেয়ার খরচ যোগ করলে প্রায় এক লাখ।' হাঙরগুলোর দিকে তাকাল রানা। খাঁচা ঘিরে চক্কর দিচ্ছে ওগুলো। কেরিকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন ছাড়বেন লায়নগুলোকে?'

'হ্যাঁ,' হাসল কেরি। 'দেখবেন, হাঙরগুলোকে কীভাবে বোকা বানায়।' ট্র্যান্‌সামের ভিতরের দরজা খুলে সুইমস্টেপে এসে দাঁড়াল ও। হাতে এক বালতি মাছ। নাম ধরে ধরে লায়নগুলোকে ডাকল। হেলেদুলে এক এক করে কেরির কাছে এসে থামছে ওগুলো, হাত থেকে একটা করে মাছ মুখে নিয়ে অপেক্ষা করছে। পানির দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিচ্ছে কেরি। ইঙ্গিত বুঝে সুইমস্টেপে লাফিয়ে নেমে পানিতে ঝাঁপ দিচ্ছে লায়নগুলো। হাঙরের পিছনে ছোটাছুটি শুরু করেছে। খোলা নীল সাগরে ডুব-

সাঁতারের খেলা খেলছে যেন।

'রেডি?' কেরি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রানা।

ভিডিও ক্যামেরা আনতে গেল কেরি।

পানির দিকে তাকিয়ে আছে রানা। সি লায়নগুলোকে দেখা যাচ্ছে না এখন আর, ডুব দিয়েছে পানিতে।

দড়ি টেনে খাঁচাটা বোটের কাছে নিয়ে এল বিগ।

সুইমস্টেপে নামল রানা। ঝুঁকে খাঁচার ওপরের হ্যাচটা খুলল। খাঁচাটাকে আলতো ধাক্কা দিল একটা হাঙর। বোঝার চেষ্টা করল যেন, ওটা কী জিনিস। তারপর পাক খেয়ে ঘুরে সরে গেল।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। মাস্কটা উঁচু করল পরার জন্য। ভিকির ডাক শোনা গেল, 'আঙ্কেল!'

ফ্লাইং ব্রিজের দিকে ফিরে তাকাল রানা।

'সাবধান থাকবেন, আঙ্কেল,' ভিকি বলল।

বুড়ো আঙুল উঁচু করল রানা। অভয় দিল ভিকিকে। মাস্ক পরল। প্লাস্টিকের স্যান্ডউইচ হাতে নিয়ে হ্যাচের ভিতর দিয়ে নেমে গেল ঠাণ্ডা পানিতে।

ঠিক পিছনেই নামল কেরি। মাথার ওপর হ্যাচটা টেনে দিল।

দড়ি ছাড়তে শুরু করল বিগ। খাঁচাটা ডুবে গেল পানিতে। টান টান হয়ে গেল দড়ি। অন্য প্রান্তটা ঠিকমত গোঁজে বাঁধা আছে কিনা দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল ও। তারপর পচা ম্যাকারেলের আরও কয়েকটা টুকরো ছুঁড়ে দিল খাঁচার ওপরের পানিতে।

কয়েক মুহূর্তেই সরে গেল বুদবুদ। পরিষ্কার হয়ে এল পানি। কেরির দিকে তাকাল রানা। ভিডিও ক্যামেরা অ্যাডজাস্ট করছে কেরি। একই সঙ্গে চারপাশের নীল পানি দেখছে।

মাথার ওপর টুপ করে পড়ল এক টুকরো ম্যাকারেল। ডাল থেকে খসা শুকনো পাতার মত দুলে দুলে নামছে খাঁচার দিকে।

সাঁ করে ছুটে এল একটা সি লায়ন, টুকরোটা দাঁতে কামড়ে ধরে এমন করে ভেসে রইল, যেন পোজ দিয়েছে কেরির ক্যামেরার জন্য। একটা মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল, দুই কষায় পচা রক্ত লেগে যাচ্ছে, টুকরোটাকে মুখের ভিতর ঢুকিয়ে নিয়ে চিবুতে চিবুতে সরে গেল দূরে।

হাঙর খুঁজছে রানার চোখ। দৃষ্টিসীমার শেষ মাথায়, পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে চোখে পড়ল তিনটে হাঙরকে। ধীর ভঙ্গিতে লেজ নেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কালো অবয়বগুলো, কোনও তাড়া নেই। বেশিক্ষণ লাগবে না কাছে আসতে। সতর্ক রয়েছে রানা। মিনিটখানেকের মধ্যেই আমাদের ব্যাপারে ভয় দূর হয়ে যাবে ওগুলোর–ভাবছে ও, তখন খাবারের লোভে কাছে চলে আসবে।

আরও তিন টুকরো ম্যাকারেল এসে পড়ল খাঁচার পাশে। দুটো টুকরো দুই পাশে, একটা সামনে। এক টুকরো ছোঁ মেরে তুলে নিল একটা সি লায়ন, বাকি দুটো নেমে যেতে থাকল নীচে।

মুহূর্তে ঘুরে গেল তিনটে হাঙরের দুটো, খাঁচার দিকে এগোতে শুরু করল। গতি মোটেও ধীর নেই আর। দেহটাকে সামান্য ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে এগোচ্ছে। এখন আর উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরি নয়, খাবারের জন্য আসছে। দ্রুত।

রানার ঠিক সামনেই রয়েছে এক টুকরো ম্যাকারেল। তিন ফুটের বেশি হবে না। নিশানা লক্ষ্য করে ফাইটার প্লেনের মত সোজা ছুটে এল একটা হাঙর। ম্যাকারেলের টুকরোটা তার লক্ষ্য। হাঁ হয়ে গেছে মুখ, কামড়ে ধরার সুবিধের জন্য একপাশে কাত করে ফেলেছে দেহ, চোখের পর্দা নেমে গেছে শাটারের মত।

আচমকা যেন দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল হাঙরটা। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল শরীর। একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে ছুটে হারিয়ে গেল পানির অস্পষ্ট অন্ধকারে। ম্যাকারেলটাকে ছুঁলোও না। নীচে পড়ে যাচ্ছে ওটা।

কেরির দিকে তাকিয়ে দুই হাত ছড়িয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল

রানা। নীল হাঙর মানুষকে ভয় পায় না, মাঝেসাঝে হামলাও চালায়, অথচ এ হাঙরটা আতঙ্কিত হয়ে পালিয়েছে।

শ্রাগ করল কেরি। নীরবে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ তারও অবাক লাগছে।

ক্যামেরা পোর্টের ভিতর দিয়ে প্লাস্টিক স্যান্ডউইচটা বের করে দিল রানা। চিপে মাছের রস পানিতে ফেলল। প্লাস্টিকটা নেড়ে হাঙরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগল।

এগিয়ে এসে শুঁকে দেখল একটা সি লায়ন। সরে যেতে ইশারা করল কেরি। আদেশ পালন করল লায়নটা।

খাঁচার নীচে শিকের ফাঁক দিয়ে একটা হাঙরকে উঠে আসতে দেখল রানা। লোভনীয় গন্ধ পেয়ে গন্ধের উৎস খুঁজতে আসছে। দড়ি ধরে প্লাস্টিকটাকে খাঁচা থেকে বের করে খাঁচার যতটা সম্ভব দূরে হাত বাড়িয়ে স্যান্ডউইচটা ঝুলিয়ে রাখল রানা। উঠে আসছে হাঙরটা। ঘুরল। এগোতে লাগল লক্ষ্যবস্তুর দিকে।

আয়! আয়! মজার খাবার! কামড় দে! মনে মনে বলছে রানা।

হাঁ করল হাঙরটা। সাদা ত্রিকোণ দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে। টোপ থেকে আর মাত্র পাঁচ ফুট দূরে রয়েছে। আরও এগোল। তিন ফুট দূরে রয়েছে আর।

শক্ত করে দড়িটা ধরে রাখল রানা, যাতে কামড়ে ধরে টান দিয়ে স্যান্ডউইচটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে না পারে হাঙরটা। কামড় বসানোর জন্য একপাশে কাত হলো ওটা। পর্দা সরানো চোখ দেখতে পেল রানা।

তারপর হঠাৎ করেই যেন রানাকে চোখে পড়ল হাঙরটার। বরফের মত জমে গেল। আগেরটার মতই ভড়কে গেছে। পাক খেয়ে ঘুরে গিয়ে কাস্তের মত লেজ নেড়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল গভীর পানির অন্ধকারে।

কেরির দিকে তাকিয়ে বুড়ো আঙুল তুলে ওকে ওপরে উঠতে ইশারা করল রানা। খাঁচার তলায় পায়ের ধাক্কা দিয়ে ওপরে

উঠল। হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এসে ছাতে বসল। মাউথপিস ও মাস্ক খুলে নিল।

'পালাল কেন?' বিগ জিজ্ঞেস করল। বোট থেকে পুরো ঘটনাটাই দেখেছে ও। 'মনে হলো যেন ভূত দেখেছে ওগুলো।'

'বুঝতে পারছি না! মানুষ দেখে তো কখনও এমন করে না ব্লু-শার্ক!' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল রানা।

কেরিও বেরিয়ে এসেছে। 'আমিও তো তা-ই জানতাম,' বলল ও। 'শেষ যে হাঙরটা এল, ওটার গায়ে আঁচড়ের দাগটা দেখেছেন?'

'না তো। ওগুলোর মুখের দিকে নজর ছিল আমার, খেয়াল করিনি!'

'গায়ের এক পাশে পাঁচটা করে আঁচড়। তাজা, গভীর দাগ।'

'পাঁচটা?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আপনি শিওর?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'কদিন আগে একটা ডলফিনকে দেখেছিলাম, লেজে পাঁচটা আঁচড়ের দাগ।'

'কীসের?'

'সেটাই তো প্রশ্ন!' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল রানা। মানুষ দেখে পালাল কেন হাঙরগুলো? যে জিনিসটা ওই আঁচড়ের জন্য দায়ী, ওটা দেখতে কি মানুষের মত? জানা দরকার। বিগের দিকে তাকাল ও। 'আবার নামব। মাছ ফেলুন।'

এক বালতি কাটা মাছ পানিতে ফেলল বিগ। সঙ্গে ডজনখানেক ম্যাকারেল।

'এগুলো যদি ফিরিয়ে আনতে না পারে হাঙরগুলোকে,' দুর্গন্ধে নাকমুখ কুঁচকে বিগ বলল, 'আর কিছুতেই পারবে না।'

একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করল রানা ও কেরি। মাছ আর রক্ত পানিতে ডুবে যাওয়ার সময় দিল। তারপর আবার ঢুকল খাঁচার ভিতরে।

পানিতে মাছের রক্তকে ধোঁয়ার মত লাগছে। মরা মাছগুলো দুলে দুলে ভাসছে। এসব আবর্জনার অন্য পাশে বিশ-তিরিশ ফুট দূরে দুটো হাঙরকে চোখে পড়ল রানার। হাত বাড়িয়ে খাঁচার হ্যাচ লাগাল ও। ফিরে তাকিয়ে দেখে হাঙর দুটো নেই।

ঘড়ি দেখল ও। খাঁচার শিক চেপে ধরে ক্যামেরা পোর্টের ভিতর দিয়ে তাকাল। মিনিট পাঁচেক পর পরিষ্কার হয়ে গেল রক্ত। পচা মাছগুলো নীচে নেমে গেছে। প্রাণী বলতে এখন আশপাশে আছে শুধু সি লায়নগুলো। খাঁচার কিনারে ঘোরাফেরা করছে। কখনও কাছে আসছে, কখনও দূরে সরে যাচ্ছে, কখনও বা খাঁচা ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। খেলা করছে আপনমনে।

কেরিকে আবার ওপরে উঠতে ইশারা করল রানা।

বোটে উঠে ট্যাংক খুলে রাখল ওরা। কেরির দিকে তাকাল রানা। 'গোলমালটা কোথায়, আমার মাথায় ঢুকছে না। হাঙরগুলোর কাণ্ড দেখে মনে হয়েছে, যেন পরস্পরের কাছে মেসেজ পাঠাচ্ছিল ওরা–সাবধান, মানুষ মানেই খারাপ জিনিস! কিন্তু এ রকম তো হওয়ার কথা নয়...ভাবছি, এমন কিছু দেখেনি তো ওরা, যেটা ওগুলোর জন্য বিপজ্জনক এবং যেটার সঙ্গে মানুষের মিল আছে?'

'অসম্ভব না,' জবাব দিল কেরি। 'কিন্তু আপনি কীসের কথা বলতে চাইছেন?'

'অস্বাভাবিক কোন কিছু। এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না।'

'সেটা কি আমার লায়নগুলোর জন্যেও বিপজ্জনক?'

'হতেও পারে,' রানা বলল। 'লায়নগুলোকে ডেকে নিয়ে আসুন। বোটে উঠতে বলুন।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'এখানে থেকে লাভ হবে না। হাঙরের ছবি তোলা যাবে না। অন্য কোথাও গিয়ে চেষ্টা করা যাক।'

'আঙ্কেল,' কাছে এসে দাঁড়াল ভিকি। 'আমাকে খাঁচায় করে নামাবেন বলেছিলেন।'

'এখানে কি তোমার নামা ঠিক হবে?' প্রশ্নটা ভিকিকে নয়, যেন নিজেকেই করল রানা।

'হাঙরগুলো তো নেই এখন!'

'নেই। কিন্তু পাঁচ মাইল পর্যন্ত পচা মাছের তেল আর রক্তের গন্ধ ছড়িয়ে আছে। পানির গভীরতাও অনেক, দু'শো ফুট...'

'প্লিজ!...আমি তো খাঁচার ভেতরেই থাকব! পানি বেশি হলে ক্ষতি কী?' হেসে রসিকতা করল, 'নাকি আপনার ভয়, পানির দানোতে খেয়ে ফেলবে আমাকে?'

ভিকির অনুরোধ এড়াতে না পেরে সহযোগিতার আশায় বিগের দিকে তাকাল রানা। শ্রাগ করল শুধু বিগ। বুঝিয়ে দিল: আপনি যেটা ভাল মনে করেন, আমার কোনও আপত্তি নেই।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। আবার নামবে এখানে। কী কারণে পালিয়ে যাচ্ছে হাঙরগুলো, রহস্যটার জবাব না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

ভিকির ওয়েট সুট নেই। কেরি ওকে নিজেরটা পরতে দিল। ভিকির গায়ে ঠিকমত ফিট করল না। তবে কাজ চলে যাবে। ওর পিঠে একটা ট্যাংক বেঁধে দিল রানা। তারপর নিজেরটা আবার বেঁধে নিয়ে রেডি হলো। যাবার আগে ভিকিকে বলল, 'শোনো, সবচেয়ে জরুরি কথাটা মনে রাখবে: পানির নীচে সবসময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। ভয়ানক কিছু ঘটলেও শান্ত থাকার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে?'

'কী ঘটবে?'

'হয়তো কিছুই ঘটবে না। কিন্তু যদি ঘটে, সাবধান করে রাখলাম।'

'বেশি গভীরে নিশ্চয় নামছি না?'

'না। পানির সমতলের একটু নীচেই থাকছে খাঁচার ছাত।

মেঝেতে দাঁড়ালে চার-পাঁচ ফুট পানির নীচে থাকব। কিন্তু এটা খোলা সাগর। দুই ফুট নীচেও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে মানুষ। অতএব, আবার বলছি—সাবধান! রেডি?'

'রেডি।'

'আমি আগে যাচ্ছি। তোমার বাবা যখন বলবে, তখন নামবে।' হ্যাচ দিয়ে নেমে গেল রানা।

আকাশের দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকাল ভিকি, যেন স্রষ্টার কাছে করুণা ভিক্ষা চাইল, তারপর আস্তে নেমে পড়ল হ্যাচের ভিতরে। জীবনে এই প্রথম হাঙর দেখার খাঁচায় নামছে। ভীষণ উত্তেজিত।

ওয়েট সুট ঠিকমত ফিট না করাতে ভিতরে বাতাস রয়ে গেছে, ভাসিয়ে তুলতে চাইছে ভিকিকে। শিক ধরে রাখতে ইশারা করল রানা। মাথা ঝাঁকাল ভিকি। নির্দেশ পালন করল।

শূন্য সাগর। একটা হাঙরও নেই, সি লায়নগুলোকেও দেখা যাচ্ছে না, কিচ্ছু নেই, কোন প্রাণীই না। হাঁটু গেড়ে বসে নীচে তাকাল ভিকি। তারপর রানার পায়ে হাত রেখে নীচের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বহু নীচে অস্পষ্টভাবে একটা হাঙর চোখে পড়ছে। একটা নিঃসঙ্গ ছোট্ট হাঙর। ওটার চারপাশ ঘিরে চক্কর দিচ্ছে একটা সি লায়ন, একটু পর পরই নাক দিয়ে গুঁতো মেরে হাঙরটাকে বিরক্ত করছে। খাঁচার তলায় উপুড় হয়ে শিকের ফাঁকে মাস্ক ঠেকিয়ে আরও ভালমত দেখার চেষ্টা করল ভিকি।

প্রাণী দুটো আরেকটু উঠে এলে ভালমত দেখা যাবে। কিন্তু এল না ওগুলো। ফ্লোটেশন ট্যাংকগুলোর দিকে তাকাল রানা। প্রাণীগুলো যেহেতু উঠছে না, ওরা খাঁচা নিয়ে নেমে যেতে পারে। ঝুঁকে বসে ভিকির রেগুলেটরটা দেখল সে: দুই হাজার পাউন্ড। যথেষ্ট বাতাস আছে। ছাতের কাছে বসানো দুটো ফ্লোটেশন ট্যাংকেরই ফ্লাড ভাল্‌ভ খুলে দিল ও।

নামতে শুরু করল খাঁচা। বোট থেকে দড়ি ছাড়ছে বিগ।

ডেপথ গেইজের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। খাঁচার ছাত পনেরো ফুট নামতেই ফ্লাড ভাল্‌ভ্‌ বন্ধ করে দুটো এয়ার ভাল্‌ভ্‌ খুলে দিল ও। তীব্র বেগে বাতাস ঢুকতে লাগল ট্যাংকে। আস্তে আস্তে টান কমে গেল দড়িতে। নামা বন্ধ হলো খাঁচার। স্থির হয়ে ভেসে রইল।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন সি লায়ন ও হাঙরটাকে। নীল ক্যানভাসের পটভূমিতে যেন দুটো কালো সচল ছবি। মুখ থেকে বাতাস বেরিয়ে এল লায়নটার। ভুরভুর করে কয়েকটা বুদবুদ উঠে এল ওপর দিকে।

হঠাৎ হাঙরটার কাছ থেকে সরে গিয়ে তীব্র বেগে ওপরে উঠতে শুরু করল লায়নটা। প্রথমে রানা ভাবল, খেলাটা আর ভাল লাগছে না ওটার, বিরক্ত হয়ে গেছে, কিংবা দম নেয়া প্রয়োজন, তাই উঠে যাচ্ছে। কিন্তু ওটার ভাবভঙ্গি সন্দেহ জাগাল ওর। গতি একটুও না কমিয়ে খাঁচার পাশ কাটাল লায়নটা। বোটের দিকে উঠে গেল। তাকিয়ে আছে রানা।

অন্য লায়নগুলোকে দেখা গেল। দুটো একসঙ্গে রয়েছে, আরেকটা একা। প্রথমটার মতই দ্রুত পা নেড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রানা। কোনকিছু দেখে যে ভয় পেয়েছে ওগুলো, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সুইমস্টেপে ওঠার জন্য অস্থির হয়ে গেছে সি লায়নগুলো। জোরে চিৎকার করছে। কে কার আগে উঠবে, তাই নিয়ে হুড়াহুড়ি, গুঁতোগুঁতি করছে।

'খেলা শেষ, তাই না?' বিগ বলল, 'নিশ্চয় আর ভাল লাগছে না।'

'উঁহুঁ, খেলা শেষ নয়, ভয় পেয়েছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কেরি। 'ব্যাপার সুবিধের লাগছে না আমার।'

ঝুঁকে পানির দিকে তাকাল বিগ। খাঁচাটা অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। ঠিক খাঁচার উপরের পানিতে বোটের ছায়া পড়েছে, নইলে আরও ভালমত দেখতে পেত। বোটের অন্যপাশে নীচে তাকাল। কিছু দেখল না। ফিরে এল আগের জায়গায়। 'কই, কিছুই তো দেখলাম না।'

'কিন্তু কিছু একটা নিশ্চয় আছে,' জোর দিয়ে বলল কেরি। 'লায়নগুলোকে ভয় দেখিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'কিন্তু কী আছে? কোথায়?' নিজেকেই প্রশ্ন করল বিগ। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'সর্বনাশ!'

'কী?'

'বোটের খোলের নীচে আছে ওটা, সে-জন্যেই দেখতে পাচ্ছি না!' তাড়াতাড়ি খাঁচার দড়ি ধরে টানতে শুরু করল বিগ।

দড়িতে টান পড়তে কেঁপে উঠল খাঁচাটা। এয়ার ভাল্‌ভগুলো বন্ধ করে দিতে ঘুরল রানা।

মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল একটা ছায়া। এতই বড়, অন্ধকার ঢেকে দিল খাঁচাটাকে। চমকে মুখ তুলে তাকাল রানা। চোখে রোদ পড়ে মুহূর্তের জন্য যেন অন্ধ করে দিল ওকে। ছায়াটা কীসের চিনতে পারল না। চোখে আলো সয়ে এল। ছায়াটা কোনদিকে গেছে খেয়াল রাখতে পারেনি। ফিরে তাকাল।

দশ ফুট দূরে বোটের ছায়ার নীচ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল ওটাকে। রাজকীয় ভঙ্গি একটা সময় ওকে মুগ্ধ করলেও এখন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে খাঁচার দিকে এগোচ্ছে। চিনতে পারল রানা। ট্যাগ লাগানো সেই মস্ত সাদা হাঙরটা। গতি কমাল না। দ্বিধা করল না। চোখের মণি ওপর দিকে উঠে গেছে। মুখ হাঁ। সামনে ঠেলে এসেছে মাঢ়ী। করাতের মত খাঁজকাটা ত্রিকোণ সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। খাঁচা কামড়ে ধরল হাঙরটা।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে ভিকি। টান দিয়ে ওকে হাঙরটার দিক থেকে সরিয়ে আনল রানা।

ধাতব জিনিসে দাঁত ঘষার শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ বুদবুদের বিস্ফোরণ ঘটল যেন। ভুড়ভুড় করে উপরে উঠে যাচ্ছে।

ভয়ানকভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে খাঁচাটা। বোটের খোলে বাড়ি খাচ্ছে। কী ঘটেছে বুঝতে পারছে রানা। একটা ফ্লোটেশন ট্যাংক ফুটো করে দিয়েছে হাঙরটা।

'মর শয়তান!' চিৎকার করে গালি দিল বিগ। দড়ি ধরে টানছে। হাত ও কাঁধের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে তারের মত। খাঁচা কামড়ে ধরার মাত্র এক সেকেন্ড আগে চোখে পড়েছে হাঙরটাকে, ধূসর টর্পেডোর মত ছুটে বেরিয়েছে বোটের নীচ থেকে।

কেরিও এসে হাত লাগাল, দড়ি ধরে খাঁচা টেনে তুলতে সাহায্য করল বিগকে। 'আমি তো জানতাম হাঙর কখনও...'

'...মানুষকে আক্রমণ করে না,' তিক্তকণ্ঠে বাক্যটা শেষ করল বিগ। 'কিন্তু এটা তো করল।'

'কেন?'

'ঈশ্বর জানেন।'

বোটের খোলে খাঁচার বাড়ি লাগা টের পাচ্ছে ওরা।

'দড়িটা উইঞ্চে লাগাতে পারবেন?' কেরি জিজ্ঞেস করল।

'পারব, কিন্তু সাহস পাচ্ছি না। এক টনের কম হবে না দৈত্যটার ওজন। টানাটানিতে দড়ি ছিঁড়ে গেলে সর্বনাশ।'

'কী করব তাহলে? কিছু একটা তো করা দরকার...'

'গুলি করব,' জবাব দিল বিগ, 'বোটের নীচ থেকে বেরোলেই। না বেরোনো পর্যন্ত কিছু করতে পারছি না, খোদাকে ডাকা ছাড়া।'

খাঁচার এককোণে জড়সড় হয়ে আছে ভিকি। শিক আকড়ে ধরেছে

এক হাতে। ওকে জড়িয়ে ধরে আছে রানা, অন্য হাতে ধরা খাঁচার শিক।

কামড় ছাড়েনি হাঙরটা। প্রচণ্ড আক্রোশে দেহ মুচড়ে ঝাঁকি দিয়ে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে খাঁচাটা। বিশাল লেজের আন্দোলন যেন ঝড় তুলেছে পানিতে।

ভিকির রেগুলেটর থেকে একনাগাড়ে বুদবুদ বেরোচ্ছে। ভড়কে গিয়ে দ্রুত শ্বাস টানছে। আরও ধীরে শ্বাস নিতে ইশারা করল রানা। বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল আতঙ্কিত ভিকি।

হঠাৎ খাঁচা ছেড়ে দিল হাঙরটা। লম্বা দোল খেয়ে খোলের কাছ থেকে সরে এল খাঁচাটা। কাত হয়ে ঝুলে রইল। খাঁচার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে হাঙরটা। সাদা ফোলা পেট দেখতে পাচ্ছে রানা। চামড়ায় পাঁচটা গভীর আঁচড়ের দাগ!

'টানুন!' চেঁচিয়ে কেরিকে বলল বিগ।

দুজনে মিলে টেনে তুলছে খাঁচাটা। বোটের খোলের নীচ থেকে সরে আসায় খাঁচার ছাত দেখতে পাচ্ছে এখন। হাঙরটাকেও দেখতে পাচ্ছে। খাঁচার নীচে চলে গেছে। ধূসর বিশাল একটা ছায়া। যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে আবার।

দড়িটা ধরে রেখেই সুইমস্টেপে নেমে এল বিগ। হাঙরটার দিক থেকে নজর সরে গেছে। 'আর মাত্র পাঁচ ফুট তুললেই...'

কেরির চিৎকারে থেমে গেল ও। নীচের দিকে দেখাচ্ছে কেরি।

ঝিলিক দিয়ে উঠল কাস্তের মত বাঁকা লেজ। পানিতে প্রচণ্ড আলোড়ন। তীব্র গতিতে পানি ফুঁড়ে উঠে এল একটা চোখা দানবীয় মাথা। সুইমস্টেপে প্রচণ্ড গুঁতো মেরে বিগকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল হাঙরটা। ব্যর্থ হয়ে খাঁচার দড়ি কামড়ে ধরল। হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল বিগের হাত থেকে। কামড় দিয়ে কেটে ফেলল।

সুইমস্টেপের নীচ থেকে চলে গেল হাঙরটা।

দড়ি কেটে যাওয়ায় তলিয়ে যাচ্ছে খাঁচা।

টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল রানা। দুটো ফ্লোটেশন ট্যাংকের মধ্যে যেটা অক্ষত রয়েছে, সেটার এয়ার ভাল্‌ভ চেপে ধরে পুরোটা ঘুরিয়ে দিল। হিস্‌হিস্‌ শব্দ শোনা গেল। ধীর হয়ে এল খাঁচার নীচে নামা। তবে পুরোপুরি থামছে না।

ভিকির বয়ান্‌সি ভেস্টটা ফুলিয়ে দিল রানা। নিজেরটাও ফুলাল। ওপরে ভেসে উঠল দুজনে। ছাতে ঠেকল দেহ। দুটো সুবিধে হলো এতে: ওদের ভারমুক্ত হয়ে গেল খাঁচা। একই সঙ্গে দুজনের ভেস্টের বাতাস খাঁচার গায়ে চাপ সৃষ্টি করে ওপরে ঠেলা দিল। রানা আশা করল, এতে নীচে নামা বন্ধ হবে খাঁচাটার। বিগ আরেকটা নতুন দড়ি নামিয়ে দেয়া পর্যন্ত এভাবে ভাসিয়ে রাখতে পারলেই বেঁচে যায়।

কিন্তু কোনভাবেই ঠেকানো গেল না খাঁচার নিম্নগতি। নেমেই চলেছে। ট্যাংকের ডেপথ গেইজ দেখল রানা। তিরিশ ফুট পার হয়ে গেল মিটারের কাঁটা। পঁয়ত্রিশ ফুট। চল্লিশ...

দ্রুত চারপাশে চোখ বোলাল ও। হাঙরটা উধাও হয়েছে।

পঞ্চাশ ফুট...

ওদেরকেও তলিয়ে যেতে হবে, বুঝতে পারছে রানা। একটা ফ্লোটেশন ট্যাংক ভাসিয়ে রাখতে পারবে না খাঁচাটাকে। ট্যাংকের বাতাস ফুরিয়ে গেলে মারা পড়বে দুজনেই। খাঁচার মায়া বা উপর থেকে ফেলা দড়ির আশা ত্যাগ করে এটা থেকে এখন বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু বেরিয়ে গেলেই যে বিপদ কমবে, তা নয়। খাঁচার বাইরে হাঙরের আক্রমণ হলে বাঁচতে পারবে না। বিগের দড়ি পৌঁছায়নি এখনও ওদের কাছে। হয়তো দড়ি ফেলার কথা ভাবছেই না বিগ; হয়তো জানেই না, ফুটো হয়ে গেছে একটা ফ্লোটেশন ট্যাঙ্ক।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। ভিকিকে এক হাতে ধরে রেখে, আরেক হাতে হ্যাচটা ওপর দিকে ঠেলে দিল। ভিকির দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত না হতে ইঙ্গিত করল।

বুঝতে পারল ভিকি। মাথা কাত করল।

ডেপথ গেইজের দিকে তাকাল রানা। ষাট ফুট...

একটা মুহূর্তও আর দেরি করা যায় না। হ্যাচ খুলে ভিকিকে বের করে দিয়ে নিজেও বেরিয়ে এল রানা। ভিকির হাত ধরে রাখল। তীক্ষ্ণ নজর রাখল ওর ওপর, যাতে কিছু ভুল করে বসলে সামলাতে পারে।

দ্রুত উঠছে দুজন। নিজেদের ভেস্টের ভিতর থেকে বেরোনো বুদবুদের চেয়ে দ্রুত। ফোলানো ভেস্ট ওদেরকে ওপরে উঠতে সাহায্য করছে। এই গতিতে উঠতে থাকলে ফুসফুস ফেটে যেতে পারে, এমবলিজম এমনকী বেন্ডেও আক্রান্ত হতে পারে। গতি কমানোর তাগিদ অনুভব করল রানা।

ভেস্টের ভেন্ট খুলে দিল ও। বাতাস বেরিয়ে যেতেই ওপরে ওঠার গতি কমে গেল ওদের।

ডেপথ গেইজের কাঁটা এখন চল্লিশের ঘরে। একটু পর আবার গেইজের দিকে তাকাল রানা। পঁয়ত্রিশ ফুট। নীচে তাকাতে সাহস হচ্ছে না ওর। পানির রহস্যময় গভীরতা থেকে হাঙরটা যদি উঠে আসেও, দেখতে চায় না। ভিকির মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ও স্বাভাবিক রয়েছে কিনা। আক্রমণ এলে নীচের দিক থেকে আসবে, তাই ভিকিকে ঠেলে নিজের চেয়ে কিছুটা উপরে তুলে রেখেছে রানা।

উঠে চলেছে দুজন। বিশ ফুট...পনেরো...

মাথার ওপর ঝপাং করে শব্দ হলো। পানিতে আলোড়ন। সাঁতরে নেমে এল বিগ। হাতে স্পিয়ার গান।

এতক্ষণে নীচে তাকানোর সাহস পেল রানা। বিষণ্ন অন্ধকার থেকে মিসাইলের মত উঠে আসতে দেখল মস্ত সাদা হাঙরটাকে।

হাঁ করা মুখ। এসে পড়েছে প্রায়।

ট্রিগার টিপল বিগ। কার্বন-ডাইঅক্সাইড প্রপেল্যান্টের ধাক্কায় বর্শার সঙ্গে এক ঝাঁক বুদবুদ বেরোল গানের মুখ থেকে। তীব্র গতিতে বর্শাটা গিয়ে বিঁধল হাঙরের হাঁ করা মুখের ভিতর। ওপরের তালুতে আটকে রইল। ক্ষতিটা মারাত্মক না হলেও আঘাতের ধাক্কা থমকে দিল হাঙরটাকে। ওপরে ওঠা বন্ধ করল। জোরে জোরে মাথা নেড়ে অবাঞ্ছিত যন্ত্রণাটাকে খুলে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। না পেরে শেষে কামড়ানো শুরু করল বর্শাটাকে।

পানির ওপরে মাথা তুলল রানা। ভিকিকে ঠেলে দিল সুইমস্টেপের দিকে। হাত বাড়িয়ে ভিকিকে উপরে টেনে তুলল কেরি। সুইমস্টেপে উঠে বসল রানা। নীচে ঝুঁকে হাত বাড়াল বিগকে তোলার জন্য।

কিন্তু উঠল না বিগ। পানির নীচে মুখ নামিয়ে তাকিয়ে আছে। কয়েক সেকেন্ড পর মাথা তুলল। কারও সাহায্য ছাড়াই উঠে পড়ল সুইমস্টেপে।

ডেকে উঠল রানা। হার্নেস খুলল। ট্যাংকটা ডেকে ফেলে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ভিকির দিকে। ডেকে কাত হয়ে পড়ে আছে ছেলেটা। তাকে ট্যাংক খুলতে সাহায্য করছে কেরি।

'কী?' ভিকির দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রানা। হাসল। 'কেমন?'

'ভাল,' মাথা ঝাঁকাল ভিকি। মলিন হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল ঠোঁটে।

'তোমার প্রশংসা না করে পারছি না, ভিকি,' হাঁপাচ্ছে রানা। 'যে পরিস্থিতিতে পড়েছিলে, অভিজ্ঞ ডাইভারেরও মাথা গরম হয়ে যাওয়ার কথা।' ভিকির একটা হাত নিজের তালুতে রেখে আরেক হাত দিয়ে ডলে দিতে দিতে বলল, 'ওপেন-ওয়াটার ডাইভিং শেখার শুরুটাই সাংঘাতিক মজার হয়েছে, তাই না?'

পাশে এসে বসল বিগ। রানার বাহুতে হাত রাখল।

'থ্যাংকস, মিস্টার রানা।'

'কেন?' ভুরু নাচাল রানা। 'কীসের থ্যাংকস?'

'আবারও ভিকির প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।' ছলছল করছে বিগের চোখদুটো।

'তা হলে তো আপনাকে ডবল ধন্যবাদ দিতে হয় আমাদের দুজনকে বাঁচাবার জন্যে। সময়মত আপনি না নামলে উঠে আসতে পারতাম না। আমার মনেই হচ্ছিল হাঙরটা এত সহজে ছাড়বে না। ভয়ে নীচে তাকানো ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

'তাই ভিকিকে ঠেলে রেখেছিলেন আপনার চেয়ে উপরে?'

একথার জবাব দিল না রানা। বলল, 'যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল। ভাগ্যিস ওটা আসছে দেখতে পেয়েছিলেন আপনি!'

'আমি বুঝতে পারছিলাম, ওটা আসবেই,' বিগ জবাব দিল। 'সেজন্যেই মনে হলো, কিছুক্ষণের জন্য অন্য কিছু চিবাতে দেয়া উচিত শয়তানটাকে।'

'তাই বর্শা চিবাতে দিলেন। ঠিকই করেছেন।'

'কিন্তু যা-ই বলেন, হাঙরটা পাগল! কোনও হাঙরকে এ রকম আচরণ করতে দেখিনি।'

'তা হলে ব্লুগুলোকে কী বলবেন? এতক্ষণে হাঙরগুলোর অদ্ভুত আচরণের কারণ আমি বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি,' রানা বলল। 'সাদা হাঙরটার পেটেও পাঁচটা আঁচড়ের দাগ দেখেছি।'

'তার মানে সেই রহস্যময় জিনিসটা!' চিন্তিত ভঙ্গিতে সাগরের দিকে তাকিয়ে রইল বিগ।

নোঙর তুলল ওরা। খাঁচাটা তলিয়ে গেছে গভীর পানিতে। আপাতত তোলা সম্ভব নয়। পরে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে ভেবে, দামি খাঁচাটা ফেলেই, পশ্চিমে মুখ ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে চলল ওরা। ফ্লাইং ব্রিজে হুইলে দাঁড়ানো বিগ। পিছনে তোয়ালের উপর শুয়ে আরাম করে বিকেলের রোদ পোহাচ্ছে ভিকি। সি

লায়নগুলোকে খাওয়াচ্ছে কেরি।

অসপ্রি আইল্যান্ড দিগন্তে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে। কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা। বলল, 'মিস কিন, এইমাত্র রেডিওতে খবর পাঠাল আপনার পাইলট। তিমি দেখেছে।'

'কত দূরে?'

'মাইল দুয়েক পুবে।'

দ্বিধা করতে লাগল কেরি। হাতঘড়ি দেখল। প্রথমে লায়নগুলোর দিকে তাকাল, তারপর রানার দিকে ফিরল।

ভিকিকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কেমন লাগছে এখন?'

'ভাল,' জবাব দিল ভিকি। 'সত্যিই আমি ভাল আছি। চলুন না, আঙ্কেল, যাই। খোলা সাগরে সামনাসামনি কখনও তিমি দেখিনি আমি।'

কেরির দিকে ফিরল রানা। 'কী করবেন, আপনিই বলুন। লায়নগুলোকে নামাতে পারবেন আর?'

'নিশ্চয়ই। এখনও ক্লান্ত হয়নি ওরা।'

'ঘাবড়ে যায়নি তো?'

'গেছে। তবে সাগরে নামতে অরাজি হবে না। তা ছাড়া এখানে হাঙরের ভয় নেই। তিমির ঝাঁকের কাছে ঘেঁষে না হাঙর। তিমিকে ভয় পায়, এমনকী গ্রেট হোয়াইটগুলোও।'

'কিন্তু,' চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে, 'শুধু সাদা হাঙরটার কথা ভাবছি না আমি!' পুবে মোড় নিতে বলল বিগকে।

চব্বিশ

'কই, ওদের ডাক শুনছি না কেন?' ভিকির প্রশ্ন।

'পানির নীচে নামলে শুনতে পাবে,' রানা জবাব দিল। 'কয়েক মাইল দূর থেকেও।'

ইঞ্জিন নিউট্রালে দেয়া। অলস ভঙ্গিতে ঢেউয়ের মধ্যে ওঠা-নামা করছে বোট।

দুশো গজ দূরে অলস ভঙ্গিতে মিছিল করে উত্তরে চলেছে হাম্পব্যাক তিমির একটা দল। ধাড়ি, বুড়ো, বাচ্চা, মাদী, মর্দা, সবই আছে। বিশাল মাথার ফুটো দিয়ে ফোয়ারার মত ওপরে ছুঁড়ে দিচ্ছে পানি। উষ্ণ বাতাসে ওদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরোনো পানির কণা হালকা কুয়াশা সৃষ্টি করেছে। মস্ত লেজ ওপরে তুলে ঝপাং করে ফেলছে পানিতে। একটু পর পর লেজ তুলে পানিতে বাড়ি মেরে কীসের যেন ইঙ্গিত দিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে কোনও কোনওটা, কয়েক মিনিট পর কিছুদূরে ভেসে উঠছে আবার। তবে ঝাঁক থেকে সরছে না।

'ভিকি, এসো,' বোটের পিছন দিক থেকে কেরির ডাক শোনা গেল। 'হার্নেস পরানো শিখবে না?'

'শিখব। আসছি।'

তিনটে লায়নকে হার্নেস পরিয়েছে কেরি। প্রতিটি হার্নেসের সঙ্গে একটা করে ভিডিও ক্যামেরা লাগানো। লেন্সের মুখ সামনের দিকে।

চতুর্থ হার্নেসটা ভিকির হাতে তুলে দিল কেরি। 'নাও, রিটিকে

তুমি পরাও।' লায়নের কাঁধে কীভাবে হার্নেস পরাতে হয় দেখিয়ে দিল ও। ফ্লিপারের পিছনে পেটের নীচ দিয়ে ঘুরিয়ে এনে পিঠের উপর লাগাতে হয় বাক্‌ল্।

লায়নটার মসৃণ দেহে চামড়ার ফিতেটা পরাল ভিকি। বরফের মত ঠাণ্ডা নাক দিয়ে ওকে আদর করে গুঁতো মারছে প্রাণীটা, লম্বা গোঁফের সুড়সুড়ি লাগছে ভিকির গায়ে।

হার্নেস পরানো হয়ে গেলে ক্যামেরা আটকে দিল কেরি। ব্রিজের দিকে তাকিয়ে রানাকে বলল, 'হয়ে গেছে আমাদের।'

চিন্তিত চোখে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ওপর থেকে দেখে সবই শান্ত, স্বাভাবিক লাগছে। কিন্তু ওই শান্ত পানির নীচেই রয়েছে ভয়ঙ্কর কিছু একটা। ঠলর কথা ভাবছে ও। কী হতে পারে ওটা? এ মুহূর্তে সি লায়নগুলোকে নামাতে অস্বস্তি বোধ করছে।

'আজই নামাতে চান?' দ্বিতীয়বার কেরিকে জিজ্ঞেস করল ও। 'আবারও ভেবে দেখুন। হাতে এখনও তিন মাস সময় আছে আপনার।'

'তা আছে, তবে সব সময় তিমির দেখা মিলবে না।'

'বেশ, যা ভাল বোঝেন।' বিগকে বোট চালাতে বলল রানা।

'তিমিগুলোর আগে চলে যান,' ফ্লাইং ব্রিজের দিকে তাকিয়ে বিগের উদ্দেশে বলল কেরি। 'পিছন থেকে সাঁতরে গিয়ে ওদের ধরা কঠিন হবে লায়নগুলোর জন্যে।'

চলতে শুরু করল বোট। ইঞ্জিনের শব্দে ভড়কে গেলে আর স্বাভাবিক আচরণ করবে না তিমিগুলো, তাই যতটা সম্ভব দূর দিয়ে এগোল বিগ। শান্ত সাগর। তিমিগুলোকে দৃষ্টিসীমায় রাখতে অসুবিধে হচ্ছে না। এক মাইল দূর থেকেও ফোয়ারা আর লেজের ওঠানামা দেখা যায়। তিমিগুলোর পাঁচশো গজ সামনে গিয়ে থামল বিগ।

বোটের পিছনে সারি দিয়ে পাশাপাশি বসে রয়েছে চারটে সি

লায়ন। প্রতিটি লায়নের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলল কেরি। হাত নেড়ে বোঝাল কী করতে হবে। সবক'টা ক্যামেরার সুইচ অন করে দিল। সুইমস্টেপের দিকে যেতে ইশারা করল। পিছনে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখছে ভিকি। কেরির মত করে হাত নেড়ে নেড়ে প্র্যাকটিস করছে।

হেলেদুলে এক এক করে বোটের একেবারে কিনারে চলে গেল লায়নগুলো। সুইমস্টেপ থেকে ঝাঁপ দিল সাগরে।

ভেসে উঠল বোটের পিছনে গিয়ে। দুই হাত তুলে এগিয়ে আসা তিমিগুলোকে দেখাল কেরি। যেতে ইশারা করল।

কয়েকবার ডেকে উঠল লায়নগুলো। তারপর ডাইভ দিয়ে চলে গেল পানির নীচে।

'এক ডুবে কতক্ষণ থাকতে পারে?' জানতে চাইল ভিকি।

'দশ মিনিট,' কেরি বলল। 'তিমির চেয়ে কম। তবে ঘন ঘন ডুব দিতে পারে। এক ডুবে ছয়-সাতশো ফুট নীচেও চলে যেতে পারে।'

'মানুষ ডাইভিং সুট পরেও এত নীচে নামতে পারে না।'

'না, পারে না। আরও একটা সুবিধে আছে ওদের, যত নীচেই নামুক, উঠে আসার সময় দেহ ডিকম্প্রেস করতে হয় না। বেন্ড কিংবা এমবলিজমের শিকার হয় না।'

ফ্লাইং ব্রিজ থেকে বিগ জিজ্ঞেস করল, 'ওগুলোর পিছে যেতে হবে?'

'না,' জবাব দিল কেরি। 'আমরা এখানেই থাকব। পিছনে গেলে তিমিগুলো সতর্ক হয়ে যাবে, স্বাভাবিক ছবি পাব না। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিন। শব্দ থেমে যাক। তিমিগুলো পুরোপুরি স্বাভাবিক থাকুক। লায়নগুলোকে নিয়ে চিন্তা নেই। আমরা কোথায় আছি, ওরা জানে। সময়মত নিজেরাই খুঁজে বের করে নেবে।'

'ফিরে আসবেই, এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?' ভিকি জিজ্ঞেস করল।

'সব সময় এসেছে,' ভিকির দিকে তাকিয়ে হাসল কেরি 'কখনও ভুল করেনি।'

গাল চুলকাল ভিকি। উসখুস করে শেষে বলেই ফেলল, 'তিমির গান শুনতে খুব ইচ্ছে করছে। একবার নেমে তো সবাইকে নাজেহাল করলাম। আর পানিতে নামাটা ঠিক হবে না আমার, তাই না, আন্টি?'

ভিকির কথা কানে গেল রানার। মুচকি হাসল। রান্নাঘরের কেবিনেট থেকে একটা গ্লাস নিয়ে এল। হাত নেড়ে ডাকল ভিকিকে। 'এসো আমার সঙ্গে। দেখি, তোমাকে তিমির গান শোনানো যায় কি না।'

ভিকিকে নীচের ফরোয়ার্ড কেবিনে নিয়ে এল রানা। মেঝেতে বিছানো কার্পেটের একটা কোণার কিছুটা তুলে গুটিয়ে রাখল। সেজদার ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে কান ঠেকাল ফাইবারগ্লাসে তৈরি ডেকে। ভিকিকেও কান ঠেকাতে ইশারা করল।

রানার মত করে কান ঠেকাল ভিকি।

'কিছু শুনছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পানি,' ভিকি বলল। 'খোলের গায়ে বাড়ি মারার ছল-ছলাৎ শব্দ। হঠাৎ চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, তবে খুব দুর্বল শব্দ।'

'বাড়ানোর ব্যবস্থা করছি।' হাতের গ্লাসটা উল্টো করে মেঝেতে বসিয়ে দিল রানা। 'এখানে কান রাখো,' গ্লাসের উপুড় হয়ে থাকা পিছন দিকটা দেখাল।

কান ঠেকাল ভিকি।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'স্পষ্ট হয়েছে?'

হাসি ফুটল ভিকির মুখে। অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাচ্ছে। পাখির কিচিরমিচির ও হালকা শিসের মিশ্রণ। খুব ভাল লাগছে ওই প্রকাণ্ড সামুদ্রিক প্রাণীগুলোর গান, ডাক কিংবা ভাষা, যা-ই হোক না কেন।

'দারুণ!' ভিকির হাসিটা একান-ওকান ছড়িয়ে গেল। 'উহ্, আঙ্কেল, আপনি সঙ্গে না থাকলে এখানে আসার মজাটাই মাটি হত আমার।'

'শুনলে তো। চলো এবার, বেরোনো যাক। তিমিগুলোকে দেখি।'

ভিকিকে নিয়ে ওপরে ফিরে এল রানা। পুবদিকে শ'দুয়েক গজ সরে গেছে তিমিরা। বোটটাকে এড়ানোর জন্য। দূর দিয়ে পার হয়ে যেতে চায়।

কেবিনে ঢুকে কুলার খুলল রানা। মিসেস মেলভিলের বানিয়ে দেয়া খাবারগুলোর সদ্গতি করার সময় হয়েছে। ভিকিকে ডাক দিল ও।

প্রথম সি লায়নটা ফিরে এল আধঘণ্টা পর।

পিছনের ডেকে বসে খাচ্ছে সবাই, এ সময় ওটার ডাক শুনে পিছনে ফিরে তাকাল ওরা। একটা উঁচু ঢেউয়ের চূড়া থেকে সুইমস্টেপে উঠতে দেখল লায়নটাকে।

'হ্যাল্লো, মেট,' স্বাগত জানাল কেরি।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'বোঝেন কী করে কোন্টা কে?'

'তিন বছর দিনরাত ওদের সঙ্গে কাটালে আপনিও বুঝতেন।'

পিছনের লম্বা ফ্লিপারের ওপর ভর করে দেহটাকে উঁচু করল লায়নটা। ট্র্যান্সামে উঠল।

ক্যামেরা আর হার্নেস খুলে নিল কেরি। উত্তেজিত ভঙ্গিতে চিৎকার করতে করতে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়তে লাগল লায়নটা।

'কী বলে?' ভিকি জানতে চাইল।

'যা দেখে এল, জানাচ্ছে আমাকে,' কেরি বলল। 'স্কুল থেকে ফিরে বাচ্চা মেয়ে সারাদিনের ঘটনা যেমন মাকে জানায়।'

ক্যামেরাটা উঁচু করে ধরল কেরি। 'বাড়ি ফেরার পথে টেপটা

দেখব। বাকিগুলোও আসুক। সবগুলো টেপ একসঙ্গেই দেখা যাবে।' ভিকির দিকে তাকাল ও। 'ভিকি, মেটকে কয়েকটা মাছ এনে দাও না। আমি ততক্ষণে ক্যামেরাটা মুছে নতুন টেপ ভরে ফেলি।'

আফটারডেকের একটা হ্যাচ তুলল ভিকি। মাছ ভর্তি বালতি তুলে এনে একটা মাছ ঝুলিয়ে ধরল লায়নটার মুখের কাছে। আস্তে গলা বাড়িয়ে দিয়ে মাছটা নিল মেট। লম্বা শ্বাস টেনে যেন গন্ধ নিল খাবারের। তারপর খেতে শুরু করল।

দশ মিনিট পর ফিরে এল সুজি। আরও কয়েক মিনিট পর এল রিটি। দুটোকেই মাছ খাওয়াল ভিকি। হেলেদুলে ডেকের পিছনে আগের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল মেটের গা ঘেঁষে।

রোদে পিঠ দিয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ল সি লায়নগুলো।

ঘড়ি দেখল কেরি। রানা লক্ষ করল গত পাঁচ মিনিটে এবার নিয়ে দশবার ঘড়ি দেখেছে ও। কপালে হাত রেখে রোদ আড়াল করে সাগরের শান্ত পানির দিকে তাকাল কেরি। গলা বাড়িয়ে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দেখল কোথাও কোন নড়াচড়া আছে কিনা।

'আপনি বলেছেন, ডোবাডুবি করতে দিলে সারাদিনই পানিতে কাটিয়ে দিতে পারবে ওরা,' রানা বলল।

'পারবে, তবে করবে না, আজকে অন্তত, ওই হোয়াইট শার্কটা ভয় দেখানোর পর।' আবার ঘড়ি দেখল কেরি। 'কাজে বেরোলে দুই ঘণ্টার বেশি কখনও পানিতে থাকে না ওরা। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসার ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া, আরও একটা কারণে পানিতে বেশিক্ষণ থাকতে চায় না ওরা: কাজ করলে অতিরিক্ত খিদে পায় ওদের, খাবার না পেলে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যায়। খাওয়ার জন্যে ফিরে আসে।' ভ্রূকুটি করল ও। 'বিশেষ করে বারকি। সবচেয়ে অলস ওটা। কিন্তু অতিরিক্ত দেরি করছে আজ।'

'হয়তো ফেরার কথা ভুলে গেছে,' রানা বলল। 'কিংবা তিমিদের সঙ্গে থাকতে ভাল লাগছে।'

'উঁহুঁ!' মাথা নাড়ল কেরি।

'এতটা শিওর হচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না। হয়তো...

'ওগুলো আমার পোষা প্রাণী,' ক্ষুব্ধ শোনাল কেরির কণ্ঠ।

তাড়াতাড়ি হাত তুলল রানা। 'সরি!'

'বিনকিউলার কোথায়?'

'ব্রিজে। বাড়তিও আছে, কেবিনে।'

ফ্লাইং ব্রিজে উঠে গেল কেরি।

পিছন পিছন রানাও উঠল।

'লায়নটাকে খুঁজতে যাবেন?'

'দরকার নেই। ও জানে আমরা কোথায় আছি। ফিরে না আসা পর্যন্ত এখান থেকে নড়ব না।'

'যদি আদৌ ফেরে!' কথাটা কেরিকে শোনাল না, মনে মনে বলল রানা।

পঁচিশ

সমুদ্রতলের বালিতে ঢাকা ঢালের ওপর দিয়ে শিকারের খোঁজে গভীর পানির দিকে এগিয়ে চলেছে দানবটা। মাথার ভিতর বসানো ঝিল্লি নতুন শব্দের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে। অপরিচিত, উঁচু মাত্রার শব্দ, অনেক দূরে। শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে ওটা। যতই এগোচ্ছে, জোরাল হচ্ছে শব্দ।

অবশেষে পানির সবজে-ধূসর রঙ যখন পরিষ্কার নীলে রূপ

নিল, শব্দের উৎসের সন্ধান মিলল। এত বড় প্রাণী এর আগে আর দেখেনি দানবটা। দেখেই বুঝে নিল, ওগুলোর উপর হামলা চালানো সম্ভব নয়, অতিরিক্ত বড়। মস্ত দেহ বাঁকিয়ে খুব সহজ ভঙ্গিতে সাঁতরে চলেছে নির্ভীক, রাজকীয় ভঙ্গিতে।

এতবড় প্রাণী শিকার করা যাবে না। ঘুরতে যাচ্ছিল দানবটা, এ সময় চোখে পড়ল ছোট আকারের প্রাণীগুলোকে। বড় বড় প্রাণীগুলোর আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। তুলনায় অনেক ছোট। তবে গতি খুব দ্রুত। শিকার হিসেবে উপযুক্ত। আরও কিছুদূর এগিয়ে বড় প্রাণীগুলোর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অপেক্ষা করতে লাগল দানবটা।

ছোট প্রাণীগুলোর একটা খুব কাছে চলে এল। পিছন থেকে ধরার চেষ্টা করল দানবটা। কিন্তু ওর মতলব টের পেয়েই দ্রুত ছুটে পালাল ছোট প্রাণীটা, মুহূর্তে নাগালের বাইরে চলে গেল। পিছনে পড়ে গেল দানবটা। চোখের আড়ালে চলে গেল ছোট শিকার। পিছনে রেখে গেল শব্দের ট্রেইল।

পানিতে চুপচাপ ভেসে রইল দানবটা। সাদা চোখ জ্বলছে। নীচের অসীম নীল-অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। শিকার উঠে আসার অপেক্ষায়।

আচমকা পানির চাপ চমকে দিল ওটাকে। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল নীলের পটভূমিতে ওপরে আলোর দিকে কোণাকুণি উঠে যাচ্ছে কালো একটা ঝিলিমিলি। ফিরে এসেছে ছোট প্রাণীগুলোর একটা।

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেল দানবটা। অ্যাড্রেনালিনের উৎপাদন বেড়ে গেল শিরায় শিরায়, ল্যাকটিক অ্যাসিড ছড়িয়ে পড়ল পেশিতে। যতটা সম্ভব অনড় হয়ে ভেসে রইল ওটা।

আরেকটা প্রাণী পার হয়ে গেল। দানবটাকে দেখে গতি কমালেও থামল না।

তাড়া করল না দানবটা। তাতে সাবধান হয়ে গিয়ে

আগেরটার মতই পালিয়ে যেতে পারে এটাও। সুযোগের অপেক্ষায় চুপ করে রইল।

একই রকমের আরও একটা প্রাণীকে আসতে দেখল। কাছে এল ওটা। দানবটাকে দেখে কৌতূহলী হয়ে চারপাশে চক্কর দিতে লাগল।

এখনও চুপচাপ রয়েছে দানবটা। ভাবখানা এমন: কাছে চলে এসো। ভয়ের কিচ্ছু নেই। আমি মরে গেছি।

কাছে আসছে ছোট প্রাণীটা। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে। একসারি খুদে বুদবুদ বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

অপেক্ষা করছে দানবটা...আরও অপেক্ষা...একসময় মস্তিষ্কের নিউরোন কোষগুলো সিদ্ধান্ত নিল–সুযোগ এসে গেছে, কাজে লাগাও।

বিদ্যুৎ-গতিতে থাবা মারল দানবটা। নরম মাংসে বসে গেল ইস্পাতের নখ। শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

দ্বিতীয় থাবাটাও সামনে ছুটে গেল। নখগুলো শিকারের মাংসে বসে গেল।

পিছনে বাঁকা হয়ে গেল ছোট প্রাণীটা। মুখ হাঁ করে চিৎকার করতে চাইল। পানিতে শব্দ বেরোল না। মুখ থেকে বেরোনো বাতাস বুদবুদের বিস্ফোরণ সৃষ্টি করল শুধু। দেহটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ছাড়া পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। ওপর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল শত্রুকে।

দানবটা ভেবেছিল প্রাণীটা আক্রান্ত হয়ে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু তা না করে ওপরে উঠে পালাতে চাইছে। দানবটা বুঝে গেল, এ প্রাণীটার দেহে শক্তি যা-ই থাকুক না কেন, বড়ই ভীতু। তা ছাড়া শত্রুর কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতেও জানে না। পাল্টা আঘাত আসবে না বুঝে এক থাবার নখ খুলে আনল। তারপর গলায়-বুকে আঘাত হানতে শুরু করল শিকারের। অল্পক্ষণের মধ্যেই ধস্তাধস্তি বন্ধ হয়ে গেল প্রাণীটার। মাথাটা ঝুলে পড়ল।

কাটা ক্ষতগুলো থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

খাওয়া শুরু করল দানবটা। পুরু চর্বির আস্তরণে ঢাকা প্রাণীটার দেহ। পুষ্টিকর, শক্তি-উৎপাদক এই চর্বি। তাজা তেল, চর্বি ও রক্তের গন্ধে হাজির হতে শুরু করেছে অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীরা। তাদের কোনও কোনওটা বেশ বড়।

গোগ্রাসে গিলে চলল দানবটা। প্রচুর মাংস। মাংসের ছোটখাট টুকরো ছুটে যাচ্ছে মুখ থেকে। চোখের পলকে লুফে নিচ্ছে চারপাশে ভিড় করে থাকা মাংসাশী প্রাণীর দল। শিকারের গায়ে একটা শক্ত অখাদ্য জিনিস বাঁধা। টেনে ছিঁড়ে সেটাকে গা থেকে খুলে ফেলে দিল দানবটা। নীচে না পড়ে জিনিসটা উঠে গেল উপর দিকে। যাক!

ছাব্বিশ

'অন্ধকারের আর কত দেরি?' কেরি জিজ্ঞেস করল। বোটের কিনারে বসে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তিনটে সি লায়নের মাথায় হাত বুলাচ্ছে।

দিনশেষের সূর্য লম্বা ছায়া ফেলেছে সাগরের পানিতে। ফিরে তাকাল কেরি। ওর চেহারাতেও যেন সেই ছায়া দেখতে পেল রানা। চোখেমুখে উদ্বেগ আর বেদনার ছাপ।

'এক ঘণ্টা,' জবাব দিল রানা। 'তবে আপনি চাইলে সারারাত বোট নিয়ে এখানে অপেক্ষা করতে পারি আমরা। কি বলেন, বিগ?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল বিগ।

'না,' মোলায়েম স্বরে বলল কেরি, 'সারারাত থাকার দরকার নেই।'

গত দুই ঘণ্টায় তেমন কথা বলেনি ওরা। সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ লাল করে ফেলেছে কেরি। তিনটে সি লায়নকে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করেছে ভিকি, ওদের খাওয়াতে চেয়েছে; কিন্তু সাড়া দেয়নি ওগুলো; কিছু একটা গোলমাল হয়েছে বুঝে গেছে যেন।

কী ঘটেছে, মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে রানা, কিন্তু কেরিকে বলেনি। শুধু শুধু কেরির দুঃখ আরও বাড়াতে চায়নি।

উঠে দাঁড়াল ও। পশ্চিমে তাকাল। ব্লক আইল্যান্ড অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। ইঞ্জিন বন্ধ থাকলেও নোঙর না ফেলাতে ঢেউয়ের ধাক্কাতেই প্রায় দুই মাইল সরে চলে এসেছে বোট।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল বিগ।

কেরি বলল, 'ওই সাদা হাঙরটার কাজ না তো?'

থমকে গেল রানা। খোলা সাগরে, বোট থেকে দূরে কোনও ক্লান্ত সি লায়ন একটা খেপা হাঙরের খপ্পরে পড়ে প্রাণ হারানোটা স্বাভাবিক। কিন্তু কেন যেন মেনে নিতে পারছে না। কেরির কথায় মাথা ঝাঁকাল 'হতে পারে।'

ভিকি ও কেরিকে নিয়ে কেবিনে ঢুকল রানা। স্টার্টার বাটন টিপে দিয়ে সুইচ অন করল ও। জ্বলে উঠল বোটের রানিং লাইটগুলো। হাত উঁচু করে মাথার ওপরের ছাতে থাবা দিয়ে বিগকে ইঙ্গিতে বোঝাল: বোট চালান।

'লায়নগুলো কী তুলে এনেছে দেখা যাক,' কেরি বলল। 'চলুন, টেপগুলো চালিয়ে দেখি।'

বোটের মুখ পশ্চিমে ঘোরাল বিগ।

বাক্স থেকে একটা ভিডিও মনিটর বের করল কেরি। কেবিনের টেবিলে এনে রাখল। সুইচ অন করল। ভিসিআর-এর সঙ্গে সংযোগ দিল। একটা টেপ ভরল ভিসিআর-এ। রিউয়াইন্ড

বাটন টিপে ফিতেটাকে শুরুতে নিয়ে এল, তারপর 'প্লে' টিপে দিল। তাকিয়ে আছে রানা ও ভিকি।

ফাস্ট-ফরোয়ার্ড বাটনটা টিপে ধরে রাখল কেরি, টেপের শুরুতে মিনিট দুয়েক শুধু নীল সমুদ্র ছাড়া আর কিছু নেই। প্রথম তিমিটা মনিটরে ফুটতে বোতাম থেকে আঙুল সরিয়ে নিল ও।

'এত ছোট লাগছে কেন তিমিটাকে?' ভিকির প্রশ্ন।

'ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল লেন্সে তোলা হয়েছে, তাই,' কেরি বলল।

ওদের চোখের সামনে বড় হতে থাকল তিমিটা। ফ্রেম ভরে গেল।

'এটা কত দূর থেকে তোলা?' জানতে চাইল ভিকি।

'ষাট-সত্তর ফুট।'

বড় হচ্ছে ছবিটা। কাছে যাচ্ছে ক্যামেরা। তিমির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে লেন্স। ধূসর দেহ, মস্ত ডানা, তারপর মাথা। চোখটা দেখামাত্র 'পজ' বাটনটা টিপে দিল কেরি। স্থির হয়ে গেল ছবি।

'চোখটা দেখো,' ভিকিকে বলল কেরি। 'বুদ্ধিমান প্রাণী বোঝা যাচ্ছে না?'

'হাঙরের চোখের চেয়ে আলাদা,' ভিকি বলল। 'এটুকু বুঝতে পারছি।'

'অনেক বেশি ঝকঝকে। গভীরতাও বেশি,' বোঝানোর চেষ্টা করল কেরি। হাসি ফোটাল মুখে। লায়নটাকে হারানোর বেদনা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে যেন। 'কেন জানো? হাম্পব্যাকের মগজটা বাস্কেটবলের সমান। বলা হয়ে থাকে, চোখ হলো মনের আয়না। ওই চোখের মধ্যে তিমির মনের অনেকখানিই দেখতে পাচ্ছি আমি।'

আবার 'প্লে' বাটন টিপে দিল ও। নড়তে শুরু করল ছবি।

সমস্ত অ্যাঙ্গেল থেকে তিমিটার ছবি উঠেছে, বোঝা যাচ্ছে ওটার চারপাশ দিয়ে ঘুরেছে লায়নটা, ওটার সঙ্গে খেলা করেছে, ওটার চলার পথে রেখে যাওয়া জলস্রোতে সওয়ার হয়ে

এগিয়েছে। সি লায়নটাকে দেখে অস্বাভাবিক কিছু করেনি তিমিটা, গতিপথ বদলানোর চেষ্টা করেনি, আচরণের পরিবর্তন হয়নি।

আবার ফাস্ট-ফরোয়ার্ড বাটন টিপে টেপের দশ-পনেরো মিনিট দ্রুত পার করে দিল কেরি। তারপর হাত সরিয়ে আনল। মনিটরের পর্দায় ফোটা ছবির ওপরের লম্বা ঝিরঝিরে সাদা লাইন দুটো মিলিয়ে গেল। সমস্ত দেহের পেশিতে ঢেউ ছড়িয়ে দিয়ে যেন পানির গভীরে ডুব দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তিমিটা। 'স্লো' বাটন টিপল কেরি, মন্থর হয়ে গেল ছবির গতি। অন্ধকার পানিতে চলে যাওয়ায় ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে ছবি।

তিমিটাকে অনুসরণ করে অন্ধকার পানিতে ডুব দিয়েছে লায়নটা। ঘন নীল অন্ধকারে তিমিটাকে কালো একটা বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে যখন, ঠিক তখনই আচমকা ঘুরে গিয়ে ওপর দিকে উঠে গেল ক্যামেরার চোখ। বহু ওপরে সমুদ্র সমতলের আলো এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল লেন্সের ওপর।

'নামা বন্ধ করেছে,' কেরি বলল, 'আমার অনুমান, পাঁচশো ফুট নীচে নামার পর।' শেষ হয়ে গেল টেপ। ক্যাসেটটা বের করে নিয়ে আরেকটা ক্যাসেট ঢোকাল ও।

এই ক্যাসেটে ছবি তুলে এনেছে যে লায়ন, সেটা বড় একটা মাদী তিমির পিছু নিয়েছিল। ছবি যখন বড় আর স্পষ্ট হলো, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ভিকি, 'দেখুন দেখুন, একটা ছানা!'

ছানা হলেও যার-তার ছানা নয়, তিমির ছানা। বিশ ফুট লম্বা। হাম্পব্যাক-মায়ের বাঁ বুকের পাশে মস্ত ডানার নীচে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে এগোচ্ছে।

'ঠিক ওই ডানাটার কাছেই থাকে হাম্পব্যাকের ছানারা,' কেরি বলল।

'কেন?' জানতে চাইল ভিকি।

'সেটা এখনও রহস্য। দেখো, বাচ্চাটা কী করে।'

তাকিয়ে আছে ভিকি। বিস্মিত হয়ে দেখছে, মা যা করছে

ছানাটাও তা-ই করছে, সামান্যতম এদিক-ওদিক নেই। মা যখন ওপরে উঠে দম নিচ্ছে, সে-ও নিচ্ছে; মা যখন ডুব দিচ্ছে, অবিকল একই ভঙ্গিতে সে-ও ডুব দিচ্ছে, মা যখন একপাশে কাত হয়ে যাচ্ছে লায়নটার দিকে চোখ ফেরানোর জন্য, সে-ও একইভাবে কাত হয়ে লায়নটাকে দেখছে।

'তিমিটার তাকানো দেখেছ?' ভিকিকে প্রশ্ন করল কেরি। 'ছানাকে নিরাপদে রাখার, তাকে রক্ষা করার কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যাচ্ছে না মা। আশেপাশে কোন বড় হাঙর দেখা গেলে ছানাটাকে বুকের আরও কাছে নিয়ে যেত ও, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ত। হয়তো ছানাকে নিয়ে ডুবে যেত গভীর পানিতে।'

তারমানে তিমিটা উদ্বিগ্ন বা শঙ্কিত নয়। হাঙর দেখেনি। সি লায়নটাকে দেখেছে, কিন্তু ওটাকে নিয়ে তার কোন দুশ্চিন্তা নেই। পানির কয়েক ফুট নীচে থেকে ছানাটাকে নিয়ে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলেছে।

'সন্দেহ করার মত কিছু নেই,' কেরি বলল। ফাস্ট-ফরোয়ার্ড টিপে ধরে দ্রুত টেনে নিয়ে চলল টেপটা। নতুন কিছুই পাওয়া গেল না আর।

তৃতীয় ক্যাসেটটা মেশিনে ভরে প্রথম মিনিট দুয়েক ফাস্ট-ফরোয়ার্ড টিপে দ্রুত পার করে দিল ও। হেসে বলল, 'এটা রিটির।'

'কী করে বুঝলেন?' ভিকি জানতে চাইল।

'ওর মুরগীর কলজে,' স্ক্রিনের দিকে আঙুল তুলল কেরি। 'একটা তিমির পিছনে লেগেছিল। তিমিটা যেই লেজ উঁচু করে পানিতে ফেলেছে, ভয় পেয়ে ছিটকে সরে এসেছে রিটি।' সাগরের নীল পানি দেখা গেল কিছুক্ষণ। তারপর আবার আরেকটা তিমির দিকে ঘুরল ক্যামেরার চোখ। 'তিমিরা যে ওকে খেয়ে ফেলবে না, বুঝতে অনেক সময় লেগেছে রিটির। ক্ষিপ্রতাও কম।'

'বারকির ক্ষিপ্রতাও কি কম ছিল?' রানা জিজ্ঞেস করল।

কেরিকে মনে করিয়ে দিয়ে দুঃখ দিতে চায়নি ও, কিন্তু সি লায়নটার নিখোঁজ হওয়ার রহস্য ভেদ করতে হলে তথ্যগুলো ওর জানা দরকার।

দীর্ঘশ্বাস চাপল কেরি। 'ওই যে বললাম, অলস। আরও একটা বদস্বভাব আছে...মানে, ছিল...অতি কৌতূহল। নতুন কিছু দেখলে ওটা কী দেখা চাই-ই চাই, না দেখে যেন শান্তি নেই।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। মনিটরের দিকে চোখ।

রিটির তুলে আনা ছবি এক তিমি থেকে আরেক তিমির উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটা ভাল ক্লোজ-আপ রয়েছে। বহুবার ভয় পেয়েছে রিটি। ঝটকা দিয়ে ঘুরে যাওয়া ক্যামেরার চোখ, ঝাপসা নীল পানি, পানির ওপরে উঠে আসার পর তীব্র আলো, আবার পানিতে ডুব দেয়ার আগের মুহূর্তে ঢেউয়ের ঝিলিমিলি—এ সব হলো ভয় পাওয়ার লক্ষণ, ব্যাখ্যা করে বোঝাল কেরি। টেপের শেষ কয়েকটা মিনিট কোন প্রাণীর ছবি দেখা গেল না, শুধুই নীল পানি।

রানার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল কেরি, চিৎকার করে উঠল ভিকি, 'দেখুন! দেখুন!'

স্ক্রিনের দিকে ফিরল কেরি। 'কী?'

'পিছনে টানুন।'

টেপটা পিছন দিকে টেনে নিতে লাগল কেরি। কয়েক সেকেন্ড পর পলকের জন্য চোখে পড়ল জিনিসটা। স্ক্রিনে আঙুল রেখে ভিকি দেখাল, অস্পষ্ট, ঝাপসা, ঘোলাটে একটা জিনিস। স্ক্রিনের ডান পাশে, ওপর দিকে। আরও পিছনে সরে গিয়ে ফাস্ট-ব্যাকওয়ার্ড থেকে আঙুল সরিয়ে নিল কেরি। সামনে এগোতে থাকল আবার টেপ।

ঠিকমত নজর রাখাতে এবার চোখে পড়ল একটা আকৃতি। দেখা দিয়েই সরে গেল। তারপর লেন্সটা কাঁপতে কাঁপতে দ্রুত

উঠে যেতে থাকল উপরে।

'কী ওটা?' কনুইয়ে ভর রেখে মনিটরের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে রানা।

'জানি না,' কেরি বলল। 'তবে যা-ই হোক, প্রচণ্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছিল রিটিকে। বেচারা! কত দ্রুত ওপরে উঠে এসেছিল দেখলেন?'

হঠাৎ বদলে গেল ইঞ্জিনের শব্দ, কমে গেল বোটের গতি। কী হলো? ককপিট থেকে বেরিয়ে দেখতে গেল রানা। ফ্লাইং ব্রিজের দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'সামনে একটা লাল আলো মিট-মিট করছে,' বিগ জানাল। 'ইমার্জেন্সি ফ্ল্যাশারের মত লাগছে।'

বোটের কিনারে গিয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে ঝুঁকে তাকাল রানা। অন্ধকার হয়ে এসেছে। পানির রঙ এখন ইস্পাতের কালো চাদরের মত। সেই কালোর পটভূমিতে খুদে একটা লাল আলো এক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে দিয়ে জ্বলছে। ফিরে এসে একটা বোট হুক তুলে নিল ও। বিগকে জিনিসটার দিকে এগোতে বলে বুলওয়ার্কে হাঁটু ঠেকিয়ে ঝুঁকে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

বোটের পাশ দিয়ে আলোটা পার হয়ে যাওয়ার সময় বোট হুক বাড়িয়ে দিল রানা। শক্ত কোন কিছুতে লাগল। হুক দিয়ে জিনিসটাকে আটকাল। তুলে আনল ডেকে।

'ক্যামেরার হাউজিং,' বিগকে জানাল ও।

থ্রটল ঠেলে আবার গতি বাড়িয়ে দিল বিগ।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল রানা।

'বারকির!' এবার আর দীর্ঘশ্বাসটা চাপতে পারল না কেরি।

হাউজিংটা কেবিনে নিয়ে এল রানা। পানি মুছে টেবিলে রাখল। হাউজিংটা অক্ষত রয়েছে, তবে হার্নেসটা কাটা। বিষণ্ন নীরবতার মাঝে ক্যামেরা থেকে ক্যাসেটটা বের করে আনল কেরি। ভিসিআর-এ ঢুকিয়ে আগেরগুলোর মতই রিউয়াইন্ড করে

'প্লে' টিপল।

মিনিট দুয়েক নীল পানির পর প্রথম কয়েকটা মিনিট যা দেখা গেল প্রায় আগের তিনটে টেপের মতই: তিমির লং-শট, ক্লোজ-আপ, তিমির এগিয়ে চলা, তিমির ডাইভিং। কিছুক্ষণ ছবি তোলার পর পানির উপর ভেসে উঠল ক্যামেরা। লেন্সের মুখ অর্ধেক ওপরে, অর্ধেক পানিতে। ঢেউয়ের ওঠা-নামা দেখা যাচ্ছে।

'রোদ পোয়াচ্ছিল ও, ভারি হয়ে গেছে কেরির কণ্ঠস্বর। 'বলেছিলাম না, অলস।'

আবার পানিতে ডুব দিল ক্যামেরা। দুটো তিমিকে দেখা গেল। দূর থেকে। সরে যাচ্ছে। মোটামুটি পনেরো সেকেন্ড পর ওগুলোর পিছু নিল ক্যামেরা। তারপর ঘুরে গেল। নীল পানি ছাড়া আর কিছু নেই।

কেরি জানাল, 'হাল ছেড়ে দিয়েছিল।'

'কিন্তু দেখুন,' স্ক্রিনের ঠিক মাঝখানে কালো একটা বিন্দুর দিকে আঙুল তুলল ভিকি। 'আরেকটা লায়ন। ওকে অনুসরণ করে বোটে ফিরে আসছিল বারকি, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল কেরি, 'মনে হয়।'

ছবি দেখে বোঝা গেল দ্রুত ওপরে উঠেছিল বারকি, হয়তো দম ফুরিয়ে গিয়েছিল। দম নিয়ে আবার ডুব দিয়েছিল। একটা মুহূর্ত ধীরে ধীরে সাঁতরানোর পর আচমকা মোড় নিয়ে ঘুরে গিয়েছিল আরেক দিকে।

'কিছু একটা নজরে পড়েছিল ওর,' রানা বলল।

কিন্তু সীমাহীন নীলের মাঝে কোন প্রাণীই ক্যামেরার নজরে আসেনি; গতি, দিক, কোন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না আলোর প্রতিসরণের কারণে—সূর্যের আলোর রশ্মিগুলো পানিতে ঢোকার পর বেঁকে তেরছা হয়ে নেমে গেছে অন্ধকার গভীরতার দিকে। তারপর দেখা গেল অসংখ্য খুদে খুদে প্ল্যাঙ্কটন, লেন্সের সামনে দিয়ে পার হওয়ার সময় ঝিকমিক ঝিকমিক করে জ্বলছে।

'কোন কিছুকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছিল বারকি, কেরি বলল।

'তাহলে ওটাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল রানা।

'কারণ ওটার ওপরে ছিল ও, আর ক্যামেরাটা বাঁধা ছিল ওর পিঠে। ক্যামেরার চোখ ওটার ওপর পড়েনি। কৌতূহলী হয়েছিল দেখে, কিন্তু ভয় পায়নি।'

হঠাৎ পিছনে ঝাঁকি খেল ক্যামেরা, সরে গেল চোখ। নীল পানি কালো ধোঁয়ার মত জিনিসে ছেয়ে গেল।

চিৎকার করে উঠল কেরি।

দশ কি পনেরো সেকেন্ড প্রচণ্ড রকম ঝাঁকি খেতে থাকল ছবি, ডানে, বাঁয়ে, ওপরে, নীচে। ক্যামেরার চোখের সামনে কালি ঢেলে দেয়া হলো যেন, পরিষ্কার হলো, আবার ঝাপসা।

লেন্সের সামনে চকচক করে উঠল কী যেন।

'থামান তো!' রানা বলল।

স্থির হয়ে গেছে কেরি, বরফের মত জমে গেছে যেন, চোখ বড় বড়, হাঁ করা মুখে হাত চাপা দেয়া। রানার কথা কানে ঢুকছে না যেন। তারপর হঠাৎ নড়ে উঠল। সামনে ঝুঁকে ফাস্ট-ব্যাকওয়ার্ড বোতাম টিপে ধরে রাখল কয়েক সেকেন্ড। ছেড়ে দিতেই সামনে এগোল আবার টেপ।

চকচকে জিনিসটা লেন্সের এত কাছে, ঠিকমত ফোকাস হয়নি, তাই বোঝা গেল না কী ওটা।

হাত বাড়াল রানা। বোতাম টিপে এক ফ্রেম এক ফ্রেম করে এগিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। নিঃসন্দেহ হলো, চকচকে জিনিসটা নখ। কিংবা নখের মতই কোনও অস্ত্র।

সাতাশ

'আরও দাও, পারকি,' বলল জন্টি গ্র্যাহাম। শূন্য গ্লাসটা বারের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল বারটেন্ডারের দিকে। সেই সঙ্গে একটা পাঁচ ডলারের নোট। 'মেরে ফেলো আমাকে।'

'তোমাকে মেরে জেলে যাব নাকি?' জবাব দিল বারটেন্ডার পারকার। 'অনেক হয়েছে, এবার বাড়ি যাও।'

'বাড়ি যাব মানে?' অ্যাশট্রের পাশে রাখা নোটগুলো দেখাল জন্টি। 'অর্ধেক টাকাও তো খরচ হয়নি এখনও।'

'ওই দেখো, ডিনার খেতে লোক আসতে শুরু করেছে। তোমার গপ্পো শোনার আর সময় নেই আমার। দয়া করে এখন ওঠো, বাড়ি যাও, রেহাই দাও আমাকে।'

টুলের ওপর বসেই শরীরটাকে ঘুরিয়ে ফেলে ভোঁতা দৃষ্টিতে সারা ঘরে চোখ বোলাল জন্টি। ডাইনিং রুমে লাইন দিয়ে আছে মানুষ, টেবিল খালি হওয়ার অপেক্ষায়। কখন এল ওরা? ঘড়ি দেখল ও। ক্রাইস্ট! এসেছে যে তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে!

তার দুই পাশেও লোক বসে থাকতে দেখল। চিংড়ির খাঁচা তুলতে গিয়ে সাগরে যে দানব দেখেছে, পারকারকে বলছিল, লোকগুলো কি শুনেছে? শুনলে শুনুকগে! জাহান্নামে যাক সব—মনে মনে গালি দিল ও।

'কী? ওঠো! যাও!' আবার বলল বারটেন্ডার।

'না, যাব না!' মুখ খিস্তি করে গালি দিল জন্টি। 'বিনে পয়সায় তো আর খাচ্ছি না...' বলে আবার গালি দিল।

আর সহ্য করল না পারকার। বার ঘুরে এসে একটানে টুল

থেকে তুলে দাঁড় করাল জন্টিকে। বারে রাখা নোটগুলো তুলে ওর প্যান্টের পিছনের পকেটে গুঁজে দিল। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চলল দরজার দিকে।

'মাথা ঠিক হলে আবার এসো,' পারকার বলল। 'এখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যাও পাগলের ডাক্তারের কাছে। তোমার ওই দানবের গল্প ডাক্তারকে গিয়ে শোনাও।'

দরজার বাইরে জন্টিকে ঠেলে দিল ও।

পিছনে দরজার পাল্লা বন্ধ হবার আগে পারকারের কথা কানে এল জন্টির, উপস্থিত কাস্টোমারদের বলছে, 'সরি, ফোক্স্।'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে জন্টি। হতভম্ব। মৃদু টলছে এভাবে ওকে বের করে দেবে পারকার, ভাবতে পারেনি। একটা গাড়ি থেকে এক দম্পতিকে বেরোতে দেখল। ওরটালমাটাল অবস্থা দেখে অনেকটা দূর দিয়ে ঘুরে এগোল রেস্টুরেন্টের দরজার দিকে।

পা বাড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল জন্টি, দেয়াল ধরে সামলাল। তারপর রাস্তা ধরে এগোল। প্রতিটি পা ফেলার আগে কোথায় ফেলছে ভালমত দেখে নিচ্ছে।

তার কথা বিশ্বাস করেনি পারকার, পাগলের ডাক্তারের কাছে যেতে বলেছে–ভেবে তেতো হয়ে গেল জন্টির মন। কিন্তু মিথ্যে বলেনি ও। সত্যিই দানব দেখেছে। স্পষ্ট দিনের আলোয়।

আটাশ

'তোমার রানা আঙ্কেল আর ডক্টর কিনের সঙ্গে গেলে পারতে,' ওএইলার বোটটার বাউ লাইন ধরে রেখেছে বিগ। 'ডক্টর কিনের

তৈরি হতে আর আধঘণ্টা লাগবে, বড় জোর সাড়ে এগারোটা।'

'না, বাবা,' ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ভিকি। স্টিয়ারিং কনসোলের নীচে ওর ক্যামেরাটা রাখল 'না, বাবা, আগে না গেলে ভাল জায়গা পাব না।'

'তোমার তাড়াহুড়ো দেখে মনে হচ্ছে ডেটিঙে যাচ্ছ, দেরি হলেই সর্বনাশ,' হাসল বিগ।

ভ্রূকুটি করল ভিকি। 'বাবা!'

'ও-কে, ও-কে, সরি! শোনো, যেখানে নোঙর ফেলতে বলেছি, ঠিক সেখানে ফেলবে। বোটে দুটো লাইফ জ্যাকেট রইল। আর...

'বহুবার তো বলেছ! এক কথা আর কত...

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে,' হাতের দড়িটা বোটের ভিতরে ছুঁড়ে দিল বিগ।

গিয়ার দিল ভিকি। হুইল ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে লাগল ডক থেকে।

'মনে রেখো,' চেঁচিয়ে বলল বিগ, 'পথে কোথাও থামা চলবে না...কোন কিছুর জন্যেই না...যা-ই চোখে পড়ুক না কেন। সাগরে একটা ভয়ানক জিনিস আছে, কথাটা ভুলো না।'

'ভুলব না,' হাত নেড়ে চিৎকার করে জবাব দিল ভিকি। 'দেখা হবে।' বোটের নাক ঘোরাল।

চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল বিগ। ছেলেটাকে একা যেতে দেয়াটা কি ঠিক হলো? তবে আগে আগে যেতে না দিলে ভাল জায়গা পাবে না, এটাও ঠিক। ব্লেসিং অভ দ্য ফ্লিটের অনুষ্ঠান শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই।

ওয়াটারবোরোতে যাওয়ার চ্যানেলটা খুব ভালমত চিহ্নিত করা রয়েছে, পথ হারাবে না ভিকি, কিন্তু ডুবো পাথরের ছড়াছড়ি, একটু অসাবধান হলেই বোটের তলায় লেগে যেতে পারে। ইঞ্জিনেও সমস্যা নেই, থাকতে দেয় না বিগ, কিন্তু তারপরেও এই

আউটবোর্ড ইঞ্জিনগুলোকে বিশ্বাস করে না ও, যখন তখন কোন কারণ ছাড়াই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

গত তিন দিন একটানা খারাপ ছিল আবহাওয়া। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ধেয়ে এসেছে ঝোড়ো হাওয়া, বয়ে গেছে পনেরো থেকে বিশ নট গতিতে। বাড়তে বাড়তে কখনও কখনও চল্লিশেও উঠেছিল। বোট নিয়ে হাঙর কিংবা তিমি খুঁজতে বেরোনো হয়নি। জরুরি প্রয়োজনে শুধু ওয়াটারবোরোতে গেছে কয়েকবার বিগ। বাড়িতে আটকে থাকতে ভাল লাগছিল না ভিকির, সঙ্গে যেতে আবদার ধরেছে, না নিয়ে পারেনি বিগ। আজ রোদ উঠেছে। আবহাওয়াও ভাল। ব্লেসিং উৎসব জমবে। সকাল থেকেই তাই বেরোনোর জন্য অস্থির হয়ে ছিল ভিকি।

ব্লেসিং অভ দা ফ্লিট নিয়ে বিগের কোনও মাথাব্যথা নেই। তবে মিস্টার রানা ও ডক্টর কিন যাবেন অবশ্যই, এত কাছে এ রকম একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, ঠল দেখার সুযোগ হারাতে চান না, জানিয়েছেন বিগকে।

ভিকির বোটটা যতক্ষণ দেখা যায়, তাকিয়ে রইল বিগ, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। গম্ভীর হয়ে আছে। একটা কথা কোনমতেই তাড়াতে পারছে না মন থেকে–ছেলেটাকে একা যেতে দেয়াটা কি ঠিক হলো? সাগরের রহস্যময় খুনীটা এখন কোথায় কে জানে!

সি লায়নটা খুন হওয়ার পরদিন ভিডিও টেপটা নিয়ে পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিল রানা। ম্যাককুইনকে দেখিয়েছিল। সাগরের ওই খুনে প্রাণীটা কী, তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ব্লেসিং উৎসব মুলতবি রাখা যায় কিনা ভেবে দেখতে অনুরোধ করেছিল।

অনুরোধ রক্ষা তো দূরের কথা, ম্যাককুইনের রূঢ় জবাব শুনতে হয়েছে, 'বাদ দিন তো, মিস্টার রানা! গ্রীষ্মের এতবড় একটা সামাজিক উৎসব মাত্র দুই সেকেন্ডের একটা অর্থহীন ভিডিও ছবি দেখে মুলতবি রাখতে পারি না আমি। ওই মাতালটাও

অবশ্য এ রকম আষাঢ়ে গপ্পোই শুনিয়েছে।'

'কোন মাতাল?' জানতে চেয়েছে রানা।

'আরে ওই যে ওটা, জন্টি গ্র্যাহাম। গতরাতে বারে বসে গলা পর্যন্ত গিলেছে। বারটেন্ডারের কাছে গল্প করছিল, সাগরে নাকি দানব দেখেছে ও। মদ খেয়ে এতটাই মাতলামি শুরু করেছিল, ঘাড় ধরে তাকে বের করে দিতে বাধ্য হয়েছিল বারম্যান। গুজব ছড়িয়ে উৎসব পণ্ড করবে, টুরিস্টদের ভয় দেখাবে, তাই ধরে এনে হাজতে ভরে রেখেছি।'

'জন্টি এখানে?' অনুরোধের সুরে বলল রানা, 'আমি একটু কথা বলতে পারি?'

'না। ব্লেসিং শেষ হওয়ার আগে সম্ভব না। টেপটা আর কাউকে দেখিয়েছেন?'

'না।'

'গুড। তাহলে আগামী কয়েক দিনের জন্যে এটা আমার কাছেই থাক। আমি আপনার কথায় গুরুত্ব দিচ্ছি না, তা ভাববেন না, প্লিজ। তবে ব্লেসিঙের আগে আমি কিছুই করতে পারব না। ওটা শেষ হোক। পাগলামি করার জন্য পুরো গ্রীষ্মকালটাই পড়ে রয়েছে আমাদের হাতে।'

'আপনার মত এতটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারলে খুশিই হতাম আমি, চিফ,' রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিয়েছে রানা। 'বিগ আর ডক্টর কিনকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। সাগরে যে রহস্যময় কিছু একটা রয়েছে, খুন করে বেড়াচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই আমাদের।'

'আছে, থাক না। ডাঙায় উঠে এসে তো আর টুরিস্টদের কামড়াতে শুরু করবে না।' রানাকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে রসিকতা করে বলেছেন ম্যাককুইন, 'হয়তো দেখা যাবে ব্লেসিং শেষ হতে হতে আপনাআপনি দোজখে চলে গেছে, যেখান থেকে এসেছে ওটা।'

উনত্রিশ

ওয়াটারবোরো পয়েন্ট ঘুরে আসতেই সান্তাকে চোখে পড়ল ভিকির। এখনও কমপক্ষে সিকি মাইল দূরে, তবু চিনতে ভুল হলো না ওর। ছিপছিপে দেহ। পরনে নীল পোশাক। ক্লাবের নির্জন ডকে দাঁড়িয়ে রয়েছে একা।

বন্দরে জমাট বেঁধে থাকা সেইলবোটগুলোর জন্য ভিকিকে এখনও দেখেনি সান্তা। ব্লেসিং অভ ফ্লিটের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বোটগুলোর ডেকে বসানো রঙিন খুঁটিতে রামধনু রঙের লম্বা সরু পতাকা উড়ছে। এককালের কিছু রণতরী যেগুলোকে এখন ফিশি বোট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, অতি পুরনো সেই বোটগুলোরও জাল, মাস্তুল, রেডার ডৌম ও মস্ত উইঞ্চ-ড্রামের ভিড়ের মধ্য থেকে বেমানানভাবে উঁকি দিয়ে আছে উজ্জ্বল রঙের পতাকার খুঁটি। মাথায় উড়ছে পতাকা।

শেষ বড় বোটটা পেরিয়ে এল ভিকি। ডকটা এখন একশো ফুট দূরে। নোঙর করে রাখা ক্লাবের বোটগুলোর ফাঁক দিয়ে সাবধানে এগোল। হাত নাড়ল সান্তার উদ্দেশ্যে এতক্ষণে দেখতে পেল মেয়েটা। হাসি ফুটল মুখে একটা হাত ওপরে তুলল।

ফ্লোটিং ডকের কাছে পৌঁছে গেল ভিকি। বোট বাঁধার জায়গা খুঁজছে। একটা শূন্য স্লিপ খুঁজে পেয়ে তাতে ঢুকিয়ে দিল বোট। ইঞ্জিন বন্ধ করল। বোটের দড়িটা ছুঁড়ে দিল সান্তার দিকে।

'হ্যাল্লো!' ভিকিকে চওড়া হাসি উপহার দিল সান্তা।

'হাই!' জবাব দিল ভিকি। জানে ওর ঠোঁট নড়ানো দেখেই সান্তা বুঝে যাবে ও কী বলেছে। পিছন ফিরে ইঞ্জিনটা পানি থেকে তুলে ফেলল ভিকি। ওই অবস্থায় রেখেই লক করল, যাতে নেমে না যায়।

গত কয়েকদিন আবহাওয়া খারাপ ছিল যখন, বাবার সঙ্গে শহরে এসে সান্তাদের বাড়ি খুঁজে বের করেছিল ভিকি। বন্ধুত্ব হতে দেরি হয়নি। কানে শোনে না সান্তা। তাই বোবা মানুষদের সঙ্গে কথা বলার মত ওর সঙ্গে ইশারায় কথা বলতে হয়। জটিল কোন কথা হলে, ইশারায় যেটা বুঝতে পারে না ভিকি, কাগজ-কলম বাড়িয়ে দেয়। লিখে বোঝাতে হয়। যারা ওর সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাদের সুবিধের জন্য নিজের গলায় চেন দিয়ে একটা বলপয়েন্ট কলম ঝুলিয়ে রাখে সান্তা। পকেটে নোটবুক।

সান্তা জানিয়েছে ভিকিকে, জন্ম থেকে বধির ছিল না ও। কয়েক বছর আগে প্রচণ্ড টাইফয়েড জ্বর ওর কান নষ্ট করে দিয়েছে। এতটাই নষ্ট, হিয়ারিং এইড কানে লাগিয়েও শোনে না।

ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে ডকে লাফিয়ে নামল ভিকি। ইশারায় জিজ্ঞেস করল, 'কোন্‌দিকে যেতে হবে?'

ভিকির হাত ধরে তাকে পৌরসভা বিল্ডিঙের দিকে টেনে নিয়ে চলল সান্তা। ওয়াটারবোরো শহরে জন্মেছে ও, তাই ভিকির চেয়ে অনেক বেশি চেনে শহরটা। ভিকি জন্মেছে নিউ ইয়র্কে—ওর বাবা তখন চাকরি করত সেখানে। মা মারা যাওয়ার পর ওর বাবা চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে ফুফুর কাছে, শুরু করেছে মাছের ব্যবসা। পা খালি সান্তার, জুতো-স্যান্ডেল কিছু পরেনি—কোন সময়ই পরতে দেখে না ভিকি। খালি পায়েই নুড়িপাথর কিংবা খোয়ার ওপর দিয়ে হেঁটে যায় নির্বিকার চিত্তে, ব্যথা পায় না। ভিকি জানতে চেয়েছিল, পরে না কেন? সান্তা জবাব দিয়েছে, খালিপায়ে থাকতেই ওর ভাল লাগে।

বিচ স্ট্রিটের গোড়ায় বোট স্টোরেজ ইয়ার্ডে জমায়েত হতে

আরম্ভ করেছে হাইস্কুল ব্যান্ড। বিচিত্র পোশাক পরা ড্রামবাদক ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের সুর প্র্যাকটিস করছে ওরা। একটা মেয়ের কাঁধে লম্বা একটা বাদ্যযন্ত্র তুলে দিচ্ছে দুটো ছেলে। মাছির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ধূসর রঙের একটা বুড়ো কুকুর রাস্তার কিনারে ধুলোয় বসে তারস্বরে চেঁচিয়ে নালিশ জানাচ্ছে। কিন্তু কান দিচ্ছে না কেউ।

ব্যান্ড দলের পিছনে একে একে হাজির হচ্ছে ম্যাসন, এল্‌ক্‌ ও রোটারিয়ানরা। রঙ-ঝলমলে পর্তুগিজ পোশাক পরা হোলি গোস্ট সোসাইটির সদস্যরাও হাজির হতে শুরু করেছে। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ফেলে দিচ্ছে তাদের কেউ কেউ, হাত মেলাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে। বড় বড় বোতলে ভরা মদ ভাগাভাগি করে পান করছে।

রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শত শত লোক গায়ে গায়ে লেগে সেই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে সেট্‌লারস স্কয়্যারের গির্জার দিকে। গির্জা থেকে বিশপ বেরিয়ে এসে মিছিলকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাবেন শহরের ভিতর দিয়ে ডকের কাছে। সেখানেই হবে ব্লেসিং উৎসবের মূল অনুষ্ঠান।

ভিকিকে নিয়ে মিছিলের পাশ কেটে বেরিয়ে এল সান্তা, স্কয়্যার পেরিয়ে ওক স্ট্রিটে পৌঁছল। এখানে এত ভিড়, সাইডওয়াকও ভরে গেছে। ছোট ছেলেমেয়েরা গাড়ির হুডে বসে আছে, গাছে চড়েছে টিনএজাররা।

দাঁড়িয়ে গেল ভিকি। ভিড়ের দিকে দেখিয়ে সান্তাকে ইশারায় বোঝাল, 'কিছুই তো দেখতে পারব না আমরা।'

'আমার ওপর ভরসা রাখো,' বলে ভিকিকে আবার টেনে নিয়ে চলল সান্তা।

এক কোণে একটা গুদাম। ভিকিকে ঠলর দিকে নিয়ে চলল সান্তা। পিছন দিকে এসে গেট খুলে উঠান পার করিয়ে আনল অন্যপাশের বেড়ার নীচে মাটিতে একটা খোড়ল দেখাল, কুকুরে

খুঁড়েছে। ওটার কাছে এসে নির্দ্বিধায় ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ও, খোড়লে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে শরীরটাকে মুচড়ে চলে গেল অন্যপাশে। ভিকি অনুসরণ করল ওকে। উঠে দাঁড়াল। একটা চত্বরে বেরিয়ে এসেছে ওরা, ওপাশের বাড়িটা এক সময় গির্জা ছিল, এখন বসতবাড়ি। বাড়ির ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া টাওয়ারটা কখনও ছিল ঘণ্টা-ঘর, কখনও বা ক্লক টাওয়ার।

দুপদাপ পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির সামনের বারান্দায় উঠে বিশাল একটা দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সান্তা। ভিকিকে কাছে আসতে ইশারা করল। হাঁটু গেড়ে বসে দুই হাতের আঙুলে আঙুল ঢুকিয়ে দিল। 'এরকম করে ধাপ তৈরি করো, যাতে আমি উঠে দাঁড়াতে পারি।'

'লাভ কী...' ইশারায় জিজ্ঞেস করতে গেল ভিকি।

বাধা দিয়ে বলল সান্তা, 'আমার ভার রাখতে পারবে না?'

মাথা ঝাঁকাল ভিকি।

'তাহলে যা বলছি করো।'

শ্রাগ করল ভিকি। বসে পড়ল সান্তার মত করে। দুই হাত দিয়ে ধাপ তৈরি করল

নির্দ্বিধায় সেই ধাপে পা রেখে উঠে দাঁড়াল সান্তা। ভিকির মাথায় এক হাত রেখে আরেক হাত লম্বা করে দিল ওপর দিকে। দরজার মাথায় কাঠ দিয়ে তৈরি ছোট একটা তাক। সেখানে হাতড়াতে লাগল ও। যা খুঁজছে পেয়ে গেল। লাফ দিয়ে নেমে এল। হাসিমুখে ভিকির দিকে বাড়িয়ে ধরল ছড়ানো হাতের তালু, 'দেখো, চাবি।'

'ওটা ওখানে আছে, তুমি জানলে কী করে?' বলল ভিকি। ওর ঠোঁট নড়া দেখেই বুঝে গেল সান্তা কী বলেছে। জবাব দিল, 'এটা আমার কাজিনদের বাড়ি।'

চাবি দিয়ে দরজা খুলল সান্তা। আগে ভিকিকে ঢুকতে দিল, তারপর নিজে ঢুকল। ভিতর থেকে দরজাটা আবার লাগিয়ে

তালায় চাবি দিয়ে দিল। ভিকিকে নিয়ে এগোল বাঁ দিকে। একটা দরজা দিয়ে বেরিয়েই টাওয়ারে ওঠার ঘোরানো সিঁড়ি পাওয়া গেল। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল দুজনে। অনন্তকাল ধরে যেন উঠে চলেছে--মনে হচ্ছে ভিকির। অবশেষে সামনে একটা দরজা দেখা গেল। ঠেল দিয়ে সরু একটা ওয়াকওয়েতে ঢুকল দুজনে।

'ওয়াও!' নীচে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল ভিকি।

অনেক ওপরে রয়েছে ওরা। পৌরসভা বিল্ডিংটা যেন বাস্তব নয়, ছবি। চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার চোখে পড়ছে। পুবে ন্যারাগ্যানসেট বে ও ন্যাপাট্রি পয়েন্ট ছাড়িয়ে আরও দূরে দেখা যাচ্ছে সবজে-ধূসর দুটো আকৃতি--অসপ্রি আইল্যান্ড ও ব্লক আইল্যান্ড। দক্ষিণে সেইলবোট ও সমুদ্রগামী বড় বড় ফ্রেইটার জাহাজগুলো যেন নিচু দ্বীপ মনট্যাউক পয়েন্টের পটভূমিতে ফ্রেমে আটকানো ছবি। পশ্চিমে মিস্টিক ও স্টনিংটন শহরকে লাগছে আবছা ছায়ার মত। উত্তরে রোড আইল্যান্ডের দিকে যাওয়া মহাসড়কটা যেন এঁকেবেঁকে পড়ে থাকা একটা ফিতে।

'দারুণ, তাই না?' জিজ্ঞেস করল সান্তা।

মাথা ঝাঁকাল ভিকি। ক্যামেরাটা তুলে ধরল। ছবি নেয়ার মত দৃশ্যের অভাব নেই। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা তুলবে সিদ্ধান্ত নেয়াই কঠিন।

বহু নীচে শোনা যাচ্ছে ব্যান্ড দলের সমবেত কণ্ঠ, 'দ্য স্টারস অ্যান্ড স্ট্রাইপস ফরএভার'। সেই সঙ্গে জনতার চিৎকার।

লেন্স জুম করে বিশপ, ড্রাম বাদক আর ব্যান্ড দলের ছবি নিল ভিকি। সটাসট শাটার টিপে ফিল্মের গায়ে অনড় করে দিল হোলি গোস্ট, এল্‌ক্‌ ও রোটারিয়ানদের

হঠাৎই যেন কুচকাওয়াজ করতে থাকা দলটা তাদের পাশে চলে এল, পয়েন্টের দিকে এগোচ্ছে। ভিকির হাত ধরে টান দিল সান্তা। সিঁড়ি বেয়ে টাওয়ার থেকে নেমে এল দুজনে। দরজার অন্যপাশে এসে পাল্লা লাগিয়ে ভিকির হাতে চড়ে চাবিটা তাকে

রেখে দিল সান্তা। ভিকিকে পথ দেখিয়ে কানাগলির এক গোলকধাঁধার মধ্যে নিয়ে এল ও। সেসব রাস্তা ধরে প্রায় ছুটে চলল।

পয়েন্টের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। বাড়ছে হট্টগোলের শব্দ। বাতাস আঁকড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে ভাজা চর্বির সুগন্ধ।

একদিকে পেন্সিলের মাথার মত ক্রমশ সরু হয়ে গেছে ওয়াটারবোরো শহর। ফিশার আইল্যান্ড সাউন্ডের দিকে মুখ করে থাকা খোয়া বিছানো একটা পার্কিং লট আছে ওখানে সাধারণ সময়ে দিনের বেলা বেড়াতে আসা মানুষের ভিড় থাকে জায়গাটায়, রাতে আসে টিনএজাররা রেসিঙের দিনে পিকআপ ট্রাক, মিনিভ্যান আর ওয়াগনে ভরে গেছে। ওগুলোতে পসরা সাজিয়ে বসেছে ফেরিওয়ালারা। টি-শার্ট থেকে শুরু করে মগ, বোতাম, পোস্টার, জাহাজের পতাকা ও মাছ-মাংসের যত ধরনের খাবার তৈরি করা সম্ভব—ভাজা, সেদ্ধ, ঝলসানো, গ্রিল করা, জমাট বাঁধা, কাঁচা ও জ্যান্ত, সব আছে। কাঠিতে গেঁথে কিংবা ঠোঙায় ভরে সরবরাহ করা হচ্ছে সেসব খাবার। সেই সঙ্গে ন্যাপকিনে কিংবা খবরের কাগজে মোড়ানো রুটি।

পার্কিং লটের একপাশে একটা ভাঙা বেড়ার ধারে রোদে শুয়ে ঝিমোচ্ছে যেন শহরের একমাত্র পাবলিক বিচটা, সরু এক চিলতে বালিতে ঢাকা জায়গা, বন্দরের দিকে মুখ করা।

দিনটা চমৎকার। তাপমাত্রা বেড়ে ইতিমধ্যেই বেশ গরম হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। প্রায় নির্জন ছোট্ট সৈকতে বসে আছে নীল রঙের গার্লস সোয়েটশার্ট পরা একটা মেয়ে। বেবি-সিটিঙের কাজ করছে হাতে 'পিপল' ম্যাগাজিনের একটা কপি পানির কিনারে ঝিনুক কুড়াচ্ছে দুই বছরের একটা বাচ্চা। অন্যপাশে বেশ কিছুটা দূরে বন্দরে পানির মাঝখানে নোঙর করা রয়েছে অসংখ্য সেইলবোট। সেগুলো থেকে টাউন ডকে লঞ্চ যাতায়াত করছে যাত্রী নিয়ে। বোটের পাশ কাটানোর সময় প্রপেলারের ঢেউয়ে

বিচিত্র ভঙ্গিতে ওঠানামা করে যেন মাথা দুলিয়ে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' করছে বেঁধে রাখা সেইলবোটগুলো।

প্যারেড আসার অপেক্ষায় রয়েছে জনতা। ভিড়ের মধ্য দিয়ে সান্তার পিছন পিছন এগিয়ে চলল ভিকি। লোকের হই-চই হাঁকডাক। সরগরম হয়ে আছে ফেরিওয়ালাদের বাজার। ফোল্ডিং টেবিলে স্তূপ করে রাখা নানারকম খাবারের সুগন্ধ লোভ জাগাচ্ছে তার। অথচ মাত্র দু'ঘণ্টা আগে ভরপেট নাস্তা খেয়েছে।

একটা ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল ও। টাকা বের করতে পকেটে হাত ঢোকাল। ফোলা ফোলা সসেজ ও তেলে ভাজা পিঠে বিক্রি হচ্ছে ওখানে।

ওর সামনে মানুষজনের ভিতর দিয়ে পথ করে এগোনোর সময় হঠাৎ করেই সান্তার মনে হলো, ভিকি আসছে না। ফিরে তাকাল। ভিকির হাসিমুখ নজরে পড়ল, কেমন বোকা বোকা দেখাল হাসিটা। সসেজ স্যান্ডউইচ খেতে খেতে আসছে। দুই কষায় লেগে গেছে লাল রঙের আঠালো সস। একটা প্যাকেট সান্তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

মাথা নাড়ল সান্তা। 'ওগুলো তো বিষ। পচা চর্বি দিয়ে মরা গরুর বাসি মাংস ভেজে দিয়েছে।'

সান্তার নোটবুকে কিছু লিখে দিয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে রইল ভিকি। পড়ল সান্তা। ভিকি লিখেছে: কিন্তু সবাই তো খাচ্ছে, কাউকে তো মরতে দেখছি না!'

তিরিশ

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সাঁতরে বেড়াচ্ছে দানবটা। দ্বিধান্বিত বিরক্ত

ক্ষুধার্ত, অস্থির। শৈবালভরা অগভীর ঘোলা পানিতে ভাল দেখতে পাচ্ছে না। মগজে এসে আঘাত হানছে প্রচুর শব্দ আর সঙ্কেত, কিন্তু কোনটাকেই আশাব্যঞ্জক কিছু মনে হচ্ছে না।

কিছু সঙ্কেতকে 'হুমকি' মনে হচ্ছে। যদিও ভয় বলে কিছু নেই ওটার, তবু এ ধরনের সঙ্কেতকে মগজে ধরে রাখার জন্য প্রোগ্রামিং করে দেয়া হয়েছে ওটাকে, যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন পড়লে এগুলোকে প্রতিরোধ করতে পারে, এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, কিংবা এড়িয়ে চলতে পারে।

শরীরের শক্তি প্রায় নিঃশেষিত। গভীর সাগরে মোটাসোটা, চর্বিদার সেই নরম প্রাণীটাকে খাওয়ার পর গত কদিন আর কোনও শিকার ধরতে পারেনি।

তীরের কাছে খোঁজাখুঁজি করেছে। তীর থেকে বহুদূরে সরে গিয়ে বালিতে ঢাকা সমুদ্রতল ও বড় বড় পাথরের ফাঁকফোকরেও খুঁজেছে। ওসব জায়গার সমস্ত প্রাণী উধাও হয়ে গেছে, দানবটার ভয়ে। ছোট প্রাণীগুলোও আর পানিতে নামছে না, যে ধরনের প্রাণী শেষ খেয়েছে ওটা। ডাঙা থেকে আসা সহজ সেই দুর্বল সাঁতারু প্রাণীগুলোরও দেখা নেই।

হঠাৎ টের পেল কাছেই রয়েছে খাবার। মাংসের সুগন্ধে ভারি হয়ে রয়েছে পানি।

ধীরে, খুব সাবধানে, পায়ের পাতা নেড়ে এগিয়ে চলল ওটা। মাথা তুলল পানির ওপর।

খাবারের সুগন্ধ খিদের আগুন উস্কে দিচ্ছে। পাচকরসে ভরে উঠছে পাকস্থলী।

ঘোলাটে পানি থেকে ভেসে উঠে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এখন। অসংখ্য! সেই দুর্বল জীবন্ত প্রাণীগুলো এক জায়গায় জড় হয়ে কী যেন করছে। বাতাসে ছড়াচ্ছে লোভনীয় সুগন্ধ। অ্যাড্রিনালিনের উৎপাদন বেড়ে গেল দানবটার দেহের ভিতর, শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ে শক্তি তৈরি করতে লাগল।

শিকার ধরার জন্য ছুটতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করল। সংখ্যায় অনেক বেশি ওরা, নিরাপদ পানির জগৎ থেকে অনেকটা দূরে। বুঝতে পারছে, ওগুলোকে ধরে খেতে গেলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না।

জড় হয়ে থাকা প্রাণীগুলো থেকে কিছুটা দূরে একই রকম আরও দুটো প্রাণী চোখে পড়ল তার। একটা বড়, আরেকটা অনেক ছোট। দানবটার নিরাপদ জগতের কাছাকাছি। পানি ছেড়ে একটু উপরে উঠলেই ধরতে পারে ওগুলোকে।

একত্রিশ

মোড় নিয়ে পয়েন্টে ঢুকল প্যারেড। পার্কিং লটের সামনে। ব্যান্ড বাদকদের কেউ কেউ লাইন ভেঙে সরে গিয়ে জনতার মধ্যে দাঁড়ানো বন্ধুদের হাত থেকে সোডার ক্যান কেড়ে নিচ্ছে। খাবার নিচ্ছে। একজন তো ছোঁ মেরে জ্বলন্ত সিগারেটের মত নিষিদ্ধ জিনিস নিতেও দ্বিধা করল না। তবে বিশপ দেখে ফেলার আগেই দু'তিন টান দিয়ে সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভাল।

একনাগাড়ে ছবি তুলে যাচ্ছে ভিকি। পাইরেট স্মোকারের ছবি তোলার জন্য শাটার টিপতেই ক্যামেরার ভিতরে ঝিরঝির শব্দ শুনতে পেল, রিউয়াইন্ড হচ্ছে ফিল্ম। চোখের সামনে নিয়ে এসে দেখল। 'জিরো'তে এসে থেমে গেল নম্বর। বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল ও, 'ধূর!'

কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল সান্তা, ভুরু

নাচাল। 'কী হলো?'

নোটবুকে লিখে দিল ভিকি: ফিল্ম শেষ। দোকানপাট সব বন্ধ। আজকের মত ছবি তোলা খতম।

'আমার কাছে আছে। বাড়িতে। তুমি থাকো এখানে। আমি যাব আর আসব,' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভিড়ের ভিতর দিয়ে প্রায় ছুটতে আরম্ভ করল সান্তা।

আর মাত্র মিনিট দুয়েক লাগল প্যারেডের শেষ দলের মাথাটা কাছে আসতে। পুরো সারিটা পয়েন্ট ঘুরে এগিয়ে চলল বিচ স্ট্রিট ধরে কমার্শিয়াল ডকের দিকে।

তাড়াহুড়া করে দোকান গুছিয়ে নিল ফেরিওয়ালারা। আগুনে পানি ঢালল। আবর্জনা ব্যাগে ভরল। সেসব গাড়িতে ভরে দ্রুত সরে গিয়ে পার্কিং লট খালি করে দিতে লাগল। পৌরসভার অন্যপাশে গিয়ে আবার দোকান খুলে বসতে হবে।

একজন ফেরিওয়ালার কাছ থেকে একটা ক্যান্ডি অ্যাপল কিনল ভিকি।

পাবলিক বিচ ঘেরা ভাঙা বেড়ার পাশ দিয়ে হাঁটার সময় ভিতরে চোখ পড়তে দেখল তারের জালের গায়ে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা দুই বছরের বাচ্চা। হাতে-মুখে ময়লা লাগা, বালিতে মাখামাখি। এক নিতম্বের ওপর কোনমতে আটকে ঝুলে রয়েছে ময়লা লাগা ডায়াপারটা। বাচ্চাটার পিছনে বালিতে শুয়ে আছে একটা টিনএজ মেয়ে, ম্যাগাজিন পড়ছে।

ছোট ছোট আঙুল দিয়ে বেড়ার জাল আঁকড়ে রেখেছে বাচ্চাটা। চোখ বড় বড় করে ভিকিকে দেখছে।

এগিয়ে গেল ভিকি। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে হাতের ক্যান্ডিটা বাড়িয়ে দিল বাচ্চাটার দিকে। হাসিমুখে আদরের সুরে বলল, 'নেবে, বাবু?...নাও।'

হাসল বাচ্চাটা। দুই হাত দিয়ে ক্যান্ডিটা ধরল। জাল ছেড়ে দিয়েছে। আস্ত ক্যান্ডিটা একবারে মুখে পোরার চেষ্টা করতে গিয়ে

টলমল করে উঠল। সামলাতে পারল না। পড়ে গেল। হাত থেকে ছুটে গেল ক্যান্ডিটা। বালিতে এক গড়ান দিয়ে সোজা হয়ে বসেই ক্যান্ডিটা তুলে বালি সহই চাটতে আরম্ভ করল। খুশিতে অস্থির। ইঁ-ইঁ ইঁ-ইঁ শব্দ করছে।

হাসল ভিকি। ঘুরে দাঁড়াল।

ফেরিওয়ালাদের শেষ ট্রাকটাও পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে গেলে সেখানে ঢুকল হোলি গোস্ট সোসাইটির দুজন ভলান্টিয়ার। পার্কিং লটের আবর্জনা পরিষ্কার করতে লাগল। সিগারেটের গোড়া, কাগজের কাপ, খাবারের এঁটো হাড়-কাঁটা, স্যান্ডউইচ ও হটডগের টুকরো, ভাজতে গিয়ে পুড়ে যাওয়া সসেজ, ডিম ও সবজির খোসা, স্কুইড আর অক্টোপাসের শুঁড়ের টুকরো, মুরগীর কাটা পাখা, নাড়ীভুঁড়ি, ছাই ইত্যাদিতে ভর্তি হয়ে আছে খোয়া বিছানো জায়গাটা। অলিভ অয়েল, সালাদের উপকরণ ও ভাজা চর্বির মিশ্র গন্ধে বাতাস ভারি।

দস্তানা পরেছে ভলান্টিয়াররা। বেলচা দিয়ে আবর্জনা তুলে প্লাস্টিক বিনে ভরতে লাগল।

'মানুষ আসলে শুয়োরের চেয়েও নোংরা,' বিড়বিড় করল একজন। 'জায়গাটাকে কী বানিয়েছে দেখো, কসাইখানা এরচে' ভাল।'

'লাশকাটা ঘরের পচা দুর্গন্ধের চেয়েও খারাপ,' জবাব দিল দ্বিতীয়জন।

পঞ্চাশ গ্যালনের তিনটে বড় বড় পিপে এনে রাখা হয়েছে পার্কিং লটের কিনারে, আবর্জনা ভরার জন্য। বিন ভর্তি করে নিয়ে গিয়ে পিপেতে ফেলতে লাগল ভলান্টিয়াররা। ভরে গেল একটা পিপে। বাকি দুটো ভরতেও সময় লাগল না।

'গেল তো ভরে...এখন কী করব?' একজনের প্রশ্ন।

হাত তুলে সৈকতে পড়ে থাকা একটা পিপে দেখাল অন্যজন।

কোনও বোট থেকে পড়ে গিয়েছিল হয়তো, ভেসে এসে সৈকতে ঠেকেছে। 'ওটাতে ভরা যেতে পারে।'

শ্রাগ করল সহকর্মী। 'হুঁ। একটায় ভরলেই হলো।'

আবর্জনা ভরা প্লাস্টিকের বিন হাতে বেড়ার দিকে এগোল দুজনে। গেট খুলে চলে এল অন্যপাশের নরম বালি ঢাকা সৈকতে।

পিপেটা খালি। কাত হয়ে পড়ে আছে। সোজা করে বসিয়ে তাতে বিনের আবর্জনা ঢালল দুজনে। কাছেই একটা বাচ্চাকে বসে ক্যান্ডি চুষতে দেখল। ওর ডাইআপারে আটকে যাওয়া পায়খানা-পেসাবের দুর্গন্ধ আবর্জনার গন্ধ ছাপিয়ে ওদের নাকে আসতে লাগল।

দশ গজ দূরে একটা মেয়ে বালিতে চিত হয়ে শুয়ে আছে। মুখের সামনে ম্যাগাজিন তুলে রাখায় চেহারা দেখা যাচ্ছে না।

'এই!' গলা চড়িয়ে ডাক দিল একজন ভলান্টিয়ার। 'আপনি এই বাচ্চাটার মা?'

ম্যাগাজিন সরাল মেয়েটা। 'মা হতে বহু দেরি আছে আমার।'

'ডায়াপার বদলাতে জানো না?' টিনএজার দেখে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এল লোকটা।

'আপনাকে কে পাঠিয়েছে মাতব্বরি করতে!' রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটা।

আহত হয়ে ভুরু কুঁচকে ফেলল লোকটা। রাগত ভঙ্গিতে পা বাড়াল। 'চড়িয়ে দাঁত ফেলে দেব!'

হাত ধরে টেনে থামাল ওর সঙ্গী। 'আহ্, ছাড়ো না, লেনি। হেগেমুতে ডায়াপার ভরালে আমাদের কী? মেয়েটার গায়ে হাত তুললে ও দেবে নালিশ করে, আমাদের নিয়ে হাজতে ভরবে পুলিশ।

'শয়তান মেয়ে!' বিড়বিড় করল রেগে যাওয়া লোকটা।

'তুমি শয়তান!' ম্যাগাজিন দিয়ে মুখ আড়াল করল আবার

মেয়েটা।

লেনির হাত ধরে টানল ওর সঙ্গী। 'এসো।'

আরও দুই দফা বিন ভর্তি করে সৈকতের পিপেটায় ঢালল ওরা। ওভাবেই রেখে দিল। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি এসে নিয়ে যাবে।

বেলচা কাঁধে বাড়ি রওনা হলো দুজনে। হাতমুখ ধুয়ে ড্রিংক নিয়ে বসবে। মদের জন্য আঁইঢাঁই করছে প্রাণটা।

বত্রিশ

উপুড় হয়ে অগভীর পানিতে পড়ে আছে দানবটা। পানির ওপরে জাগিয়ে রেখেছে শুধু নাক আর চোখ দুটো।

বেশির ভাগ জ্যান্ত প্রাণীই চলে গেছে। অস্বস্তিকর যে সব হই-হট্টগোল ধরা পড়ছিল ওর কানে, কমে আসছে সেগুলো, দূরে সরে যাচ্ছে। দুটো মাত্র জ্যান্ত প্রাণী রয়ে গেছে এখনও। ওগুলোকে বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না দানবটার কাছে।

লোভনীয় 'দুর্গন্ধ'গুলো রয়ে গেছে এখনও, আগের চেয়েও ভারি এখন। মাংসের গন্ধ। খুব কাছ থেকে আসছে। সিদ্ধান্তহীনতার জটিলতা থেকে মুক্তি পায়নি এখনও মগজ। বুঝতে পারছে না কোনটাকে প্রাধান্য দেবে—লোভ না বিপদ?

লোভকেই প্রাধান্য দিল অবশেষে। খিদেকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। ধারাল নখ বালিতে বিঁধিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে নিজের দেহটাকে সামনে টেনে নিয়ে চলল। দ্রুত খুলছে-বন্ধ হচ্ছে ওটার ফুলকো। ভয়ানক গতিতে পাম্প করে চলেছে। বাতাসের

অক্সিজেন সহ্য করতে পারছে না ওটার ফুসফুস। রক্ত দূষিত হয়ে দুর্বল করে দিচ্ছে দেহ।

জ্যান্ত প্রাণী দুটো থেকে অল্প দূরে ফেলে রাখা হয়েছে একটা অচেনা জিনিস। তীব্র দুর্গন্ধ আসছে সেটা থেকে। তাতে মিশে রয়েছে মাংসের গন্ধ। তারমানে খাবার।

শক্তিশালী বাহুতে ভর দিয়ে দেহটাকে উঁচু করল দানবটা। স্প্রিঙের মত লাফ দিল সামনে।

তেত্রিশ

ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা। বেবি-সিটিঙের সময় ঘুমানো নিষেধ। সাগরের এত কিনারে দুই বছরের একটা বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়েছে, নজর না রাখলে যে-কোনও মুহূর্তে মারাত্মক বিপদ ঘটে যেতে পারে।

তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল ওর। ঝটকা দিয়ে উঠে বসল। ঝাঁকি লেগে মুখের ওপর থেকে ম্যাগাজিনটা পড়ে গেল। জেরেমির দিকে তাকাল ও।

কাঁদছে বাচ্চাটা। মাথা পিছনে হেলানো। সাধারণত কাঁদে না ও। খুব হাসিখুশি। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছে। কিংবা ব্যথা পেয়েছে। রোদে তেতে থাকা পাথরের ওপর বসে পড়ে চামড়ায় ছ্যাঁকা খাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। নাকি ধারালো কোনও কিছু ধরে হাত কাটল?

উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। বাচ্চাটার কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো? কাঁদছ কেন? ব্যথা পেয়েছ?'

আরও জোরে চিৎকার করতে লাগল বাচ্চাটা।

'জেরেমি, কী হয়েছে? কোথায় ব্যথা?' আবার জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

দুই হাত উঁচু করল বাচ্চাটা, ওকে কোলে নিতে বলছে। অবাক হলো মেয়েটা। কখনও এ রকম করে না জেরেমি, কোলে নিতে বলে না। বরং কোল থেকে নেমে যেতে অস্থির হয়। ও যেমন দেখতে পারে না জেরেমিকে, জেরেমিও তেমনি দেখতে পারে না ওকে । তবে দুজনেই দুজনকে মেনে নিয়েছে বাধ্য হয়ে।

'পারব না!' জোরে মাথা নেড়ে মুখ ঝামটা দিল মেয়েটা। 'হেগেমুতে তো একাকার করেছ! আমার কাপড়ে গু লাগিয়ে দেবে।'

দুই হাত আরও উঁচু করে তাকে তুলে নেয়ার জন্য কাঁদতে থাকল বাচ্চাটা।

চারপাশে তাকাল মেয়েটা। কেউ ওদের লক্ষ করছে কিনা দেখল। বাচ্চাটাকে ধমকাচ্ছে ও, সেটা কেউ দেখে বাচ্চার মাকে বলে দিলে চাকরি যাবে। কেউ নেই। বলল, 'কী হয়েছে? ও, বুঝেছি, পায়খানার রাস্তায় ঘা। হবেই তো। এত হাগতে থাকলে ঘা হবে না?'

ডায়াপার খুলল না মেয়েটা।

চেঁচিয়ে চলেছে জেরেমি।

'আহ্, থামবে তুমি!' বিরক্তকণ্ঠে বলল মেয়েটা। কোনভাবেই বাচ্চাটার কান্না থামাতে না পেরে শেষে ঝুঁকে, বাচ্চাটার দুই বগলের নীচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ওকে তুলে উঁচু করে ধরল। নিজের দেহ থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখল। এগিয়ে চলল পানির দিকে।

মোচড়ামুচড়ি করছে জেরেমি। মেয়েটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। যতই পানির কাছে যাচ্ছে, চিৎকার বাড়ছে আরও। যেন বোঝাতে চাইছে যে জিনিসটা ওকে ভয় দেখিয়েছে, সেটা রয়েছে

ওই পানিতেই।

বুঝল না মেয়েটা। ঝাঁকি দিয়ে ধমক দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছে। হাতে ব্যথা পাচ্ছে বাচ্চাটা।

হাঁটুপানিতে নেমে গেল মেয়েটা। বালির উপর দাঁড় করিয়ে দিল বাচ্চাটাকে। জেরেমির ওখানে কোমরপানি। ডায়াপারের স্ট্রিপ টান দিয়ে খুলল মেয়েটা। ছেড়ে দিতেই ভেসে চলে গেল ডায়াপারটা। বাচ্চাটাকে ঝুলিয়ে ধরে পানিতে এদিক ওদিক নেড়ে গায়ে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কারের চেষ্টা করল।

মিনিটখানেক ধুয়ে পানি থেকে তুলে নিল ওকে। এখনও দেহের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সৈকতের কিছুটা ওপরে উঠে বালিতে বসিয়ে দিল।

চিৎকার এখন ফোঁপানি আর গোঙানিতে রূপ নিয়েছে বাচ্চাটার। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বসতে চাইছে না কোনমতেই। মেয়েটার হাত আঁকড়ে ধরে রাখল।

'আহ্, ছাড়ো না!' থাবড়া মারতে গিয়েও মারল না। জেরেমিই এখন ওর আয়ের একমাত্র উৎস। কোনওভাবে যদি বাচ্চাটা ওর মাকে বোঝাতে পারে, মেয়েটা ওকে মেরেছে, সেই মুহূর্ত থেকেই চাকরি শেষ। না খেয়ে মরতে হবে তখন।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুলছি!' অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুর্গন্ধ লেগে থাকা জেরেমিকে কোলে তুলে নিল ও। চুপ হয়ে গেল জেরেমি। 'সৈকতে খেলা অনেক হয়েছে। চলো এখন, টিভি দেখা যাক।'

বালিতে ফেলে রাখা তোয়ালেটা নিতে গিয়ে লক্ষ করল মেয়েটা, ভারি কোনও জিনিস বালির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পানিতে। কী নেয়া হয়েছে বুঝতে সময় লাগল না। আবর্জনা ভর্তি পিপেটা।

সাগরের দিকে তাকাল। পঁচিশ গজ দূরে পানিতে ভাসছে ওটা। আবর্জনা ছড়িয়ে যাচ্ছে পানিতে। ওখানে পিপেটা গেল কীভাবে ভেবে অবাক লাগল ওর। তোয়ালে আর ব্যাগটা তুলে

নিল। তারপর জেরেমিকে কোলে নিয়ে গেট দিয়ে বেড়ার অন্যপাশে এসে সাইডওয়াকে উঠল। আপনমনেই গজগজ করতে করতে হেঁটে চলল রাস্তা ধরে। নিজেকে বোঝাচ্ছে, আগামী গ্রীষ্মে অবশ্যই এরচেয়ে সহজ ও ভাল কোন কাজ জোগাড় করতে হবে। অনেক হয়েছে বেবি-সিটিং। আর না।

চৌত্রিশ

প্রচণ্ড রাগে থাবা মেরে চতুর্দিকে আবর্জনা ছিটাতে থাকল দানবটা। এগুলো খাবার নাকি? এ থেকে পুষ্টি পাবে ও? খাওয়ার উপযুক্ত খুব সামান্য জিনিসই আছে, তবে সেগুলো দিয়ে রাক্ষুসে খিদের কিছুই হবে না। পিপেটা এনে ভুল করেছে, বুঝতে সময় লাগল। আনা উচিত ছিল শিকার দুটোকে।

ধীরে ধীরে আবার ওপরে ভেসে উঠল দানবটা। ঘোলাটে পানি থেকে খোলা বাতাসে চোখ তুলে, তীরের দিকে তাকিয়ে, লেন্স পরিষ্কার হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল।

শূন্য। কিছু নেই। চলে গেছে দুর্বল প্রাণীগুলো।

কিন্তু একটু আগেও ওখানেই ছিল।

আস্তে আস্তে পানিতে তলিয়ে গেল আবার দানবটা। তলার কাদায় বিশ্রাম নিচ্ছে এখন। শৈবালের সঙ্গে সঙ্গে ওটার দেহটাও এপাশ ওপাশ দোল খাচ্ছে মৃত প্রাণীর মত। চুপচাপ পড়ে থেকে মগজের কোষে কোষে বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া তথ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে মন।

ভাবতে গিয়ে দেখল, কাজ করছে চিন্তাশক্তি। অকেজো হয়ে

যায়নি মগজের চিন্তাক্ষমতা। যতই চেষ্টা করছে, ততই সচল হচ্ছে। যেন মরচে ঝরে গিয়ে শানিত হচ্ছে ইস্পাতের ছুরির মত।

একের পর এক তথ্য উদয় হতে থাকল মগজে। স্পষ্ট হলো।

নতুন উদ্যমে ঢালু তলা বেয়ে অগভীর পানির দিকে এগিয়ে চলল ওটা। পিঠটা পানির ওপর সামান্য ভাসিয়ে কাঁকড়ার মত পাশে সরে ঢুকে গেল কতগুলো বড় বড় পাথরের মধ্যে, তীরের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আশেপাশে কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে নিল। পরিচিত এই পানির জগৎ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। এখানে আর খাবার পাবে না। খাবারের জন্য ডাঙায় যেতে হবে ওকে, নিতেই হবে বিপদের ঝুঁকি।

ফুলকো ডুবিয়ে পানি থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করল যতটা সম্ভব। আবার মাথা তুলল। হাঁটতে শুরু করল। দুর্বল হয়ে গেছে পায়ের পেশি, ষাট বছরেরও বেশি সময় দেহের ভার বহন করতে হয়নি পা দুটোকে। হাত-পায়ের সাহায্যে পানিতে সাঁতার কাটার চেয়ে শুধু পা ব্যবহার করে ডাঙায় হাঁটা অনেক কঠিন। তবে প্রথমে অসুবিধে হলেও আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে আসছে।

ডাঙায় উঠে কী করতে হবে প্রোগ্রামিং করা রয়েছে ওটার মগজে। কাজটা করার জন্য একটা গোপন জায়গা দরকার।

রাস্তাগুলো নির্জন। বাড়িঘরের দরজাগুলো সব বন্ধ। জানালায় পর্দা টানা। তারপরেও পানির নিরাপদ আবাস ছেড়ে উঠে এসে নিজেকে কেমন উন্মুক্ত মনে হলো দানবটার। টলমল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে দুটো বাড়ির মাঝখানের ছায়ায় লুকিয়ে পড়ল। ওটার কান এখন স্বাভাবিক কানের মতই কাজ করছে, শব্দ শুনতে পাচ্ছে—পানিতে থাকলে এভাবে শোনা যায় না, শুধু একধরনের চাপ টের পায়। কর্কশ হট্টগোল কানে আসছে ওটার।

আরও অনেকগুলো বন্ধ দরজা পেরোল দানবটা। আরেকটা

ছায়াঢাকা রাস্তায় পড়ল। আরও কিছু বন্ধ দরজা দেখল। আবার ঘুরতে যাবে, এমনি সময় সতর্কসঙ্কেত দিল মগজ–অক্সিজেনের চাহিদা তৈরি হচ্ছে। অক্সিজেন না পাওয়ায় শক্তি হারাচ্ছে দেহ।

রাস্তার শেষ মাথায় একটা খোলা দরজা চোখে পড়ল ওটার। টলতে টলতে দরজাটার দিকে এগোল। অনেকদিন পানিতে থাকায় জলজ প্রাণীর মতই পিচ্ছিল পদার্থ জমে গেছে গায়ে। দেহ থেকে ঝরে পড়ছে সেসব। চলার পথে চিহ্ন রেখে যাচ্ছে।

বড়, চওড়া একটা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল দানব। আবছা অন্ধকার ঘর। ওপরে তাকাল। একটা বড় কড়িকাঠ চোখে পড়ল। হ্যাঁ, হবে। এটা দিয়েই কাজ হবে।

লাফ দিয়ে কড়িকাঠ ধরতে পারবে না। বেয়ে ওঠার মত দড়ি নেই, মই নেই। নখ দিয়ে খুঁচিয়ে দেয়াল পরীক্ষা করল। বহুকালের পুরনো কাঠ। নরম হয়ে আছে। ধারালো নখগুলো তাতে সহজেই ঢুকে গেল।

দেয়ালে নখ বিঁধিয়ে চিতাবাঘের মত বেয়ে উঠতে লাগল ও। কাজটা মোটেও সহজ হলো না। পরিশ্রমে রক্তে অক্সিজেনের চাহিদা তৈরি হচ্ছে দ্রুত।

কড়িকাঠের কাছে যখন পৌঁছল, মাথার ভিতরে যেন ঢং ঢং করে সতর্ক-ঘণ্টা বাজছে। দ্রুত হাঁটুর ভাঁজ কড়িকাঠে আটকে মাথা নীচের দিকে করে ঝুলে পড়ল ও সার্কাসের দড়াবাজিকরের মত। মেঝে থেকে বারো-তেরো ফুট ওপরে রয়েছে। হাঁ করা মুখ থেকে আঠাল তরল বেরিয়ে মেঝেতে ঝরতে শুরু করল ফোঁটা ফোঁটা।

অপেক্ষা করতে লাগল ওটা। বিপাকীয় পরিবর্তন ঘটছে দেহের ভিতর। খুব ধীরে ঘটছে রূপান্তর: প্রথমে ফুসফুস থেকে সমস্ত তরল বের করে দিতে হবে, অক্সিজেনের অভাবে প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যাবে তখন মগজ। ষাট বছর আগে এ কাজটা করতে শেখানো হয়েছিল দানবটাকে, মাত্র একবার

প্র্যাকটিস করানো হয়েছিল, সেই কাজটা করতে হবে এখন–দুই হাতে শক্ত করে চাপ দিতে হবে পাঁজরের ঠিক নীচের অংশটায়।

এতকাল পরেও ভোলেনি মগজ। চাপ দিতেই মুখ দিয়ে বমির মত বেরোতে লাগল সবুজ তরল। খিঁচুনি উঠল একবার, দু'বার, তিনবার–প্রচণ্ড আক্ষেপে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকল দেহ, ফুসফুসে জমা পানিসহ অন্যান্য তরল বেরিয়ে আসতে লাগল শ্বাসনালী বেয়ে।

দুর্গন্ধ ভরা সবুজ তরল জমা হতে থাকল নীচের কাঁচা মেঝেতে।

ফুসফুস থেকে সমস্ত পানি বের করে দিতে ষাট সেকেন্ড লাগল। তারপর নিথর ঝুলে রইল দানবটা। চোখ দুটো ডিমের খোসার মত সাদা। ইস্পাতের দাঁত বেয়ে এখনও এক ফোঁটা দু'ফোঁটা করে সবুজ তরল ঝরে পড়ছে।

জলীয় জীবনের ইতি ঘটল। ক্লিনিক্যালি মৃত এখন দানবটা। হৃৎপিণ্ড চুপ। শিরায় শিরায় স্থির হয়ে গেছে রক্ত চলাচল।

কিন্তু মগজটা এখনও বেঁচে রয়েছে। মরিয়া হয়ে একের পর এক জরুরি নির্দেশ দিয়ে চলেছে স্নায়ুমণ্ডলীকে। অসংখ্য বিদ্যুৎ-সঙ্কেত দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে দ্রুততার সঙ্গে।

আরেকবার খিঁচুনি উঠল শরীরে। এক ফোঁটা পানি বা তরল বেরোল না আর মুখ দিয়ে।

কাশতে শুরু করল দানবটা।

পঁয়ত্রিশ

পিছনে দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিল সান্তা। লাফিয়ে নামল সাইডওয়োকে। দাঁড়িয়ে গেল স্থির হয়ে। প্যারেডটা কোনদিকে গেছে বোঝার চেষ্টা করছে। দপদপ করে লাফাচ্ছে কপালের উত্তেজিত শিরা। কানে শোনে না। কিন্তু শব্দ টের পাচ্ছে। ওর খালি পায়ের পাতা বেয়ে উঠে আসছে যেন। বাতাসে চাপ-তরঙ্গ সৃষ্টি করছে ড্রাম আর টিউবার শব্দ। কংক্রিটের সাইডওয়াকে কম্পন তুলছে বীরদর্পে তালে তালে ফেলতে থাকা শত শত জুতো পরা পা।

বাড়ি গিয়ে ফিরে আসতে যতটা সময় লাগবে ভেবেছিল, তারচেয়ে বেশি সময় লেগেছে ওর। অনুমান করল, এতক্ষণে কমার্শিয়াল ডকের কাছাকাছি চলে গেছে প্যারেড। ডকে পৌঁছার আগেই ভিকির হাতে ফিল্মটা দেয়ার তাগিদ অনুভব করছে ও। উৎসবের সবচেয়ে জরুরি মুহূর্ত হলো ডকে প্যারেড পৌঁছানো, তারপর ব্লেসিং অনুষ্ঠান।

লম্বা দম নিল ও, আটকে রাখল ফুসফুসে, চোখ বুজল। কোনদিক থেকে শব্দ আসছে অনুমান করল। ঘুরল সেদিকে। না, ভুল করেনি। বিচ স্ট্রিটের তিন ভাগের দু'ভাগ পার হয়ে গেছে মিছিল, ডকে পৌঁছাতে আর বড়জোর একশো গজ বাকি। কয়েকটা শর্টকাট বেছে নিলে এখনও ওদের আগে গিয়ে পৌঁছতে পারবে।

স্কার্টের পকেটে ফিল্মের রোলটা ভরে রেখে দৌড়াতে শুরু

করল ও। ভিকিকে ফিল্মটা দেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে ও। জিনিসটা হাতে পেলে ভিকির মুখটা কী রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, কল্পনা করতে ভাল লাগছে ওর। বধির জীবনে এই একটি ছেলের কাছেই ভাল ব্যবহার পেয়েছে ও, সম্মান পেয়েছে।

লাফিয়ে একটা বেড়া ডিঙাল সান্তা। বেড়ার অন্যপাশের চত্বর দৌড়ে পেরিয়ে উল্টো দিকের বেড়াটাও একইভাবে লাফিয়ে ডিঙিয়ে একটা গলিতে এসে পড়ল। গলি পার হয়ে, মোড় নিয়ে, কতগুলো গারবেজ ক্যান পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে একটা কানাগলিতে পড়ল। বিচ স্ট্রিট থেকে মাত্র আর এক ব্লক দূরে রয়েছে। অনুভব করছে, কানের পর্দায় বাড়ি দিচ্ছে এখন ড্রামের শব্দ।

যে পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে এখন ও, সেটা বড়ই সরু। দু'পাশে গাড়ি পার্ক করা, সামনের দিকটা কেবল খোলা, সেখানে গ্যারেজ। সেটার দিকে এগোতে এগোতে একটা অদ্ভুত গন্ধ নাকে লাগল, কেমন একধরনের নোনা, মিষ্টি-মিষ্টি দুর্গন্ধ—ব্যাখ্যা করতে পারবে না। তারপর দেখল গ্যারেজের ভিতর থেকে সবুজ তরল বেরিয়ে এসে পাশের নর্দমায় পড়ছে।

গতি কমাল ও। গ্যারেজটা ওর বাবার বন্ধুর। তরল পদার্থটা তেল না অন্য কিছু বুঝতে পারল না। অচেনা জিনিস কৌতূহলী করে তুলল ওকে। ক্ষতিকর কিছু হলে ব্লেসিং অনুষ্ঠান থেকে গ্যারেজের মালিককে খুঁজে বের করে জানাতে হবে।

পায়ে পায়ে এগোল গ্যারেজের দরজার দিকে। দুর্গন্ধ বাড়ছে।

চওড়া দরজাটা খোলা। উঁকি দিয়ে দেখল মেঝেতে সবুজ তরল জমে রয়েছে। সেখান থেকেই গড়িয়ে চলে যাচ্ছে বাইরে।

গ্যারেজের ভিতর ঢুকে পড়ল ও।

মস্ত এক বাদুড়ের মত উল্টো হয়ে ঝুলে রয়েছে দানবটা। ফুসফুসে বাতাস টেনে নিচ্ছে। বাতাস থেকে অক্সিজেন পাচ্ছে এখন। দেহকোষে প্রাণ ফিরতে আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ শিকারের গন্ধ পেল ওটা। শব্দ শুনল। চোখ ঘুরিয়ে তাকাল নীচে।

সতর্ক হয়ে গেল সান্তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। কানের বদলে প্রকৃতি ওকে নতুন ক্ষমতা দিয়েছে। বাতাসে এক ধরনের চাপ টের পেল, জীবন্ত কিছুর অস্তিত্ব। মনে হলো জোরে জোরে দম নিচ্ছে কেউ। অন্ধকার গ্যারেজে কোন কিছু চোখে পড়ল না। তবুও অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠল ও। গায়ে কাঁটা দিল। মন বলছে পালাও সান্তা! জলদি পালাও!

ঘুরেই দৌড় দিল ও।

শিকার দেখেছে দানবটা। সেই দুর্বল প্রাণীগুলোর একটা, শিকার করাও খুব সহজ, খেলে পেটও ভরে। কেঁপে কেঁপে উঠছে দানবটার হাতের পেশি। হাতের পর্দা লাগানো আঙুলগুলো বাঁকা হয়ে গেছে। পা সোজা করতে কড়িকাঠ থেকে ছুটে গেল হাঁটুর ভাঁজ। নীচে পড়তে লাগল। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় শূন্যেই ডিগবাজি খেয়ে সোজা করে ফেলল দেহটা। পায়ের ওপর লাফিয়ে নামল।

বহুকালের অনভ্যাসে মাটিতে নেমে তাল সামলাতে পারল না দানবটা। কাত হয়ে পড়ে গেল। চার হাতে-পায়ে ভর দিয়ে উঠে বসল। তারপর ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এগোল দরজার দিকে।

ততক্ষণে হাতছাড়া হয়ে গেছে শিকার।

রাগে, ক্ষোভে, হতাশায় জানোয়ারের মত গজরাতে লাগল দানবটা। দরজার বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ বিপদ টের পেল। অনুসরণ করা হচ্ছে ওটাকে। ছুটে পালানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। কিন্তু কোথায় পালাবে, কোথায় আছে নিরাপত্তা? বুঝতে পারছে না। ওটার জানামতে একমাত্র পরিচিত পানির জগতেই রয়েছে লুকানোর জায়গা ও নিরাপত্তা।

ছায়া থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠল ওটা।

কোনদিক দিয়ে কীভাবে এসেছে এখানে, মনে করতে পারছে না। পানির জগতে কোন পথে ফিরে যেতে হবে জানে না। চারপাশে বাড়িঘর বাধা হয়ে থাকায় সাগর চোখে পড়ছে না। বাতাসে নোনা পানির গন্ধ পাচ্ছে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে চলল।

মিনিটখানেক হাঁটার পর পিছন থেকে শব্দ শোনা গেল। অনুসরণকারী কাছে চলে এসেছে। প্রচণ্ড রাগ মাথাচাড়া দিল মগজে। আত্মরক্ষার প্রচণ্ড তাগিদে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওটা।

কালো একটা প্রাণীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল দুটো বিল্ডিঙের মাঝের ছায়ায়। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে ওটার। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। ওপরের ঠোঁটটা উঁচু হয়ে গেছে। সামনের দুই পায়ের ওপর ঝুঁকে রয়েছে কাঁধটা। গলার গভীর থেকে গরগর শব্দ বেরোচ্ছে।

দানবটা বুঝল, মেরে ফেলতে হবে ওটাকে, নইলে পিছু ছাড়বে না। চিৎকার করে আরও প্রাণী জড় করবে। বিপদ বাড়াবে।

এক কদম আগে বাড়ল দানবটা।

ঘেউ ঘেউ আওয়াজ করে, দাঁত খিঁচিয়ে লাফ দিল কালো প্রাণীটা।

মাঝপথে, শূন্যেই ওটাকে ধরে ফেলল দানবটা। দুই হাতে শক্ত করে ঝুলিয়ে ধরে দাঁত বসিয়ে দিল গলায়। গর্জন আতঙ্কে রূপ নিল কালো প্রাণীটার। গোঙাতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা গেল।

প্রাণীটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল দানবটা। মারাত্মক নখ দিয়ে চিরে ফেলল প্রাণীটার পেট। নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ল। এখনও ঠাণ্ডা হয়নি দেহটা। প্রচণ্ড আক্রোশে পেটের ভিতরের সমস্ত যন্ত্রাংশ টেনে বের করে ছিঁড়ে ফেলল দানবটা। হৃৎপিণ্ড, কলজে

খাওয়ার পর মাংস খেতে শুরু করল। তাড়াহুড়া করছে। ডাঙার অন্য প্রাণীরা চলে আসার আগেই পালাতে চায়।

ছত্রিশ

'এত চিন্তা কোরো না তো,' ভিকিকে বলল রানা। 'আর দশ সেকেন্ডের মধ্যেই মোড় ঘুরবে ব্যান্ড। শান্ত হয়ে দেখতে থাকো। ও তোমাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে।'

'কিন্তু আমি কোথায় থাকব বলে আসিনি,' ভিকি বলল। 'এভাবে সরে আসাটা উচিত হয়নি আমার...'

'এত দুশ্চিন্তা কীসের?' মুখ টিপে হাসল রানা। 'সান্তা কি রাগ করে চলে যাবে ভাবছ?'

'করবে না,' জবাবটা দিল কেরি। 'ও তোমাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে, ভিকি। কেন সরে এসেছ, তা-ও বুঝবে।'

প্যারেড অনুসরণ করে আসছিল ভিকি। সেইন্ট বার্নার্ড ধরে আসার সময় সাগরপারের দুটো বাড়ির মাঝখানের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়েছে ওদের ম্যাকো বোটটা। কেরিকে নিয়ে ওটাতে করেই এসেছে রানা। দৌড়ে গিয়ে কতগুলো পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে, চিৎকার করে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ভিকি। বোট তীরে ভিড়িয়েছে রানা। ভিকিকে বোটে তুলে নিয়ে কমার্শিয়াল ডকের দিকে এগিয়েছে। জেটিতে নোঙর ফেলার জায়গা না পেয়ে একটা সৌখিন মাছশিকারী বোটের সঙ্গে বেঁধেছে। বোটের ডেকে উঠে, সিঁড়ি বেয়ে ডাঙায় নেমেছে তিনজনে। প্যারেডের আগেই চলে এসেছে এখানে।

মোড়ের মাথায় প্রথম দেখা দিলেন বিশপ। তাঁকে অনুসরণ করে এল ড্রাম বাদকরা। মোড় ঘুরে বেরিয়ে এসে, ডকের দিকে যাওয়ার সোজা রাস্তাটায় পড়তে বদলে গেল বাজনার সুর, 'কলোনেল বগি' বাজিয়ে মার্চ করতে করতে এগোল।

নিজের শূন্য ক্যামেরাটার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল ভিকি।

ব্যাপারটা লক্ষ করে কেরি বলল, 'আমার কাছে ক্যামেরা আছে।' পকেট থেকে ছোট একটা ক্যামেরা বের করল ও। 'তোমার ছবিগুলো আমিই তুলে দিচ্ছি।'

জনতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে রানার পাশে দাঁড়ালেন ম্যাককুইন। নতুন ইস্তিরি করা হয়েছে পুলিশ চিফের ইউনিফর্ম, চকচক করছে পালিশ করা জুতো। 'দুই হাজার টুরিস্ট এসেছে এবার, মিস্টার রানা,' হাসিমুখে বললেন তিনি। 'আর আপনি আমাকে এই উৎসব ক্যান্সেল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।'

'দিয়েছিলাম,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল রানা। 'এবং ক্যান্সেল করলেই ভাল করতেন। সবকিছু এখনও ভালয় ভালয় শেষ হয়নি। বিপদের আশঙ্কা করছি আমি আগের মতই। জন্টিকে কখন জেল থেকে ছাড়বেন?'

'শেষ টুরিস্টটি এখানে তার শেষ ডলারটি খরচ করে ফেলার পর, এই ছ'টা নাগাদ,' হাসিমুখে জবাব দিলেন ম্যাককুইন। 'তারপর যত ইচ্ছে ওর মুখে দানবের গল্প শুনবেন, আমার আপত্তি নেই।'

খড়খড় করে উঠল ম্যাককুইনের বেল্টে ঝোলানো রেডিও। স্পিকারে বেজে উঠল একটা কণ্ঠ, 'চিফ!'

হুক থেকে রেডিওটা খুলে নিলেন ম্যাককুইন। কানে ঠেকিয়ে ওপাশের কথা শুনলেন। মুখ থেকে যেন আপনাআপনি বেরিয়ে এল শব্দটা, 'শিট!'

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'টমি ফোন করেছিল। কী হয়েছে বলেনি। শুধু বলল, একটা

জিনিস নাকি আমার দেখা দরকার। খুব জরুরি।' রেডিওটা আগের জায়গায় ঝুলিয়ে রেখে, 'পরে দেখা হবে.' বলে ডকের দিকে পা বাড়ালেন চিফ।

হঠাৎ বাজনার শব্দকে ছাপিয়ে পিছন থেকে কানে এল ভিকির চিৎকার, 'সান্তা!'

ফিরে তাকিয়ে রানা দেখল, ভিড়ের ভিতর দিয়ে প্রায় লাফাতে লাফাতে সান্তার দিকে ছুটছে ভিকি। মেয়েটার পা খালি। পরনে নীল পোশাক। ব্যান্ডের পাশ দিয়ে যতটা সম্ভব জোরে দৌড়ে আসছে।

মুখোমুখি হলো ভিকি ও সান্তা। মেয়েটা কাঁপছে। কাঁধে হাত রেখে ওকে শান্ত করতে চাইল ভিকি। ওদের দিকে এগোল রানা কথা বলতে চাইছে মেয়েটা। কিন্তু প্রলাপের মত লাগছে কথাগুলো। ভিকির মুখের সামনে এত দ্রুত হাত নাড়ছে, যেন হামিংবার্ডের ডানা।

মাথা নেড়ে ভিকি বলল, 'আস্তে বলো। আরও আস্তে।'

'কী বলছে?' জানতে চাইল রানা।

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল ভিকি।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল কেরি। হাঁটু গেড়ে বসল সান্তার সামনে। ওর দুই হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে ইশারায় জানতে চাইল, 'ব্যথা পেয়েছ?'

মাথা নেড়ে সান্তা জানাল, পায়নি।

'ভয় পেয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল সান্তা।

'কীসের ভয়?'

'একটা জিনিস! অনেক বড়...

এ সময় নিজের নাম ধরে ডাকতে শুনল রানা। ফিরে তাকিয়ে দেখে ম্যাককুইন। হাত নেড়ে কাছে যেতে ইশারা করছেন রানাকে। ডকের মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন

'আসছি,' কেরিকে বলে সেদিকে রওনা হলো রানা।

রাগে কঠোর হয়ে গেছে ম্যাককুইনের চেহারা। 'হেনরি গিবসনের কুত্তাটাকে একটু আগে কীসে যেন মেরে ফেলেছে। গলা কেটেছে। পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি সব বের করে ফেলেছে, খুবলে খেয়েছে ওর মাংস। মেপল স্ট্রিটে দেখে এসেছে টমি। আর এই যে, এটা পেয়েছে ও।'

স্টেইনলেস স্টিলের একটা ত্রিকোণ দাঁত দুই হাতে টিপে ধরে রেখেছেন ম্যাককুইন। মাথাটা চোখা। দুই পাশে করাতের দাঁতের মত মিহি খাঁজ কাটা। নীচের অংশ অপেক্ষাকৃত পুরু। দুই কোণায় বড়শির মত উল্টো কাঁটাওয়ালা দুটো আঁকশি।

নিজের অজান্তেই দম আটকে ফেলল রানা। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দাঁতটার দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ তুলল ম্যাককুইনের দিকে। বলল, 'এখানে চলে এসেছে ওটা, চিফ। ডাঙায় উঠে পড়েছে।

সাঁইত্রিশ

যেখান দিয়ে উঠেছিল সে-জায়গাটা খুঁজে বের করল দানবটা। সৈকতের বালিতে রেখে যাওয়া নিজের পায়ের ছাপ দেখতে পেল। সৈকত পার হয়ে নামল পানিতে। পাথরের চাঙড়ের আড়ালে থেকে ধীরে ধীরে হেঁটে চলল ঢাল বেয়ে। কাঁধের কাছে পানি উঠে এলে ডুব দিল।

নিঃশ্বাস ফেলে ফুসফুসের বাতাস সব বের করে দিল ফুলকো খুলে দিয়ে মুখ হাঁ করে দম নিল, মাছের মত। পরক্ষণে স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল পানির ওপরে। কাশতে শুরু করল

তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছে ফুসফুসে। পেটের পেশিতে যেন গিঁট লেগে গেছে।

ভারসাম্য হারাল দানবটা, সমুদ্রতলের ঢালে পিছলে গিয়ে ডুবে যেতে শুরু করল। ফুলকোর চেরাগুলোর ফাঁক দিয়ে পানি ঢুকে আবার শ্বাসরুদ্ধ করে দিল ওর। হাঁচড়েপাঁচড়ে একটা চাঙড়ের কাছে পৌঁছল ওটা, থাবা দিয়ে ধরে আঁকড়ে রইল, মাথা তুলে ফোঁস ফোঁস করে দম ফেলতে থাকল ডাঙার প্রাণীর মত।

আরও দু'বার ডুব দিয়ে দম নেয়ার চেষ্টা করল ওটা। পুরনো প্রোগ্রামিংটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করল। দুইবারই ব্যর্থ হলো পরিবর্তিত শ্বাসযন্ত্র।

কী ঘটেছে, কেন ঘটেছে, বুঝতে পারছে না দানবটা। শুধু একটা জিনিস পরিষ্কার, পানির নীচে শ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারবে না আর, দম নিতে হলে বাতাসেই নিতে হবে। বুঝতে পারছে, পানির নীচে দম নিতে না পারলেও বাঁচতে হলে আপাতত পানিতেই থাকতে হবে ওটাকে। ডাঙার প্রাণীগুলো পানিতে অসহায় হলেও ডাঙায় ভীষণ বিপজ্জনক।

বাতাসে লম্বা দম নিয়ে, ফুলকোর ফাঁকগুলো বন্ধ করে ডুব দিল ওটা ডাঙার প্রাণীর মত দম আটকে রেখেছে। তবে চোখে দেখতে পাচ্ছে আগের মতই, লেন্সের কোন ক্ষতি হয়নি। ডুব দিয়ে আগের মত সাঁতরাতে পারে কিনা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল, পারে না। ডুব দেয়াটা আর আগের মত সহজও হচ্ছে না। ফুলকো দিয়ে শ্বাস নেয়ার সময় ফুসফুসে ঢুকত পানি, তাতে ভারি হয়ে তলিয়ে যাবার সুবিধে ছিল; এখন বাতাস ঢোকানোয় ডুবে থাকার বদলে ঠেলে তুলতে চাইছে ফুসফুস। ডুব দিয়ে সাঁতরানোর সময় তাই বাড়তি শক্তি খরচ করতে হচ্ছে। তা ছাড়া ডুব দিয়ে বেশিক্ষণ থাকতেও পারছে না, ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে ফুসফুসে, কানের কাছে দপ্‌দপানি। বাতাসে ভেসে উঠে দম নিতে বাধ্য হচ্ছে।

ভেসে ওঠার পরেও স্বস্তি নেই। গা ছেড়ে দিতে পারছে না, দিলেই তলিয়ে যায়, ভেসে থাকার জন্য তখন পা নাড়তে হয় এ তো মহা যন্ত্রণা! ডুবলে ভাসিয়ে তোলে, ভাসলে ডোবায়।

বাঁচতে হলে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই

ওপরে মাথা ভাসিয়ে বাতাসে দম নিয়ে সাঁতরে চলল ওটা। তীর থেকে যতই সরছে, নিরাপত্তাবোধ বাড়ছে তত। হাত ও পায়ের আঙুলের ফাঁকে লাগানো পর্দা দ্রুত সাঁতরাতে সাহায্য করছে।

বাতাসে ফুসফুস ভর্তি করে পানির নীচে ডুব দিয়ে নতুন কায়দায় সাঁতরানোও রপ্ত করে ফেলল ধীরে ধীরে।

পানির বুকে জেগে থাকা ডাঙা চোখে পড়ল। এগিয়ে চলল সেদিকে। নিরাপত্তার আশায়।

দুটো জিনিস প্রয়োজন এখন ওটার। নিরাপত্তা। সেই সঙ্গে খাবারের ব্যবস্থা।

আটত্রিশ

পকেট থেকে বিশ ডলারের একটা নোট বের করে আছাড় দিয়ে বারের ওপর ফেলল জন্টি গ্র্যাহাম।

'সেভেন-অ্যান্ড-সেভেন?' বারটেন্ডার জিজ্ঞেস করল।

'ডাবল দাও, ডাবল; গলা শুকিয়ে কাঠ।' চারপাশে তাকাল জন্টি। অর্ধেকটা ভরেছে ঘরের। সাড়ে সাতটা বাজে। অনেকেই ডিনারে ব্যস্ত।

মদের গ্লাসটা ভর্তি করে জন্টির সামনে বসিয়ে দিয়ে, নোটটা

তুলে নিল বারটেন্ডার। মদের দাম রেখে বাকি টাকা গুনে ফিরিয়ে দেবার সময় হাসিমুখে বলল, 'শুনলাম, লম্বা ছুটি কাটিয়ে এলে ম্যাককুইনের বাড়ি থেকে?'

মুখ খারাপ করে গালি দিল জন্টি এক চুমুকে প্রায় অর্ধেকটা গ্লাস খালি করে দিয়ে পাকস্থলী থেকে উষ্ণ অনুভূতি শরীরে ছড়িয়ে পড়ার অপেক্ষা করতে লাগল। 'বিনা দোষে ধরার জন্য মাফ পর্যন্ত চায়নি একটিবার। বোঝো, কী রকম অন্যায় অবিচার। ভাবছি, স্টিভ ম্যাককুইনের বিরুদ্ধে মামলা করব কি না।'

'অন্যায়টা কী করল? মদ খেতে দেয়নি? তোমাকে কিন্তু ঝরঝরেই লাগছে। মাঝে মাঝে দু'একটা দিন বিশ্রাম নেয়া, মদ না খাওয়া শরীরের পক্ষে ভাল।'

গ্লাসের ড্রিংক শেষ করে আরও দিতে ইশারা করল জন্টি। মনটা খুশি খুশি, ফুরফুরে লাগছে। তার কারণ, কিছুটা হলেও প্রতিশোধ নিতে পেরেছে ও। যে 'আষাঢ়ে গপ্পো'টা বলার জন্য ওকে হাজতে ভরা হয়েছিল, যার একটা বর্ণ বিশ্বাস করেননি ম্যাককুইন কিংবা আর কেউ, ওকে মিথ্যেবাদী ভাবা হয়েছে, হ্যালুসিনেশন দেখেছে বলে বিদ্রূপ করেছে, সেটা শোনার জন্যই হঠাৎ করে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন পুলিশ চিফ আর সেই বদমাশ বিদেশী লোকটা, মাসুদ রানা। পাত্তাই দেয়নি জন্টি। চাপাচাপি করায় বলে দিয়েছে মদের নেশা কেটে গেছে তো, তাই কিছুই মনে করতে পারছে না। ওর কাহিনীর মূল্য এখন বুঝে গেছে ও। শুনেছে টিভি কোম্পানিগুলো এ ধরনের কাহিনীর জন্য অনেক টাকা দেয়। এখন ধৈর্য ধরে শুধু অপেক্ষা করা। খবর ছড়াবেই। টিভি কোম্পানির কানেও পৌঁছবে ছুটে আসবে তারা।

'গ্যারি কুনার এসেছিল,' পারকার বলল, 'তোমাকে খুঁজতে

'তা তো আসবেই,' হাসিমুখে জবাব দিল জন্টি। 'কী বলেছ?'

'দেখিনি তোমাকে।'

'ভাল করেছ।' গ্যারির কাছেও গল্প বিক্রি করবে না, ভাবছে

জন্টি গ্যারি বেশি পয়সা দিতে পারবে না। নাহ্, টিভি কোম্পানি ছাড়া মুখ খুলবে না ও, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জন্টি।

দ্বিতীয় ড্রিংকটাও শেষ করে ফেলল। মন আরও ভাল হয়ে গেল পারকারের আচরণে। যে-লোক ওকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছিল সেদিন, যেন আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় সেই লোকই পুরোপুরি বদলে গেছে। এমন ব্যবহার করছে, যেন জন্টি গ্র্যাহাম একজন ভিআইপি।

ভিতরে ঢুকল একজন লোক। বারের শেষ মাথায় বসে এক গ্লাস মদের অর্ডার দিল। বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢালছে পারকার, এ সময় জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'আচ্ছা, ভাই, গ্র্যাহামকে চেনেন? মিস্টার জন্টি গ্র্যাহাম?'

বরফের মত জমে গেল যেন জন্টি। বারের ওপাশে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা মেনু পড়ার ভান করতে করতে আড়চোখে তাকাল লোকটার দিকে।

'তাকে দরকার?' জন্টির দিকে তাকাচ্ছে না পারকার। হাতের বোতলটা কুলারে রেখে লেবু কাটতে শুরু করল।

'তারমানে চেনেন?'

লোকটার কথায় বিদেশী টান। আমেরিকান নয়, অনুমান করল জন্টি। সম্ভবত ইয়োরোপের লোক।

'কেন, কাজ আছে নাকি তাঁর কাছে?' সহজে তথ্য ফাঁস করতে চাইছে না পারকার।

'ছিল। একটু কথা বলার দরকার ছিল।'

নিশ্চয় কোনও বড় ম্যাগাজিন থেকে এসেছে কিংবা টিভির লোক। চুক্তি করতে এসেছে ওর সঙ্গে। মনস্থির করে ফেলল গ্র্যাহাম। সামান্য দ্বিধা করে ফিরে তাকাল লোকটার দিকে। 'আমি গ্র্যাহাম।'

'আপনি! এত কাছে বসে আছেন, অথচ... হেসে উঠে দাঁড়াল লোকটা। ড্রিংকের গ্লাসটা হাতে নিয়ে এগোল। বারটেন্ডারের পাশ

কাটানোর সময় বলল, 'আপনি তো বহুত সাবধানী লোক, মশাই! মিস্টার গ্র্যাহাম বসে আছেন এখানেই, অথচ আপনি কিছুই বললেন না।'

লোকটাকে ভাল করে দেখছে জন্টি। ছয় ফুটের ওপর ইঞ্চি দুয়েক হবে লম্বায়। চওড়া কাঁধ। সরু কোমর বোঝা যায় নিজের দেহের ব্যাপারে সচেতন, নিয়মিত ব্যায়াম করে। বয়েস চল্লিশের কোঠায়, শুরুর দিকে। এক সময় সোনালি ছিল চুলের রঙ, এখন ধূসর, কপাল থেকে আঁচড়ে সোজা পিছনে নিয়ে গেছে। পরনে ধূসর সুট, সাদা শার্ট। গাঢ় রঙের টাই। ফ্যাকাসে চামড়া রোদ লাগায় না বোধহয় কখনও।

'আপনার পাশে বসি?' বিনীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

ইশারায় পাশের টুলটা দেখাল জন্টি। মাথা ঝাঁকাল। লোকটা ইয়োরোপিয়ান, এখন আর কোনও সন্দেহ নেই তার ইংরেজি 'জয়েন' শব্দটাকে 'চয়েন' উচ্চারণ করছে। বোধহয় জার্মান কিংবা জার্মানির আশপাশের কোনখানের।

লোকটা বলল, 'বাইরে একজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'কেন?'

'তিনি আপনার গল্পের কথা শুনেছেন...'

'কোন গল্প?'

'একটা অদ্ভুত দানব নাকি দেখেছেন আপনি সাগরে?'

দ্বিধা করল জন্টি। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, নিয়ে আসুন।'

'সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন?' হেসে উঠল জন্টি। 'তিনিও দানব? দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবেন না?'

'সামসিং লাইক দ্যাট।'

'সামথিং' শব্দটাকে 'সামসিং' উচ্চারণ করেছে। লোকটা জার্মানই। বারটেন্ডারের দিকে তাকাল জন্টি। 'পারকি, বড়

শরীরের মানুষকে ঢুকতে দিতে অসুবিধে আছে?'

জন্টির রসিকতায় হাসল না পারকার।

'একটু বাইরে আসবেন, প্লিজ?' অনুরোধ করল আগন্তুক। 'আপনার লাভই হবে

'আমার লাভ? কী লাভ?' ভুরু নাচাল জন্টি।

'আর্থিক লাভ।'

মনে মনে উত্তেজিত হলেও চেহারায় সেটা প্রকাশ পেতে দিল না জন্টি। বলল, 'চলুন তা হলে।'

লোকটার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল ও। রাস্তার অন্যপাশে পার্ক করা রয়েছে একটা কালো রঙের ভ্যান। জানালায় রঙিন কাঁচ। ভিতর দেখা যায় না। লাইসেন্স প্লেটের দিকে তাকাল ও। নিউ ইয়র্কের নম্বর। পঙ্গু কিংবা চলাচলে অক্ষম মানুষকে দেয়া হয় এই সিরিজের নম্বর

'অ্যামবুলেন্স নাকি?' লোকটাকে জিজ্ঞেস করল জন্টি।

জবাব না দিয়ে দরজা খুলে দিল লোকটা। জন্টিকে ভিতরে যেতে ইশারা করল

গলা বাড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিল জন্টি। গাড়ির ভিতরটা অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না।

'ভিতরে ঢোকার দরকারটা কী?' জন্টির কণ্ঠে সন্দেহ। অস্বস্তি বোধ করছে।

'যান, মিস্টার গ্র্যাহাম...

'ভিতরে কী আছে দেখা যাচ্ছে না। আপনাকেও চিনি না। অপরিচিত লোকের গাড়িতে আমি ঢুকব কেন? ওকে বেরিয়ে আসতে বলুন।'

'অসুবিধে নেই, আসলে...

'আছে। অন্ধকারে ব্যবসা করতে রাজি নই আমি। যা বলার আলোর মধ্যে বলুন।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল লোকটা। 'সরি!'

'সরি মানে?'

সামান্য নড়ে উঠল লোকটা। কী যে করল বুঝতেই পারল না জন্টি। শুধু টের পেল, চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল ওর দেহটা, শূন্যে উঠে গেল দুই পা, প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল ভ্যানের ভিতর। কপাল ঠুকে গেল মেঝেতে। কার্পেট বিছানো থাকায় ব্যথা কম পেল উপুড় হয়ে পড়ে রইল ও। স্তব্ধ। বিমূঢ়। দরজা লাগানোর শব্দ শুনল। স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। জন্টি বাধা দেয়ার আগেই চলতে শুরু করল গাড়ি।

ঊনচল্লিশ

মেশিন থেকে ফ্যাক্সের শেষ কাগজটাও টেনে বের করল রানা। দ্রুত পড়ে ফেলল। বিরক্ত ভঙ্গিতে ছুঁড়ে ফেলল। 'ধূর!'

গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে পরিচিত-অপরিচিত অন্তত দশজন ম্যারিন সায়েন্টিস্টের ঠিকানা জোগাড় করে ফ্যাক্স করেছে রানা ইস্পাতের দাঁত ও মৃত প্রাণীর দেহে পাওয়া আঁচড়ের দাগগুলোর ছবি তুলে পাঠিয়েছিল। চেনি ভাইদের হত্যাকাণ্ডর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে জানতে চেয়েছিল সাগরে এমন কোন প্রাণী আছে কিনা যেটা এভাবে খুন করে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও মতামত চেয়েছিল। সম্ভাব্য ব্যাখ্যা চেয়েছিল।

কাজ হয়নি তাতে। রানার অজানা নতুন কিছুই জানাতে পারেনি কেউ ফ্যাক্সের স্তূপের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকল ও সি লায়নটাকে যে খুন করেছে, দু'শো ফুট পানির নীচে ছিল ওটা; পানিতে বুদবুদ ছিল না—অন্তত টেপে বুদবুদের ছবি পাওয়া

যায়নি; তারমানে ডুবুরির পোশাক ছিল না ওটার পরনে। আর ডাইভিং সুট না পরে কোন মানুষের পক্ষেই দু'শো ফুট নীচে ডুব দেয়া সম্ভব নয়। একটা সি লায়নকে খুন করে পানির জানোয়ারের মত পানির মধ্যেই ওটাকে খাওয়া তো দূরের কথা। আর মানুষ এ কাজ করতে যাবেই বা কেন?

ফোন বাজল। তুলে নিল রানা। পুলিশ চিফ ম্যাককুইন। এই নিয়ে অন্তত এক ডজন বার করেছেন। নতুন কিছু জানাতে পারছেন না তিনিও। চেয়ারে হেলান দিয়ে চিফের কথা শুনতে লাগল রানা। একঘেয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করে চলেছেন চিফ: বাজেট ফুরানোর জোগাড় হয়েছে তাঁর; প্রতিদিন টানা চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশের বোট ব্যবহার করতে হচ্ছে, ডাবল শিফটে কাজ করাতে হচ্ছে অফিসারদের, হাউন্ডের মত দাবড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে প্রেস, ক্রনিকলে কাহিনী ছেপে দিয়েছে গ্যারি কুনার, হেডিং দিয়েছে 'দানবের কুকুর হত্যা', ডিক সোয়ানসন ও রক সোয়ানসনের অমীমাংসিত খুনের রহস্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে তাতে, আর সে-কাহিনী পড়ে বিভিন্ন শহর থেকে রিপোর্টাররা উড়ে চলে এসেছে; একজন টিভি প্রডিউসার বিষয়টা নিয়ে টেলিভিশনের জন্য একটা সিনেমা বানানোর প্রস্তাব দিয়েছেন; জমি বেচাকেনার দালাল, রেস্টুরেন্টের লোক ও শহরের স্থানীয় নাগরিকরা অবিরাম ফোন করছে থানায়, জবাব দিতে দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন ডিউটি অফিসারেরা।

'এখন আপনিই শেষ ভরসা। দেখি আপনি এখন কী করতে পারেন,' বলে শেষ করলেন ম্যাককুইন।

'কী করতে বলেন আমাকে, চিফ?' রানা জিজ্ঞেস করল। 'বিশাল সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে যাব? কী খুঁজতে হবে, তা-ই তো জানি না এখনও। গ্যারেজে যে সবুজ রঙের তরল পদার্থ পাওয়া গেছে, সেটা পরীক্ষা করে রিপোর্ট পাঠিয়েছে আপনাদের ল্যাবরেটরি?'

'হ্যাঁ-ও বলতে পারেন, না-ও,' ম্যাককুইন জবাব দিলেন। 'আমি ওদের বলে দিয়েছি ফাইনাল ডিএনএ রেজাল্ট না দেয়া পর্যন্ত আমি ওদের শান্তিতে ঘুমাতে দেব না।'

'ওরা কী ভাবছে?'

'জিনিসটা স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহ থেকে বেরিয়েছে।'

'কোন ধরনের প্রাণী?'

'ওরা ভাবছে...' দ্বিধা করলেন ম্যাককুইন। 'ওদের ধারণা, জিনিসটা নাকি মানুষের ফুসফুস থেকে বেরিয়েছে!'

পাহাড় বেয়ে দ্রুত নামছে রানা। পুলের ধারে দেখতে পেল ভিকি ও সান্তাকে। সি লায়নগুলোর সঙ্গে খেলা করছে। কংক্রিটে বাঁধানো পুলের কিনারে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে অ্যাপ্রন পরা কেরি।

ভয় তো কাটেইনি, ক্রমে আরও যেন বাড়ছে লায়নগুলোর আতঙ্ক। রীতিমত নিউরোটিক হয়ে উঠেছে। পানি এড়িয়ে চলছে ওরা। শুধু সাগরের নয়, সব ধরনের পানি। গত কয়েকদিনে শত চেষ্টা করেও কোনভাবেই ওগুলোকে পানিতে নামাতে পারেনি কেরি। মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত ফ্লোরিডায় একজন ডলফিন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তিনি জানিয়েছেন বুদ্ধিমান স্তন্যপায়ী বিশেষ করে সিল ও ডলফিনেরা রহস্যময় কারণে ছোটদের কাছে সাড়া দেয় বেশি। সেটা কেরিরও অজানা নয়। তাই ভিকিকে সহযোগিতা করার জন্য সান্তাকেও ডেকে এনেছে ও। বিস্ময়কর সাড়া মিলছে সি লায়নগুলোর কাছ থেকে।

কেরির নির্দেশ এখন প্রায় শুনতেই চায় না লায়নগুলো, কিন্তু সান্তা ওদের কাছে গেলে প্রতিবাদ করে না, ওকে মাথায় হাত বোলাতে দেয়, আদর করতে দেয়। বুঝিয়ে-শুনিয়ে ওদেরকে পানিতেও নামাতে পারে ও। সান্তা ও ভিকির সঙ্গে খেলা করে দুজনের মধ্যে সান্তাকে বেশি পছন্দ করে লায়নগুলো।

সান্তার মাধ্যমে ওগুলোকে উৎসাহ জোগাচ্ছে কেরি। সান্তা নিজে থেকে কিছু করতে চাইলেও বাধা দেয় না।

রানার সাড়া পেয়ে ঘুরে তাকাল কেরি। সি লায়নগুলোর সঙ্গে দাপাদাপি করতে থাকা সান্তা ও ভিকিকে দেখিয়ে বলল, 'অবিশ্বাস্য! অদ্ভুত! আমি সত্যিই অভিভূত...

'আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে আমার!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'দু'মিনিট সময় হবে? ম্যাককুইনের ল্যাবরেটরি টেস্টের ব্যাপারে...'

'আমিও আপনার সঙ্গে কথা বলতে যাব ভাবছিলাম,' হাত তুলে পুলটা দেখাল কেরি। 'কিন্তু এদের কাণ্ড দেখে...'

'কোন্ ব্যাপারে কথা বলবেন?'

'রেডিওতে স্পটার প্লেনের পাইলটের কাছ থেকে একটা খবর শুনলাম...'

'আমি তো ভেবেছিলাম, সি লায়নগুলো যেহেতু আর সাগরে নামতে চাইছে না,' বাধা দিয়ে বলল রানা, 'প্লেন আর আপনার দরকার নেই।'

'আমার নেই। কিন্তু একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওর, তাই আমাকে যেচে পড়ে জানিয়েছে। একটা কমার্শিয়াল বোটের জন্যে সোর্ডফিশের খোঁজ করছিল, এ সময় ব্লক আইল্যান্ডের কাছে একটা সৌখিন মৎস্য-শিকারীর বোটকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে। পানিতে টোপ ফেলা হচ্ছে বোট থেকে। ওর ধারণা, কোনও প্রাণীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বোটটা।'

'লোকগুলোর প্রশংসা না করে পারছি না। দানব নিয়ে এত আলোচনা, এত তোলপাড়, তার মধ্যে হোয়াইট শার্কের খোঁজে সাগরে বেরিয়েছে, সাহস আছে বলতে হবে।'

'পাইলটের ধারণা, হাঙরের টোপ ফেলছে না ওরা, বটলনোজ ডলফিনকে আকৃষ্ট করতে চাইছে। ডলফিন ধরা ফেডারেল আইনে বেআইনী

'ডলফিন!' অবাক হলো রানা।

'হ্যাঁ।'

'বোটটা চিনতে পেরেছে?'

'পেরেছে। ওয়াটারবোরোর বোট। সি-হান্টার।'

'অসম্ভব! ও ভুল করেছে।'

'কেন?'

'স্যামি! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!' রানা বলল। 'স্যামি মেডিনা দায়িত্বশীল চার্টার বোটম্যান, অসৎ বোটম্যানদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। প্রায়ই প্রতিবাদ সভা করে। ও ওরকম বেআইনী কাজ করবে?'

'প্লেন থেকে নামটা ভুলও দেখে থাকতে পারে পাইলট।'

'উঁহু, ভুল করেনি,' মাথা নাড়ল রানা। 'স্পটার প্লেনের পেশাদার পাইলট। পানির নীচের প্রাণী খুঁজে বের করে যার চোখ, সেই লোক বোটের নাম ভুল করবে, এ হতেই পারে না। দাঁড়ান, শিওর হয়ে নিই।'

'আমার সঙ্গে কী কথা বলতে এসেছিলেন বললেন না?' কেরি জিজ্ঞেস করল।

'এক মিনিট,' হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিল রানা, 'আসছি।'

কেরিও এল পিছন পিছন।

ছাউনিতে ঢুকল দুজনে। দেয়ালে বসানো একটা টেলিফোন। রিসিভার নামিয়ে এনে ডায়াল করল রানা। কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল। রিসিভার রেখে বলল, 'মাথায় ঢুকছে না কিছু!'

'কী?'

'স্যামি বাড়িতে বসে বড়শিতে ফ্লাই বাঁধছে। ছুটি কাটাচ্ছে আজ। সকালে এক লোক ওর কাছে গিয়ে সি হান্টারটা ভাড়া নিতে চায়। শুধু বোটটা নেবে। স্যামি কিংবা ওর ক্রুরা যেতে পারবে না সঙ্গে, কেন নিচ্ছে কোনও প্রশ্ন করা চলবে না। প্রতি

দিনের ভাড়া দশ হাজার ডলার।'

ভুরু কোঁচকাল কেরি। 'এত টাকা ভাড়া দিয়ে কী মাছ ধরবে?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল রানা। 'কে ভাড়া নিয়েছে জানেন?'

মাথা নাড়ল কেরি।

'জন্টি গ্র্যাহাম।'

'গ্র্যাহাম!'

'হ্যাঁ। আমি ভাবছি, এত টাকা ওই ছ্যাঁচড়াটা পেল কোথায়? প্রতিদিন দশ হাজার ডলার দিয়ে বোট ভাড়া নেয়ার ক্ষমতা জন্টি কেন, ওয়াটারবোরোর কারোরই নেই।'

'নিশ্চয় হোয়াইট শার্কটার পিছনে লাগেনি?'

'হাঙরের পিছু নিতে অত টাকা লাগে না। আমার ধারণা, কাউকে দানবের টোপ গিলিয়েছে জন্টি। তাকে নিয়ে দানব ধরতে বেরিয়েছে। এ ছাড়া আর কোনও যুক্তি আমার মাথায় ঢুকছে না।'

চল্লিশ

একটা ঝোপে শুয়ে আছে দানবটা। শুনছে আশপাশে বনের ভিতর থেকে আসা জন্তু-জানোয়ারের শব্দ। ডাঙার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে দ্রুত। শান দিচ্ছে মগজটাকে।

পানি থেকে উঠে আসার পর নানারকম পরিবর্তন হচ্ছে দেহের ভিতর, টের পাচ্ছে, কিন্তু কী হচ্ছে বোঝার ক্ষমতা নেই। পানির পরিবর্তে বাতাসে শ্বাস নিতে নিতে ক্রমেই ভ্যাসকিউলার সিস্টেম, হৃৎপিণ্ড এবং মগজের পরিবর্তন ঘটছে, তাতে করে উপলব্ধি বাড়ছে, অনেক কিছু মনে পড়ে যাচ্ছে। প্রচুর রাসায়নিক

পরিবর্তন ঘটছে দেহের ভিতর।

নিজের পরিচয় ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসছে। বহু জিনিস, অনেক প্রাণীর নামও মনে পড়েছে। ফিরে আসছে স্মৃতি। দূর অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতিগুলো এখন স্বপ্নের মত লাগছে। অতীত-ভবিষ্যৎ সব কিছুই ধোঁয়াটে, কুয়াশাচ্ছন্ন রয়েছে এখনও, তবে কুয়াশার জাল কাটতে আরম্ভ করেছে ধীরে ধীরে।

মাটিতে লম্বা গর্ত খুঁড়ে তাতে শুয়ে আছে ওটা। উপরে ডালপাতা ফেলে গা ঢেকে লুকিয়ে রেখেছে নিজেকে। পেট মোটামুটি শান্ত। অতি কৌতূহলী একটা কুকুর ঝোপের ভিতর উঁকি দিয়ে ওকে দেখে ফেলেছিল। ওটাকে মেরে খেয়ে নিয়েছে দানবটা।

বুনো প্রাণীকে ধাওয়া করে ধরতে পারবে না। পানিতে যে ক্ষিপ্রতা ছিল, ডাঙায় তা নেই। বুঝতে পারছে, এখানে শিকার ধরতে হলে কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। অস্বাভাবিক খাবারের চাহিদা ওর। কম খেলে যথেষ্ট শক্তি তৈরি হয় না শরীরে। শক্তির জন্য অনেক খাবার দরকার। খেলে শক্তি বাড়ে। সেই শক্তি খরচের তাগিদও বাড়ে। খুব দ্রুত খরচ করে ফেলতে হয়। আবার খিদে পায়। আবার খরচ করতে হয়। চলতে থাকে এভাবে। এ এক ভয়ঙ্কর চক্র। কখনও শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। সব সময় তাড়া করছে খিদে, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা।

আপাতত বিশ্রামে আছে ওটা। পাখির ডাক, কাঠবিড়ালীর হুটোপুটি, শিয়াল ও হরিণের পদশব্দ কানে আসছে। শুনতে পাচ্ছে বাতাসে দুলন্ত ডালে পাতার খসখসানি। কাছেই দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে সাগর। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ নতুন শব্দ কানে এল। ঝোপের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসা অসাবধানী পায়ের আওয়াজ। সেই সঙ্গে কথা।

আস্তে পাতা সরিয়ে উঠে বসল দানবটা। ফিরে তাকাল

শব্দের উৎসের দিকে।

শুকনো ডালে পা দিয়ে ফেলল তরুণ এরিক মট করে ভাঙল ডালটা।

'আহ্, দেখে চলতে পারো না?' বিরক্ত হয়ে বলল ওর বন্ধু রজার। 'এত শব্দ করলে শিকার থাকে নাকি। পালাবে তো সব।'

'পালাক। আমার এসব ভাল লাগছে না। প্রাইভেট প্রপার্টিতে শিকার করতে আসা ঠিক হয়নি আমাদের

'উফ্, আবার সেই এক কথা! কতবার বলব, এখানকার জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে মাথাই ঘামায় না জায়গার মালিক।'

'তাহলে "এখানে শিকার করা নিষেধ।" নোটিস লিখে রেখেছে কেন?'

'বীমা কোম্পানিকে দেখানোর জন্যে, আবার কেন!' রজার বলল। 'এখানে যা যা আছে–গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার–বীমা করানোর সময় সব কিছুর উল্লেখ করেছে।'

'তাহলে বীমা কোম্পানিই নালিশ ঠুকে দেবে আমাদের বিরুদ্ধে। পুলিশে ধরলে বুঝবে মজা। এখনও সময় আছে। চলো, ফিরে যাই।'

'এত কষ্ট করে এতদূর এসে ফিরে যাব? অহেতুক ভয় পাচ্ছ, এরিক। এত এত র‍্যাকুনের মাঝে একআধটা র‍্যাকুন খোয়া গেলে জানবেই না কেউ। তা ছাড়া গুলিও করছি না যে শব্দ শোনা যাবে।'

'হুঁ!' রজারের হাতের ধনুকের দিকে তাকাল এরিক। 'কিন্তু ওই জিনিস দিয়ে র‍্যাকুন মারা যাবে, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'তুমি একটা হাঁদা, এরিক। বললাম তো, এটা সাধারণ ধনুক নয়। এটা দিয়ে তীর ছুঁড়লে পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করে। রাইফেলের বুলেটের চেয়ে কম মারাত্মক নয়।

বলা যায় না, ভাগ্য ভাল হলে হরিণও পেয়ে যেতে পারি।'

'হরিণ মারবে! তা হলে আমি এখনই চলে যাচ্ছি। হরিণ মারলে আর ধরা পড়লে সোজা দশ বছরের জন্যে ঢুকিয়ে দেবে। কোন কথা শুনবে না।'

'গাধার মত কথা বোলো না। ধরতে পারলে তবে তো জেল।'

আরও কয়েক গজ এগোল ওরা। বড় একটা গাছ ঘিরে গজিয়ে ওঠা ঘন লতাপাতা ও ঝোপের কাছে এসে দাঁড়াল।

'চমৎকার জায়গা,' রজার বলল। 'এখানে লুকিয়ে থাকলে শিকার পাবই পাব।'

ঘন ঝোপে ঢুকল ওরা। গাছের গোড়া ঘুরে চলে এল অন্য পাশে।

'এহ্, বিছুটিতে ভর্তি!' নাকমুখ কুঁচকে বলল এরিক।

'তোমার পরনের জিনস ভেদ করে চামড়ায় লাগবে না বিছুটি।' চারপাশে তাকিয়ে আবার বলল রজার, 'চমৎকার জায়গা!'

'কাঁটাঝোপ আর বিছুটিতে ভরা এ রকম একটা জায়গাকে চমৎকার জায়গা মনে হলো তোমার?'

'তাই তো। দেখছ না, চেসনাট গাছ। র‍্যাকুন আর হরিণের প্রিয় ফল। অন্যদেরও প্রিয়।'

'অন্য কারা?'

'বুনো প্রাণী...কথা বললে বোঝো না নাকি?' ধৈর্য হারাচ্ছে রজার।

'আসে গায়ে বিছুটি লাগাতে?'

'নাহ্, আর পারা গেল না! তোমার মাথায় কি ঘিলুটিলু কিছু নেই নাকি? জন্তু-জানোয়ারের চামড়ায় বিছুটি লাগলে কিছু হয় না। এখন বকবকানি বাদ দিয়ে একটু চুপ করবে!'

গাছের গোড়ায় হাঁটু গেড়ে বসল ওরা। কোমরে বাঁধা তূণ থেকে স্টিল-পয়েন্টেড একটা গ্রাফাইট বোল্ট বের করল রজার

আট ইঞ্চি লম্বা। ধনুকটা মাটিতে রেখে, তার টেনে এনে, কক করল; বোল্টটা বসিয়ে দিল স্লটে।

'এ কোনও তীর হলো?' এরিক বলল, 'পিছনে পালক নেই, কিছু নেই...'

'এ সব বোল্টে পালক লাগে না। রাইফেলের গুলির মত ঘুরতে ঘুরতে বেরোবে। সোজা ছুটে যাবে বাতাস কেটে।'

'মাথায় তো আঁকশিও নেই, তীরের মত।'

'বুলেটেরও তো থাকে না, তাতে কী? নিশানা খুব ভাল এই তীরের, আমি জানি। প্রচণ্ড ক্ষমতা। শুনেছি জায়গামত লাগাতে পারলে গণ্ডারও মারা যায়।'

'হুঁহ্, তীর দিয়ে গণ্ডার মারে! র‍্যাকুন মরে কি না দেখো...

'চুপ! একদম চুপ!' ধমকে উঠতে গিয়েও স্বর নামাল রজার। আওয়াজ শুনলে এদিকের ছায়াও মাড়াবে না জন্তু-জানোয়ার।

দুটো মানুষ। সাগরে থাকতে যে দুর্বল প্রাণীগুলোর নাম মনে করতে পারছিল না দানবটা, এখন সেটা মনে পড়ে গেছে। একটা মানুষ অন্যটার চেয়ে মোটা। মানুষেরা জন্তু-জানোয়ারের মত ক্ষিপ্র নয়। শক্তিও অনেক কম। দুর্বল প্রাণী। এই মানুষ দুটোর একজনের হাতে অস্ত্র আছে। অস্ত্রটা কী, চিনতে পারল না দানবটা। মগজে বসে কে যেন সাবধান করে দিল ওটাকে—সশস্ত্র মানুষরা বিপজ্জনক হয়।

সাবধানই রয়েছে দানবটা। অপেক্ষা করছে। দেখছে ওরা কী করে। এক, দুই করে পার হয়ে যাচ্ছে শেষবিকেলের মুহূর্তগুলো।

কিছুই করছে না ওরা। ঝোপের মধ্যে চুপচাপ বসে রয়েছে

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে বাঁয়ে সরতে শুরু করল দানবটা। বুনো প্রাণীর মত নিঃশব্দে এগোতে শুরু করল মানুষ দুটোর দিকে। ঠিক করে ফেলেছে, প্রথমে মোটাটাকে ধরবে।

'কীসের শব্দ?' এরিকের প্রশ্ন।

'কই শব্দ?'

'ওই যে শুনলাম আমাদের পিছনে।'

ঘুরে তাকাল রজার। ঝোপ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। 'কিছু না।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'এখানে আমরাই শিকারী। আমাদেরকে শিকার করার মত কিছু নেই এ জঙ্গলে।'

'যা-ই বলো, বন-জঙ্গল আমার ভাল লাগে না,' এরিক বলল। পিছনের ঝোপের দিকে তাকিয়ে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'এই! রজার!'

দানবটা বুঝল, মানুষগুলো দেখে ফেলেছে ওকে। ওর দিকে তাকিয়ে আছে। আঙুল তুলে কিছু বলছে। চিৎকার করছে।

স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল দানবটা। দুই লাফে মোটা মানুষটার কাছে চলে এল। এক হাতের নখ বিঁধিয়ে দিল বুকে, অন্য হাতের নখ দুই চোখের ভিতর ঢুকিয়ে, কপাল আঁকড়ে ধরে, মাথাটা পিছনে টেনে নিল তারপর টানটান হয়ে যাওয়া গলায় দাঁত বসিয়ে এক কামড়ে কণ্ঠনালী কেটে ফেলল।

কয়েক সেকেন্ডও লাগল না একটা মানুষকে মেরে ফেলতে

অন্য মানুষটার দিকে ঘুরল তখন দানবটা।

'ওহ্ গড! জেসাস!' চিৎকার করে পিছু হটল রজার। বিশালদেহী সাদা একটা দৈত্য কালো দুটো হাত বাড়িয়ে এরিককে ধরে মেরে ফেলছে। কাটা গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

গাছের গায়ে পিঠ ঠেকল রজারের।

এরিককে মেরে ওর দিকে ফিরল দৈত্যটা। হলুদ চুল, ইস্পাতের দাঁত, সাদা চোখে মণি নেই। মুষ্ঠিযোদ্ধার মত দেহ কাঁধের কাছ থেকে নখ পর্যন্ত হাত দুটো কালো–ভয়ঙ্কর।

ঝটকা দিয়ে ধনুক তুলল রজার। দানবটার দিকে তাক করে কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরোল না। ট্রিগার টিপে দিল ও।

গ্রাফাইট বোল্টটা স্লট থেকে ছুটে গেল। ঝাঁকি লাগল ধনুকে। রজার দেখল, বোল্টটা গিয়ে দৈত্যটার গায়ে বিঁধেছে ক্ষত থেকে রক্তের মত কী যেন বেরোল।

কিন্তু থামাতে পারল না দৈত্যটাকে। এগিয়ে আসছে।

আতঙ্কে গুঙিয়ে উঠল রজার। হাত থেকে ধনুকটা ছেড়ে দিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরেই গাছের পাশ দিয়ে দিল দৌড়।

বুকের কাছে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা, ঠিক পাঁজরের নীচে। সেদিকে তাকাল দানবটা। কী যেন একটা বেরিয়ে আছে। এক হাত দিয়ে চেপে ধরে টেনে মাংসের ভিতর থেকে বের করে আনল জিনিসটা। ছুঁড়ে ফেলে দিল।

জখমটা মারাত্মক নয়, দেহের ভিতরের ভাইটাল কোনও যন্ত্রের ক্ষতি করেনি, তবে প্রচণ্ড ব্যথা গতি কিছুটা ধীর করে দিল ওটার, মনোযোগ সরিয়ে দিল। আবার যখন মুখ তুলে তাকাল, শিকারকে ছুটে যেতে দেখল ঝোপের ভিতর দিয়ে। পিছু নেবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে নিতে হারিয়ে গেল শিকার। মোটা মানুষটা, যেটাকে মেরে ফেলেছে সেটার দিকে তাকাল দানবটা। গর্তের কাছে টেনে নিয়ে যেতে হবে।

বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে মগজ খুলে যাচ্ছে দানবটার চিন্তার ক্ষমতা বাড়ছে। ভাবছে, ওকে মারার জন্য ফিরে আসতে পারে অন্য মানুষটা। সঙ্গে করে আরও মানুষ নিয়ে আসতে পারে বিপদের মধ্যে রয়েছে ও বাঁচার ব্যবস্থা করা দরকার।

বসে পড়ল গাছের গোড়ায় পিঠ ঠেকিয়ে। কী করতে হবে, একে একে জানিয়ে দিচ্ছে ওর মগজ: বাঁচতে হলে প্রথমেই জখম হওয়া জায়গাটার রক্তপাত বন্ধ করতে হবে। বনতল থেকে পাতা

কুড়িয়ে নিল ও, গাছের গা থেকে শ্যাওলা চেঁছে নিল। ঠেসে ভরল তীরের খোঁচায় তৈরি হওয়া ফুটোটাতে।

তারপর পুষ্টি ও শক্তি সংগ্রহের জন্য খাওয়া শুরু করল। মানুষটার গা থেকে নখ দিয়ে মাংস চিরে ফালি ফালি করে তুলে মুখে পুরে গোগ্রাসে গিলতে লাগল—বুক, কাঁধ, হাত, নিতম্ব, উরু। মোটা কয়েকটা হাড় কামড় দিয়ে ভেঙে ভিতরের শাঁস খেয়ে পেট ভরে গেল। তারপরও গিলতে থাকল। বমি করে ফেলার অবস্থা হলো যখন, তখন বন্ধ করল খাওয়া।

এরপরের চিন্তা: পালানো। নতুন আরেকটা নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। বেশি দেরি করলে রাত হয়ে যাবে।

উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ওটা। সাগরের কিনারে গাছপালা ও ঝোপঝাড় যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে এসে থামল। চারপাশে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল, ও একা; আশপাশে আর কেউ নেই। হেঁটে গিয়ে পানিতে নামল।

আগের মত ডুবে থাকার ক্ষমতা হারানোয় জলজ প্রাণী ধরা বেশ কঠিন হয়ে গেছে—কালেভদ্রে মেলে এক-আধটা। বাঁচার জন্য ডাঙার প্রাণীই এখন ভরসা। দূরে একটা ইয়ট চোখে পড়ায় নতুন আইডিয়া এল মাথায়: ওগুলোতে উঠতে পারলে খাবারের জন্যে আর চিন্তা করতে হবে না। এক দমে মিনিট দশেক থাকতে পারে পানির নীচে। কাজেই দূর থেকে ডুব সাঁতার দিয়ে সহজেই পৌঁছতে পারবে ও বোটের তলায়, তারপর সময় ও সুযোগ বুঝে উপরে উঠে একটা শিকার ধরেই লাফিয়ে পড়বে পানিতে।

সন্তোষ বোধ করল দানব। ডাঙায়, ভাসমান ডাঙা—মানে, বোটে আর পানির নীচে—যখন যেখানে সুবিধা, সেখান থেকেই খাবার সংগ্রহ করতে পারবে ও কিন্তু ঘুমের প্রয়োজন আছে ওর। পানির নীচে ঘুমানোর উপায় নেই আর, তাই নিত্য-নতুন ডাঙা খুঁজে বের করতে হবে ওকে। এমন কোনও জায়গা, যেখানে নিরাপদে লুকিয়ে থাকতে পারবে, শিকারও মিলবে।

একচল্লিশ

সাগরে ঢেউ তোলার মত সামান্যতম বাতাসও নেই। পানির উপরিভাগ কাঁচের মত মসৃণ, সমতল। সেই পানি কেটে শেষ বিকেলে মাঝারি গতিতে ছুটে চলেছে ম্যাকো বোটটা।

'এত টাকা কে দিচ্ছে বুঝতে পারছি না,' বলল রানা।

'হবে হয়তো কোনও টিভি প্রডিউসার,' হালের কাছ থেকে জবাব দিল বিগ।

ব্লক আইল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে গভীর প্রণালীতে একটিমাত্র বোট নোঙর করা রয়েছে; এখনও সিকি মাইল দূরে, তবু দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলল বিগ। 'স্যামির বোটটাই,' বলল ও। 'সাদার মধ্যে নীল স্ট্রাইপ, টিউনা টাওয়ার, আউটরিগার ইঞ্জিন।'

সূর্যটা ওদের পিছনে রয়েছে, পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়ছে আরও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বোটের দিকে তাকাল রানা। ককপিটে দুজন লোক। একজন জন্টি গ্র্যাহাম। অন্য লোকটা বিশালদেহী। বগলের নীচে একে-ফোরটিসেভেন রাইফেল।

একশো গজ দূর দিয়ে বোটটার পাশ কাটাল বিগ।

কারও হাতে ক্যামেরা দেখল না রানা। ছবি তোলার সরঞ্জামও নেই। 'ছবি তুলতে তো আসেনি। তারমানে শিকার করতে এসেছে। দানব শিকার বিগ, বোটটার গায়ে লাগান তো।'

সাঁই করে ম্যাকোর নাক ঘুরিয়ে দিল বিগ। গিয়ার বদল করে নিউট্রাল করে দিল ইঞ্জিন। আপন গতিতে ভেসে এসে মাছধরা

বোটটার গায়ে ঠেকল বিগের বোট।

পাশ দিয়ে ঝুঁকে চিৎকার করে উঠল জন্টি, 'আবার এসেছ জ্বালাতে! কী পেয়েছ বলো তো? আমার পিছনে লেগেছ কেন? কামাই-রোজগার সব বন্ধ করে দিতে চাও নাকি?'

'বেআইনী কাজ করে টাকা কামাতে দেব না,' সাফ জানিয়ে দিল বিগ। 'ডলফিন মেরে দেখই না খালি, এমন অবস্থা করে ছেড়ে দেব, লাল ঘরে ঢুকে যাতে আর বেরোতে না পারো।'

'ডলফিন মারতে এসেছি কে বলল তোমাকে?'

'তাহলে কী মারতে এসেছ?'

'সেটা তোমাকে বলব কেন?'

'কিছু যে একটা করতে এসেছ, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে।'

জন্টির সঙ্গে বিগ তর্ক করছে, আর রানা তাকিয়ে আছে অন্য লোকটার দিকে। রাইফেলটা এখন বুকের ওপর আড়াআড়ি ধরে রেখেছে লোকটা। ওপর দিকে তাকাল রানা। ভিডিও ক্যামেরাটা চোখে পড়ল। ফিশিং বোটের ফ্লাইং ব্রিজের কিনারে বসানো রয়েছে, ওদের দিকে তাকিয়ে আছে ওটার চোখ, ম্যাকো বোটটা সহ ওদের নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নড়ছে, ছবি তুলে নিচ্ছে ওদের।

'হোয়াইট শার্ক মারতে বেরিয়েছি,' বিগ ও রানা সহজে যাবে না বুঝে ওদের বিদেয় করার জন্য বলল জন্টি। 'বড় সাইজের একটা হাঙরের চোয়াল কম করে হলেও পাঁচ হাজার ডলারে বিকোবে। সহজ কামাই।'

'ওসব বলে ধোঁকা দিতে পারবে না আমাকে, জন্টি। আমি জানি কী ধরতে বেরিয়েছ তুমি...

বাধা দিয়ে বলল রাইফেলধারী, 'যা-ই ধরি না কেন, বেআইনী কোন কাজ করছি না, শিওর থাকতে পারেন।'

'হয়তো বেআইনী নয়। তবে কী খোঁজাখুঁজি করছেন, সেটা আমরা জানি,' এবার বলল রানা।

'কী?' ভুরু নাচাল লোকটা।

'জানি, বললাম তো। ডলফিন মারতে আসেননি আপনারা। হোয়াইট শার্কও নয়। ওসব মারতে প্রতিদিন দশ হাজার ডলার খরচ করে বোট ভাড়া নিতে হয় না। এরচেয়ে অনেক কমে বোট পেতেন ওয়াটারবোরোতে...

হঠাৎ ককপিটে রাখা অদৃশ্য একটা লাউডস্পিকারে যান্ত্রিক স্বরে কথা শোনা গেল, 'ব্রুনো, এখানে এসো!' ইংরেজিতে কথা বললেও উচ্চারণে কড়া বিদেশী টান।

রাইফেলটা জন্টির হাতে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। কেবিনে ঢুকে গেল

মাছধরা বোটটার পাশে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে বিগের ম্যাকো বোট। সরে যাচ্ছে ওটার কাছ থেকে। ইঞ্জিনে গিয়ার দিয়ে বোটটাকে আবার ওটার গায়ে এনে ঠেকাল বিগ।

রাইফেলটা কোমরের কাছে ধরে ওদের দিকে তাক করে রেখেছে জন্টি।

'ওটা সরাও, জন্টি,' বিগ বলল, 'বোকার মত মানুষের দিকে তাক করে রেখো না। এভাবেই অ্যাকসিডেন্ট হয়। গুলি করার সাহস তোমার হবে না কোনদিন।'

'পরীক্ষা করে দেখতে চাও?' জন্টি জবাব দিল।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল অন্য লোকটা। বিগের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার বোটের দড়িটা ছুঁড়ে দিন রানাকে বলল, 'উঠে আসুন।'

'কেন?' জানতে চাইল রানা।

গমগম করে উঠল লাউডস্পিকার, 'মিস্টার রানা, আপনাকে বলছি!'

ভিডিও ক্যামেরাটার দিকে চোখ তুলে নিজের বুকে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আমাকে?'

'হ্যাঁ, আপনাকে। আপনি বলছেন, আমরা কী করছি তা

আপনি জানেন?'

'জানি,' জবাব দিল রানা।

'মনে হচ্ছে, আমরা একই জিনিস খুঁজছি, মিস্টার মাসুদ রানা। ভিতরে আসুন, প্লিজ!'

বিয়াল্লিশ

কেবিনটা অন্ধকার। দরজায় গাঢ় রঙের কাঁচ লাগানো। জানালার ভারি পর্দাগুলো টানা। ভিতরে কনকনে ঠাণ্ডা, এয়ার-কন্ডিশনারের কুলার অতিরিক্ত বাড়ানো; বাতাস শুকনো। আর্দ্রতাশূন্য করে রাখা হয়েছে যতটা সম্ভব।

অন্ধকার চোখে সয়ে এলে রানা দেখল, কেবিনের সমস্ত আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। একটা পোর্টেবল ইনটেনসিভ-কেয়ার ইউনিট বসিয়ে দেয়া হয়েছে যেন। ঘরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা মোটরচালিত হুইলচেয়ার, তাতে একজন মানুষ। ডিজিটাল মনিটর থেকে একটা ঝোলানো বোতলের ভিতর দিয়ে আসা রবারের নলের মাথা ঢুকে গেছে এক হাতের কনুইয়ের কাছে, শিরায় অন্য হাতে ধরে রেখেছে অক্সিজেন ট্যাংক থেকে আসা একটা হোস পাইপের এক মাথা। তাঁর পিছনে আরও অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি. সেগুলোর মধ্যে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ যন্ত্র ও ব্লাডপ্রেশার মাপার জন্য স্ফিগমোম্যানোমিটার রয়েছে। চোখের সামনে মাথার উপর ঝোলানো একটা কালার মনিটর; তাতে ম্যাকো বোটটা সহ মাছধরা বোটের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে

মানুষটি বৃদ্ধ। বয়েস ঠিক কত, বোঝার উপায় নেই। মাথার চুল পরিষ্কার করে কামানো। চোখে সানগ্লাস। ঝুলে পড়া চওড়া কাঁধ দুটো বলে দিচ্ছে একসময় বিশালদেহী শক্তিশালী একজন মানুষ ছিলেন তিনি। পা থেকে বুক পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা।

অক্সিজেন-পাইপ ধরা হাতটা উঁচু করলেন তিনি। হলুদ স্কার্ফের মত কিছু বাঁধা রয়েছে গলায়। সেটার ভাঁজ সরিয়ে গলায় চেপে ধরলেন পাইপের মাথাটা। তারপর কথা বললেন। অবাক হলো রানা। মুখ থেকে বেরোচ্ছে না শব্দগুলো, শোনা যাচ্ছে পিছনে বসানো একটা বাক্স থেকে—কোনও ধরনের অ্যামপ্লিফায়ার ওটা।

'কোথায় আছে ও, মিস্টার রানা?'

'কার কথা বলছেন?'

'যার কথা একটু আগে বললেন আপনি।'

'দানবটা?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

আবার নলের মাথা গলায় চেপে ধরলেন বৃদ্ধ। 'এক সময় মানুষ থাকলেও এখন আসলেই দানব ওটা, মিস্টার রানা। ভয়ানক এক গবেষণার মর্মান্তিক শিকার। মিউট্যান্ট। হিংস্র শিকারী। খুন না করে থাকতে পারে না। খুন করার জন্য মগজে প্রোগামিং করা হয়েছে। ওটা এখন ভয়ঙ্কর এক কিলিং মেশিন।'

'কে বানিয়েছে? আপনি?'

'বলব। সব বলার জন্যই ডেকে এনেছি। আপনার সাহায্য দরকার আমার। ওটাকে আটকাতে না পারলে...' এলিয়ে পড়লেন তিনি। দম ফুরিয়ে গেছে।

'মর্মান্তিক গবেষণার শিকার বলে কী বোঝাতে চাইছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কীসের গবেষণা?'

'বসুন,' দরজার পাশে রাখা একটা চেয়ার দেখালেন বৃদ্ধ।

বসল রানা। টেলিভিশন মনিটরের দিকে তাকাল। পানিতে মাছের নাড়ীভুঁড়ি ও রক্ত ফেলতে দেখল জন্টিকে। অন্য লোকটা,

ক্রুনো, মাছধরা বোটের পিছনে বসে আছে। রাইফেলটা কোলের ওপর। টিভি স্ক্রিনের পাশেই একটা টিন্টেড কাঁচঢাকা পোর্ট হোল, ওর ভিতর দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে একটা পাল তোলা ইয়ট, তার ওপাশে ব্লক আইল্যান্ডের একাংশ।

বৃদ্ধ বললেন, 'ওকে দেখলেই গুলি করবে ক্রুনো। রাইফেল নিয়ে বসে আছে সেজন্যে।'

'তারমানে ওটাকে মারা সম্ভব?' রানার প্রশ্ন।

'যে আভিধানিক অর্থে বেঁচেই নেই, তাকে আপনি কী করে মারবেন?' বৃদ্ধের কথার শব্দে অতি সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করল রানা, যেন হাসছেন তিনি। 'তবে বলতে পারেন "ধ্বংস করা" সম্ভব হাতের নলের মাথাটা গলায় চেপে ধরলেন তিনি। বললেন, 'সব জানতে হলে আমার কথা একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে আপনাকে, মিস্টার রানা।'

মাথা কাত করল রানা। 'আমার আপত্তি নেই। তবে সংক্ষেপে সারতে হবে আমিও খুঁজছি ওটাকে, একই উদ্দেশ্যে।'

'আমার নাম জোসেফ স্টাইন,' বৃদ্ধ বললেন। 'মিউনিখে জন্মেছি। ইহুদি। বাবার একটা ফার্মেসি ছিল। যুদ্ধের আগের কয়েকটা বছর সেখানে কাজ করেছি। সময় থাকতে পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের, বাবার জন্যে পারিনি। মানুষকে বিশ্বাস করতেন তিনি, মানবজাতির ভাল ছাড়া মন্দ কামনা ছিল না তাঁর মনে। মানুষ মানুষকে কতটা কষ্ট দিতে পারে ভাবতেই পারেননি, তাই জার্মানরা ইহুদিদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালানোর কথা শুনেও বিশ্বাস করেননি। তারপর অনেক দেরি হয়ে গেল। পালানোর উপায় আর রইল না তখন।' একটু থেমে বৃদ্ধ বললেন, 'এক রাতে আমার বাবা-মা ও দুই বোনকে শেষ দেখেছি একটা অচেনা গাঁয়ের কিনারে গরুর গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর কথার স্বর করুণ হয়ে এল কি না, ঠিক বোঝা গেল না যন্ত্রের

ভিতর দিয়ে আসছে বলে

নলের মাথা গলায় চেপে ধরলেন স্টাইন। বার বার এভাবে নলের মাথা গলায় চেপে ধরাটা বিস্মিত করল রানাকে। তবে কোন প্রশ্ন করল না। দুই সেকেন্ড পর স্টাইন বললেন, 'আমাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল, কারণ আমি তখন যুবক। সুস্থ, স্বাস্থ্যবান, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি ছিল আমার। আরও অনেকের সঙ্গে শ্রমিকের কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল আমাকে। তখনও জানতাম না একটা মড়া পোড়ানোর চুল্লি বানাচ্ছিলাম আমরা, নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছিলাম। অমানুষিক পরিশ্রম করাত। খাবার দিত কম। পুষ্টির অভাবে আমার স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করল। বুঝতে পারছিলাম, এভাবে চললে বেশি দিন টিকব না। মরে যাব। একটা প্রার্থনাই করতাম সারাক্ষণ, চুল্লিতে ফেলার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়। কেউ দুর্বল, কাজের অনুপযুক্ত হয়ে গেলে জ্যান্তই তাদেরকে আগুনে ফেলে দিত ওরা...

'একদিন এক নতুন ডাক্তার এসে হাজির হলেন আমাদের ক্যাম্পে। ফার্মাকোলজিতে অভিজ্ঞতা আছে আমার এটা লেখা ছিল আমার ফাইলে। ঠল দেখে আমাকে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে নিয়ে গেলেন ডাক্তার। তাঁর নাম হেনরিখ স্কপ। ভয়ঙ্কর ইহুদি-বিদ্বেষী। মানুষ নিয়ে গবেষণা করতে করতে এক অসম্ভব চিন্তা মাথায় ঢুকল তাঁর।'

'কী চিন্তা?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'ঈশ্বরের কাজে নাক গলানো, খোদার ওপর খোদকারি। প্রথমে তিনিও ভাবেননি সফল হবেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝে গেলেন কাজটা সম্ভব। নাৎসি সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ মহলে পৌঁছে গেল তাঁর সাফল্যের খবর। টাকা আসতে থাকল স্রোতের মত. কাজ এগিয়ে নিতে উৎসাহ দেয়া হলো তাঁকে।'

'কিন্তু কাজটা কী?' আর ধৈর্য রাখতে পারল না রানা। 'কী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন স্কপ?'

'উভচর যোদ্ধা,' স্টাইন বললেন। 'সেটা ছিল উনিশশো চল্লিশের দশক। আজকের নিউক্লিয়ার সাবমেরিন–যেগুলো যতক্ষণ ইচ্ছে পানিতে ডুব দিয়ে থাকতে পারে–তখনও আবিষ্কার হয়নি, স্কুবা ডাইভিং তখনও শিশু। সাগরতল মানুষের নাগালের বাইরে। কল্পনা করুন, সে-সময় এমন একটা প্রাণী সৃষ্টি করা হলো যেটার বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, ট্রেনিং দিয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর খুনী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে এবং যেটার ক্ষমতা সাগরের যে কোনও শিকারী প্রাণীর চেয়ে বেশি।'

'নাৎসি কিলার ওএইল!' রানা বলল। 'খুনী তিমিকে ট্রেনিং দিয়ে...'

'না,' বাধা দিলেন স্টাইন। 'তারচেয়ে অনেক বেশি উন্নত প্রাণী। তিমিকেও শ্বাস নিতে ভেসে উঠতে হয়; স্কপের প্রাণীটিকে উঠতে হয় না। পানির নীচে ডুব দিয়ে থাকতে পারে যতক্ষণ খুশি, হাজার ফুট নীচে নামতে পারে, বোমা পাততে পারে জাহাজে, গুপ্তচরের কাজ করতে পারে। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী আর ধ্বংসাত্মক অস্ত্র হিসেবে প্রাণীটিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন স্কপ।'

'পাগলামি!' বিড়বিড় করল রানা।

'না, পাগলামি নয়। ষাটের দশকে ডিউক ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর ঠিক এই কাজটিই করতে চেয়েছিলেন। তিনি গবেষণা শুরু করেন ইঁদুর নিয়ে। ইঁদুরকে উভচর প্রাণীতে রূপান্তরিত করেন তিনি। পানিতে ডুবে থেকে শ্বাস নিতে পারত ইঁদুরগুলো। ফুসফুসে পানি ঢুকে গিয়ে দম আটকে মরত না। এতে করে বেন্ডে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। এ রকম একটা ইঁদুরকে তিনি মেশিনে ভরে এত দ্রুত ডিকম্প্রেস করেন যেটা তিন সেকেন্ডে হাজার ফুট পানির নীচ থেকে মানুষকে ঘণ্টায় সাতশো মাইল গতিতে ওপরে তুলে আনার সমান। ইঁদুরটা বেঁচে গিয়েছিল। তিনি বুঝলেন, ইঁদুরের ওপর সফলতা এসেছে, মানুষের ওপরও আসবে। কিন্তু ওই গবেষণা মাঝপথে বন্ধ করে

দিয়েছিলেন তিনি, কারণ ওরকম প্রাণী সৃষ্টির আর প্রয়োজন ছিল না। ততদিনে রোবট চলে এসেছে, সাবমার্সিবল তৈরি হয়ে গেছে, মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সফল ও ঝুঁকিহীনভাবে কাজ করতে সক্ষম ওগুলো। তবে তিনি নিশ্চিত ছিলেন, উভচর মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব।'

দম নিয়ে স্টাইন বললেন আবার, 'তরলের মধ্যেই জন্ম আমাদের, মায়ের পেটে ভ্রূণ থাকার সময় তরলেই শ্বাস নিই। বেড়ে উঠি। বিজ্ঞানীদের যুক্তি, মায়ের পেটে যদি তরলের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে মানুষ, বাইরে বেরিয়ে কেন পারবে না? ফ্লিপার ও ফুলকো তৈরির চিহ্নও পাওয়া গেছে ভ্রূণের গায়ে। বাতাস থেকে অক্সিজেন নিলেও আমাদের ফুসফুসে থাকে তরল পদার্থ। সেটা শুকিয়ে ফেললে ফুসফুস মরে যায়। তাতে কী বোঝায়?'

'স্কপ সফল হয়েছিলেন?' রানার প্রশ্ন।

'প্রায়,' জবাব দিলেন স্টাইন। 'আর কিছুটা সময় হাতে পেলে পুরোপুরিই সফল হতেন। কিন্তু থেমে গেল যুদ্ধ। উভচর মানুষ বানাতে প্রথমে কাঁচামালের সমস্যায় পড়েন। যা পেতেন সবই ছিল বন্দিশিবিরের দুর্বল, অসুস্থ, পুষ্টিহীনতার শিকার ইহুদি। অপারেশনের শুরুতেই ইনফেকশনে আক্রান্ত হতো ওরা, মারা যেত, তার কারণ অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না সেকালে। পানিতে শ্বাস নিতে পারবে কিনা বোঝার জন্য স্যালাইন সলুশন ও ফ্লুরোকার্বন দিয়ে ফুসফুস ভরে দিতেন। বেশির ভাগই দম আটকে মারা যেত। এ সব মানব-গিনিপিগের ওপর গবেষণা চালিয়ে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন স্কপ, এ সময় পেয়ে গেলেন একজন উপযুক্ত মানুষ। স্বয়ং হিটলার পাঠিয়েছিলেন সেই মানুষটাকে। স্কপের গিনিপিগ হওয়ার জন্যে আদর্শ। নাম ফন ফকনার। সাড়ে ছয় ফুটের ওপরে লম্বা, ঈর্ষা করার মত দেহের গঠন। উনিশশো ছত্রিশ সালের অলিম্পিক গেমসে শট পুট, জ্যাভেলিন থ্রো ও

হ্যামার থ্রো'র জন্যে সোনা জিতে ন্যাশনাল হিরো বনে গিয়েছিল। তারপর সিক্রেট সার্ভিসে যোগ দেয় ও, কমিশন পায়। যুদ্ধ এলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দুয়ার খুলে যায় ওর সামনে। মায়াদয়া, ভয়ডর বলে কিছু ছিল না। চূড়ান্ত নিষ্ঠুর। জাত খুনী। মাথার গোলমালটা তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। নিঃসঙ্গ। একা থাকত একটা ফ্ল্যাটে। গোপনে মানুষ খুন করে যাচ্ছিল ইচ্ছেমত। পতিতারাই ছিল ওর প্রধান শিকার। ও যে উন্মাদ, সেটা প্রকাশ পেল এক রাতে মদ খেতে গিয়ে বারের মধ্যে তিনজন মানুষকে খুন করে ফেলার পর। এখন হলে ডাক্তাররা হয়তো ওকে সেকসুয়াল সাইকোপ্যাথ কিংবা প্যারানয়েড স্কিৎসোফ্রেনিক বলতেন; কিন্তু উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে স্রেফ হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক রায় দিয়ে দিলেন। বিচারে মৃত্যুদণ্ড দিল আদালত। কিন্তু কার্যকর করার আগেই উচ্চ মহলের কেউ একজন রাইখের হয়ে একটা শেষ সার্ভিস দেয়ার জন্যে বেছে নিয়েছিল ওকে। পাঠিয়ে দিয়েছিল আমাদের কাছে।'

'আমাদের কাছে মানে?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আপনিও কি স্কপকে সহযোগিতা করেছেন?'

'করেছি। না-করে উপায় ছিল না,' জবাব দিলেন স্টাইন। 'বাঘ সামলানোর চেয়ে কঠিন ছিল ফকনারকে সামলানো। একের পর এক অপারেশন চালানো হয়েছিল ওর ওপর। খাঁচায় আটকে রেখে কাঁচা মাংস খেতে দেয়া হতো। ভিটামিন ইঞ্জেকশন দেয়া হতো। অজ্ঞান করে মগজে প্রোগ্রামিং করা হয়েছে বায়োফিডব্যাক ও সাবলিমিন্যাল কন্ডিশনিং পদ্ধতিতে, যেটাকে এখনকার দিনেও অত্যাধুনিক বলতে হবে। কাজ প্রায় শেষ করে এনেছিলেন স্কপ, আর মাত্র একটা ধাপ বাকি ছিল, এ সময় মিত্র বাহিনী এসে বন্ধ করে দিল ক্যাম্প। ফকনারকে কোনমতেই ফেলে যেতে চাইলেন না স্কপ, ওকে সঙ্গে নিয়ে পালালেন। পালানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল জার্মান নেভির হিটলার ভক্ত একজন অফিসার। স্যালাইন সলিউশন ও ফ্লুরোকার্বনে ভর্তি একটা ব্রোঞ্জের বাক্সে

ফকনারকে ভরে ট্রাকে তুলে দেয়া হলো। স্কপ গেলেন পায়ে হেঁটে। জার্মান ইউ বোটে করে দক্ষিণ আমেরিকায় যাবার কথা ছিল তাঁর। আর কোনদিন দেখা হয়নি আমাদের।'

'মিত্র বাহিনী আপনাকে ধরেনি?' জানতে চাইল রানা।

'ধরেছিল।'

'শাস্তি দেয়নি?'

'কীসের শাস্তি?'

'মানুষ খুনের। স্কপের সঙ্গে কাজ করেছেন আপনি, মানুষ খুনে সহযোগিতা করেছেন পিশাচটাকে।'

'ওদের নিশ্চয় মনে হয়েছিল,' স্টাইন বললেন–কথার শব্দে আবার সেই রহস্যময় হাসির ছোঁয়া, 'মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে অনেক বড় শাস্তি আমাকে স্কপই দিয়ে ফেলেছেন। দেখতে চান?'

হুইলচেয়ারে ঝুঁকে বসলেন তিনি। টেলিভিশন মনিটরের আলো পড়ল তাঁর মুখে। সানগ্লাস খুলে নিলেন। তাঁর একটা চোখ স্বাভাবিক, অন্য চোখটা ডিমের কুসুমের মত হলুদ। গলার স্কার্ফের মত জিনিসটা খুলে ফেললেন। দেখা গেল, তাঁর গলার দুই পাশে তিনটে করে চেরা দাগ। চেরাগুলো মাছের ফুলকোর মত। ক্ষত শুকিয়ে গেছে অনেক আগেই। আর গলার ঠিক মাঝ বরাবর কালো একটা গর্ত। সেই গর্তে অক্সিজেন ট্যাংক থেকে আসা নলের মাথাটা ঢুকিয়ে দিলেন।

'ওহ্, মাই গড!' তাকিয়ে আছে রানা। এতক্ষণে বুঝল, নলের মাথা বার বার গলায় চেপে ধরার কারণ। গর্তের মুখে নলের মুখ চেপে ধরে ট্যাংক থেকে ফুসফুসে অক্সিজেন নিচ্ছিলেন তিনি। 'চেরাগুলো কী? ফুলকো?'

'ফুলকো বানানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল স্কপ। আমাকেও গিনিপিগ বানানো থেকে রেহাই দেয়নি।' আবার সানগ্লাস পরলেন স্টাইন। 'এ ধরনের পরীক্ষা আরও অনেকের ওপর চালানো হয়েছিল, একমাত্র আমিই বেঁচে গিয়েছিলাম। ফ্লুরোকার্বন সহ্য

করার ক্ষমতা ছিল না আমার ফুসফুসের। তবুও বার বার ওই রাসায়নিক তরলে ভরে দেয়া হয়েছে আমার ফুসফুস। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে ফিরে এসেছি। আমাকে মরে যেতে দিলে বেঁচে যেতাম, কিন্তু স্কপ তা করেনি। ছোট একটা ক্রেনের শিকলে আমার পা বেঁধে মাথা নীচের দিকে করে ঝুলিয়ে রাখত, যতক্ষণ না মুখ দিয়ে সমস্ত তরল আমার ফুসফুস থেকে বেরিয়ে যেত, তারপর নতুন করে আবার ভরা হত রাসায়নিক তরল। সে যে কী যন্ত্রণা...আমাকে বাঁচিয়ে রাখার কারণ, আমাকে ওর প্রয়োজন ছিল...

'অপারেশন করতে করতে আমার শরীরের অনেক যন্ত্রই নষ্ট হয়ে গেছে,' আবার হেলান দিলেন বৃদ্ধ, আলোর কাছ থেকে মুখ সরালেন। 'বুঝতে পারছি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত না করে আমি ঈশ্বরের কাছে যেতে পারব না, তাঁর মুখোমুখি হতে পারব না। আমি ওটাকে খুন করতে চাই। দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়ে যেতে চাই ওই দানবকে।'

'এখানে যেটা উৎপাত করছে, সেটা আপনাদের তৈরি করা দানবটাই তা শিওর হচ্ছেন কী করে?' রানার প্রশ্ন।

'ও ফকনার ছাড়া আর কেউ না। আমি জেনেছি, দক্ষিণ আমেরিকায় যেতে পারেনি স্কপ। নাৎসি-শিকারীরা যারা জোসেফ ম্যাঙ্গল ও আইখম্যানের মত খুনীদের খুঁজে বের করেছে, তারা ওর কোন চিহ্নই পায়নি কোথাও। যে ইউ-বোটটায় করে পাড়ি জমিয়েছিল সে, নিখোঁজের তালিকায় চলে গেছে ওটা।'

'ইউ-বোটে করে গেছেন তিনি, আপনি কী করে জানলেন?'

'নাৎসিদের রেকর্ড বুক ঘাঁটাঘাঁটি করে। ইউ-বোটটার নম্বরও জেনেছি। পথে ডুবে গিয়েছিল, অথবা ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল, মধ্য আটলান্টিকে।'

'কিন্তু গভীর পানির নীচে এতকাল বেঁচে থাকল কীভাবে দানবটা?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'ফকনারের রিপাকীয় পরিবর্তন অত্যন্ত ধীর করে দিয়েছিলেন স্কপ, ক্লিনিক্যাল ডেথের কাছাকাছি। বাক্সের মধ্যে যে তরল ছিল, সেটা ওই প্রায়-মৃত প্রাণীটার পুষ্টি জুগিয়েছে। হাইবারনেশনের এমন পর্যায়ে ছিল ওটা, খাবারের প্রয়োজন হয়নি। শীতকালে ভালুক যেমন হাইবারনেট করে, দানবটাও তা-ই করছিল; তবে ভালুকের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ সময় ধরে। বসন্তে যখন জেগে ওঠে ভালুক, প্রচণ্ড ক্ষুধায় অস্থির হয়ে যায়, খাবারের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে, ফকনারের বেলায়ও তা-ই হয়েছিল। আমার বিশ্বাস জেগে উঠেই হাতের কাছে খাবার পেয়ে গিয়েছিল ও।' থামলেন বৃদ্ধ।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রানা।

'বহুদিন আগেই ওকে খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি, ধরে নিয়েছিলাম, মারা গেছে ও,' স্টাইন বললেন। 'আমার এক আঙ্কেল আমাকে আমেরিকায় নিয়ে আসেন, তাঁর কেমিক্যাল ব্যবসায়ে আমাকে কাজ দেন। নতুন জীবন শুরু করি আমি। সফলতা আসে আমার। বিয়ে করি। একটা ছেলেও হয়। বাইরে রাইফেল হাতে যে পাহারা দিচ্ছে, ব্রুনো, ও আমার ছেলে...

'আমেরিকায় এসেও ফকনারের কথা ভুলিনি আমি কয়েক দিন আগে ব্লক আইল্যান্ডের কাছে একটা জাহাজ থেকে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির একজন ফটোগ্রাফার নিখোঁজ হয়ে যাবার খবর শুনলাম। গভীর সাগরের জীবজগৎ নিয়ে রিসার্চ করছিল জাহাজটা। পত্রিকায় লিখেছে জাহাজ থেকে বড় একটা ব্রোঞ্জের বাক্স পড়ে গেছে। বাক্সটা তুলে আনা হয়েছিল ক্রিস্টফ ট্রেঞ্চে ডুবে যাওয়া একটা ইউ-বোটের ধ্বংসাবশেষ থেকে।'

'তারমানে ওই বাক্সেই ছিল ফকনার,' রানা বলল। 'মানুষকে দানব বানিয়েছেন স্কপ। নিশ্চয় মানুষের মত অস্ত্রও ব্যবহার করতে জানে ফকনার--ছুরি, বন্দুক, এ সব?'

'ওসব ব্যবহারের প্রয়োজনই হয় না,' জবাব দিলেন বৃদ্ধ।

'ওটার নিজের দেহেই প্রচুর হাতিয়ার আছে। ইস্পাতের দাঁত আর নখ তৈরি করে দিয়েছেন স্কপ। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিসটেম বদলে দিয়েছেন, যাতে মগজে খুনের আদিম নেশা সর্বক্ষণ জেগে থাকে—মাংসাশী হিংস্র জানোয়ারের মত করে খুন করে ফকনার। গায়েও প্রচণ্ড শক্তি। ওটাকে মারা খুব কঠিন হবে, মিস্টার রানা। খুনী তিমি কিংবা হোয়াইট শার্ক ওটার কাছে কিছু না।'

'হুঁ!' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রানা জানতে চাইল, 'আপনি বললেন, স্কপের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি, একটা ধাপ বাকি ছিল, সেটা কী?'

'সত্যিকারের একটা উভচর দানব বানানোর স্বপ্ন ছিল স্কপের, আগেই বলেছি,' স্টাইন জবাব দিলেন, 'যাতে জলে-ডাঙায় সমানভাবে শ্বাস নিতে পারে ওটা। পানি থেকে ডাঙায় উঠে বাতাসে শ্বাস নেয়ার কৌশল বের করে ফেলেছিল স্কপ, কিন্তু বাতাস থেকে আবার পানিতে ফিরে যাবার উপযুক্ত করার সময় পায়নি। ওই কাজটুকু বাকি রয়ে গিয়েছিল। তাই পানি থেকে উঠে এসে একবার নিজেকে বাতাসে দম নেয়ার উপযুক্ত করে ফেললে আর পানিতে ফিরে যেতে পারবে না ফকনার। সুতরাং, বুঝতেই পারছেন, কেন ওটাকে ধ্বংস করা অতি জরুরি হয়ে পড়েছে...'

'খোদা!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'জন্টি গ্র্যাহাম আপনাকে বলেনি? ইতিমধ্যেই ডাঙায় উঠে পড়েছে ওটা! ওয়াটারবোরোয় একটা কুকুরকে খুন করে তার মাংস খেয়েছে। কোথায় লুকিয়ে আছে এখন, খোদাই জানে! এবার তো একের পর এক মানুষ খুন করতে...'

কথাটা শেষ করার সুযোগ পেল না রানা, ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে গেল পোর্টহোলের পুরু কাঁচ। চমকে তাকাল ও সেদিকে, এবং মুহূর্তে বরফের মত জমে গেল। বড় বড় নখওয়ালা কয়েকটা কালো আঙুল আঁকড়ে ধরে আছে পোর্টহোলের কিনারা, সেগুলো হাঁসের পায়ের মত একটার সঙ্গে আরেকটা চামড়া দিয়ে জোড়া

লাগানো। পরমুহূর্তে ধবধবে সাদা একটা মুখ দেখা দিল ওই ফাঁকে। মণিহীন চোখদুটো সেদ্ধ ডিমের মত–সাদা। রানাকে দেখেই ছোট্ট একটা ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়ল ওটা। ঝকঝকে সাদা স্টেইনলেস স্টিলের তিনকোনা, চোখা দাঁত দেখা যাচ্ছে।

'হ্যাঁ, এটাই!' দেখামাত্র চেঁচিয়ে উঠলেন জোসেফ স্টাইন। কেবিনে বাইরের বাতাস ঢুকে পড়ায় হাঁপাচ্ছেন। মাইক্রোফোনে বললেন, 'ব্রুনো! জলদি এসো! জলদি!'

ডেকের উপর ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। দরজা দিয়ে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল ব্রুনো, হাঁ করে চেয়ে রইল দানবটার দিকে, হাতে ধরা রাইফেলটার কথা ভুলে গেছে বেমালুম। সম্বিত ফিরে পেয়ে যখন একে-ফোরটিসেভেন তুলতে যাবে, ঠিক তখনই সরে গেল মুখটা। হাত ছেড়ে দিয়ে ঝপাস্ করে পানিতে পড়ল দানব।

কেবিন থেকে ছুটে বেরোল রানা ও ব্রুনো। বোটের কিনারে গিয়ে ভাঙা পোর্টহোলের ধারে সাগরের পানিতে খুঁজল দানবটাকে। কোথাও কিচ্ছু নেই। বিগকে সাবধান করল ও। তারপর জোসেফ স্টাইনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে গেল নিজেদের বোটে। এখনও নজর বুলাচ্ছে চারপাশে। দশ-বারো মিনিট পর রানার মনে হলো, দৃষ্টিসীমার প্রায় বাইরে ছোট্ট কী যেন পানির উপর একবার ভেসে উঠেই ডুবে গেল আবার।

দানবটা? এইটুকু সময়ের মধ্যে এতদূর চলে গেছে সাঁতার কেটে? এটা সম্ভব? ব্লক আইল্যান্ডের দিকে যাচ্ছে না, নিশ্চয়ই অন্য কোনও দ্বীপে গিয়ে উঠবে এখন, খুঁজবে খাবার। কোন্ দ্বীপে উঠবে ও? অসপ্রি আইল্যান্ডে নয় তো? প্রচুর ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল আছে ওই দ্বীপে। আর আছে নিরস্ত্র দুজন মহিলা ও দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে। অসপ্রিতে ফিরবার জোর তাগিদ অনুভব করল রানা।

বোট থেকেই রেডিওতে পুলিশ-চিফ ম্যাককুইনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল ও। ডিউটি অফিসার জানালেন, উইন্টার

পয়েন্টে এরিক নামে একটা ছেলে খুন হয়েছে, সেটার তদন্ত করতে গেছেন চিফ। ছেলেটার বন্ধু রজার কাঁদছে আর প্রলাপ বকছে। ও বলছে, বনের মধ্যে এরিককে খুন করেছে একটা ইয়েতি। ইয়েতিটাকে পুব দিকে সাঁতরে যেতে দেখেছে রজার।

দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে গেল রানার মুখ। ইয়েতি!–তারমানে ফকনার, কোন সন্দেহ নেই। শহর থেকে চলে এসেছে। পুব দিকে যেতে দেখা গেছে ওকে!

পুবদিকে ডাঙা বলতে তিনটে দ্বীপ আছে, সেগুলোর একটা হচ্ছে অসপ্রি আইল্যান্ড। ওখানেই ঘাঁটি গাড়ল নাকি ফকনার? দূর থেকে স্যামির বোটটাকে অচল অবস্থায় ভেসে থাকতে দেখে খাবারের খোঁজে এসেছিল?

বিগকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বলল রানা। রেডিওতে বার বার কেরির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও জবাব পেল না। নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। ওর ধারণা, দানবটা অসপ্রি আইল্যান্ডেই যাবে। ওখানে কেরি আছে, ভিকি, সান্তা ও মিসেস মেলভিল আছেন। ইতিমধ্যেই ওদের কোন ক্ষতি করে ফেলেনি তো? রেডিওতে জবাব না পাওয়াটা ভাল লাগছে না ওর। কানে বাজছে স্টাইনের কথাগুলো: এক সময় মানুষ থাকলেও এখন আসলেই দানব ওটা, মিস্টার রানা...হিংস্র শিকারী। খুন না করে থাকতে পারে না...ভয়ঙ্কর এক কিলিং মেশিন।

গায়ে যত শক্তিই থাকুক বিগের, ফকনারকে সামলাতে পারবে না, ভাবছে রানা। ওটাকে ঠেকাতে মেশিনগান অথবা গ্রেনেড দরকার। ওর পয়েন্ট থ্রিএইট ওয়ালথার পিপি পিস্তলটাও ওই দানবের কাছে খেলনা। তা হলে? আত্মরক্ষা করবে কীভাবে ওরা?

কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কীভাবে? উপযুক্ত অস্ত্র ছাড়া কীভাবে ধ্বংস করবে ওরা ওটাকে? নিশ্চয়ই কোনও একটা উপায় আছেই, কিন্তু কী সেটা? অনুভব করতে পারছে রানা, বেশ কিছুক্ষণ ধরে কী একটা যেন উঁকিঝুঁকি দিতে চাইছে ওর মনের

কোণে। কিন্তু কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না, ঠিক কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছে ওর অবচেতন মন।

তেতাল্লিশ

'দারুণ,' সান্তা বলল।

'সাংঘাতিক,' বলল ভিকি।

সি লায়নের পুলের কাছে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওরা। মিসেস মেলভিলকে দেখছে। স্পিডবোট নিয়ে খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তীব্র গতিতে মোড় নিলেন। ঢেউয়ের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে বোটটা। পালিশ করা মেহগনি কাঠ ও চকচকে স্টেইনলেস স্টিলের ফিটিংসে চমকাচ্ছে শেষ বিকেলের রোদ।

দুজনের পিছনে দাঁড়ানো কেরি। তার পিছনে সি লায়নগুলো ফ্লিপারের ওপর ভর দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে সামনে-পিছনে দুলছে আর খাবারের জন্য হাঁক ছাড়ছে।

পুলের দশ গজ পিছনে ছাউনিতে ভিএইচএফ রেডিওর স্পিকার ডেকে চলেছে, 'অসপ্রি বেজ, অসপ্রি বেজ, অসপ্রি বেজ...ম্যাকো কলিং অসপ্রি বেজ...জবাব দিন, অসপ্রি বেজ।'

সিমেন্টের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলছে সেই কণ্ঠ, যাদের উদ্দেশ্যে বলা, তাদের কানে পৌঁছাচ্ছে না। তাঁদের নজর মিসেস মেলভিলের দিকে। তাঁর পরনে কমলা রঙের একটা লাইফ জ্যাকেট। চোখে সানগ্লাস। মাথার বেসবল ক্যাপের সামনের দিকটা পিছনে ঘোরানো, যাতে চুলে বাতাস কম লাগে। পানির

ওপরে উঁচু হয়ে থাকা পাথরের চাঙড়গুলোর কাছে গিয়ে গতি কমালেন তিনি, বড় আকারের জিএম ভি-৮ ইঞ্জিনটা গোঁ-গোঁ করে গর্জন করতে থাকল। শহরে যাচ্ছেন তিনি। এক বান্ধবীর বাড়িতে জন্মদিনের পার্টির দাওয়াত। রাতে ফিরবেন না।

মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে তাঁর উদ্দেশে হাত নাড়ল কেরি ও ছেলেমেয়েরা। থ্রটলটা সামনে ঠেলে দিয়ে হাত নাড়লেন মিসেস মেলভিল। বোটের গতি আরও বাড়ল। দ্বীপের চোখা মাথাটা ঘুরে ছুটতে লাগল শহরের দিকে।

ছাউনির রেডিওতে আবার মরিয়া হয়ে উঠল কণ্ঠটা, 'অসপ্রি বেজ, অসপ্রি বেজ, অসপ্রি বেজ...জবাব দিন, অসপ্রি বেজ।'

'মেয়েদের খাওয়ানোর সময় হয়েছে,' কেরি বলল। 'ওদের খাইয়ে ঘরে যাব। রাতের জন্যে রাঁধতে হবে।' সান্তার নোটবুকে লিখল, 'তোমার আম্মার কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ, সান্তা; রাতে তোমাকে এখানে থাকতে দিলেন...'

'আপনার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ,' মাথা ঝাঁকাল সান্তা। 'এখানে থাকতে এত ভাল লাগছে আমার...'

বাধা দিল ভিকি। 'বাবা আর রানা আঙ্কেল এখনও আসছে না,' সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'ফিরতে এত দেরি করছে কেন?'

'চলে আসবে,' কেরির নিজেরও দুশ্চিন্তা হচ্ছে, তবে ছেলেমেয়েদের কাছে সেটা প্রকাশ করল না। 'চিন্তা কোরো না।'

সি লায়নগুলোকে খাওয়াল ওরা। ওগুলোর খেলার জন্য আনা জিনিসপত্র: প্লাস্টিকের বল, রিং ইত্যাদি ছাউনিতে রেখে এল। ছাউনি থেকে সবশেষে বেরোল সান্তা। দরজাটা টেনে দেয়ার আগে রেডিওর শব্দের কারণে সৃষ্ট মৃদু কম্পন টের পেল বাতাসে। চারপাশে তাকাল। শব্দটা কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারল না। দরজা লাগিয়ে দিল।

চাপা পড়ে গেল শব্দ। রেডিওর স্পিকার বেজেই চলেছে,

'অসপ্রি বেজ, অসপ্রি, ম্যাকো থেকে বলছি...জবাব দিন, অসপ্রি বেজ...'

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নীচে তাকাল ভিকি। ডোবায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সারসটাকে। বলল, 'ওয়ান উইংকে খাইয়ে আসি।'

'থাক না,' বাধা দিল কেরি। 'তোমার বাবাই ফিরে এসে খাওয়াবেন।'

'কিন্তু কখন আসবে কে জানে! দেরি হলে খিদেয় কষ্ট পাবে বেচারা। আমি পারব তো...

'না!' একটু কড়া শোনাল কেরির কণ্ঠ। উত্তেজিত হয়ে পড়ছে ও। উদ্বিগ্ন। কারণটা ঠিক ধরতে পারছে না। দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। ভিকির দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আসলে তোমার বাবা পাখিটাকে খাওয়াতে পছন্দ করে তো, তাই...' থেমে গেল ও। কৈফিয়তটা নিজের কানেও বেখাপ্পা শোনাল।

ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে ছোট বাড়িটার দিকে এগোল ও। যেটাতে নিজে থাকে।

স্টিয়ারিঙে আলতোভাবে হাত দুটো ফেলে রেখেছেন মিসেস মেলভিল। সাগরের পানি তেলতেলে মসৃণ। পিছনে তীক্ষ্ণ সরল রেখা এঁকে চলেছে যেন প্রপেলারের ঢেউ। মুক্ত-স্বাধীন, সুখি লাগছে নিজেকে। বয়েস যেন অনেক কমে গেছে। এই সময়গুলো ভাল লাগে তাঁর, উপভোগ করেন। দিনের শেষ ভাগে অস্তগামী সূর্যের আলোয় নিজের এই বোটটা চালানো তাঁর প্রিয় হবি। পশ্চিম আকাশের রঙ লেগেছে পৌরসভার বিল্ডিং ও পানির টাওয়ারগুলোয়, সাদা রঙ করা দেয়াল গোলাপি হয়ে গেছে। শীঘ্রি রূপান্তরিত হবে ধূসর-নীলে। তিনি যখন তীরে পৌঁছুবেন, মরে যাবে আলো। ভোঁতা, বিষণ্ন, ধূসর গোধূলি বিরাজ করবে কিছুক্ষণ। তারপর ঝুপ করে নামবে রাতের অন্ধকার।

সামনের পানিতে কিছু একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল তাঁর। ভাল

করে দেখার জন্য মাথা উঁচু করলেন। হুইলটা ধরে রাখলেন এক হাতে।

পিঠের একটা পাখনা দেখা যাচ্ছে। পানি কেটে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে পাখনাটা। পিছনে এপাশ ওপাশ দোলাতে দোলাতে চলেছে কাস্তের মত বাঁকা লেজ। বিশাল একটা হাঙর। পনেরো ফুটের কম হবে না।

হাঙর বিশেষজ্ঞ না হয়েও বুঝলেন অদ্ভুত আচরণ করছে হাঙরটা। অলস সময় কাটানোর জন্য ঘোরাঘুরি করছে না। শিকারের পিছু নিয়েছে।

ওই লক্ষ্মী ছেলেটার সেই সাদা হাঙর না তো?

গতি বাড়িয়ে দ্রুত কাছে এসে পাখনার পিছনে ধাতব ট্যাগটা চোখে পড়ল তাঁর। অসপ্রি আইল্যান্ডের ট্যাগ। হ্যাঁ, রানার হাঙরটাই।

বোটের শব্দে ডুব দিল সাদা হাঙর। অপেক্ষা করতে লাগলেন মিসেস মেলভিল। কিন্তু আর ভাসল না ওটা।

রানা শুনলে খুশি হবে, ভাবছেন তিনি। সেন্সরটা পেয়ে গেছে। আবার হাঙরের পিছু নিতে পারবে...

হঠাৎ সামনে আরও একটা জিনিস চোখে পড়ল তাঁর। সাঁতার কাটছে। দূর থেকে মানুষের মতই লাগছে। নিশ্চিত হতে পারলেন না। কারণ এতবড় মানুষ কখনও দেখেননি। তা ছাড়া সাঁতার কাটার ভঙ্গিটাও অদ্ভুত, অনেকটা ডলফিনের মত।

বোকা নাকি লোকটা! শেষ বিকেলে এ রকম একটা জায়গায় সাঁতার কাটতে আসে! বিপদের ভয় নেই?

বুঝলেন, এই মানুষটাকেই নিশানা করেছে হাঙরটা। সাবধান করে দেয়া দরকার। ওর দিকে বোট ছোটালেন তিনি। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকছেন—হাঙরটা কিছু করার আগেই যাতে মানুষটার কাছে পৌঁছে যেতে পারেন। বোটে তুলে নিতে পারেন।

কিন্তু তাঁকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ ডুবে গেল লোকটা।

হাঙরটার মতই। আর ভাসে না। বোট থামিয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি। মানুষটার ভেসে ওঠার অপেক্ষা করছেন। ভাসতে ওকে হবেই, ও তো আর হাঙর নয় যে যতক্ষণ খুশি তলিয়ে থাকতে পারবে। শ্বাস নেয়ার জন্য মাথা তুলতেই হবে ওকে।

কিন্তু পানির নীচে হাঙরটা ওকে ধরে ফেললে আর কিছু করার থাকবে না তাঁর। ভয় পেয়ে গেলেন।

ভুল দেখেছেন? মানুষ না অন্য কিছু? আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। মনের ভিতর সাবধানবাণী উচ্চারিতে হতে থাকল বার বার: পালাও! অ্যাই মেয়ে, বাঁচতে চাইলে পালাও! এখনই এখান থেকে সরে যাও!

গিয়ার দিলেন তিনি। ধাক্কা মেরে সামনে ঠেলে দিলেন থ্রটল। সাঁই করে বোটের নাক ঘুরিয়ে দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটতে শুরু করলেন তীরের দিকে।

চুয়াল্লিশ

হাঙরটা যে পিছু নিয়েছে, টের পেয়েছে দানব। পানির ওপর দিয়ে সাঁতরে চলছিল ওয়াটারবোরোর দিকে। ইঞ্জিনের শব্দ শুনে ডুব দিল। এখন আর আগের মত ডুবে থাকতে না পারলেও সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশিক্ষণ পারে। অন্ধকার পানিতে খুঁজতে লাগল হাঙরটাকে।

হঠাৎ করে বেড়ে গেল পানির চাপ। আসছে হাঙরটা। বিশেষ চোখ দিয়ে অন্ধকারেও দানবটা দেখতে পেল। ধূসর অবয়ব, চোখা মাথা, হাঁ করা মুখ। প্রতিরক্ষা ও পাল্টা আক্রমণের জন্য

তৈরি হলো সেটা।

আক্রমণ করল হাঙরটা। চিন্তাভাবনার ক্ষমতা নেই ছোট্ট আদিম মগজে। কৌশলের ধার দিয়েও গেল না, সোজা ছুটে এল শত্রুকে কামড়ে ধরতে। ডাইভ দিয়ে নীচে চলে গেল শত্রু, ফুসফুস থেকে বেরিয়ে এল একঝাঁক বুদবুদ। দেখল, ফুলে রয়েছে হাঙরের সাদা পেটটা।

আঘাত হানার মোক্ষম জায়গা পেয়ে এক মুহূর্ত দেরি করল না দানবটা। নরম মাংসে বসিয়ে দিল দুই হাতের মারাত্মক ধারাল দশটা নখ। হ্যাঁচকা টান মারল নীচের দিকে। গভীর হয়ে চিরে গেল হাঙরের পেটের চামড়া। প্রথমে লম্বা দাগ দেখা গেল দশটা। তারপর ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল।

যন্ত্রণায় মোচড় খেতে লাগল হাঙরের দেহ। নখ খুলে আনেনি তখনও দানবটা। টান লেগে আরও অনেকখানি কেটে গেল হাঙরের পেটের চামড়া। বেরিয়ে এল নাড়ীভুঁড়ি।

এতক্ষণে নখ খুলে আনল দানবটা। ক্ষতি যা করার করে দিয়েছে। যন্ত্রণায় এপাশ-ওপাশ শরীর বাঁকিয়ে মোচড় খেতে থাকল হাঙরটা। তলিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

পানিতে অনেকক্ষণ ডুবে থেকেছে দানবটা। তীক্ষ্ণ ব্যথা শুরু হয়েছে ফুসফুসে। ভেসে ওঠা দরকার। কিন্তু হাঙরটাকে বিশ্বাস নেই। নীচ থেকে এসে আবার আক্রমণ চালাতে পারে। তাই কষ্ট সহ্য করেও তাকিয়ে রইল, যতক্ষণ দেখা গেল। খাবি খেতে খেতে ওটা তলিয়ে গেলে পানিতে মাথা তুলল দানব। বুক ভরে টেনে নিল তাজা অক্সিজেন।

রাতের জন্য একটা আশ্রয় খুঁজে বের করতে হবে এবার। ধীরে ধীরে সাঁতরাতে লাগল ওটা। চোখ দুটো ডাঙা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অবশেষে চোখে পড়ল নিঃসঙ্গ একটা দ্বীপ। আলো মিটমিট করছে। খুব বেশি দূরে না।

পঁয়তাল্লিশ

রানা ও বিগ যখন দ্বীপে পৌঁছল, অন্ধকার হয়ে গেছে চারপাশ। এক চিলতে গোলাপি আলো তখনও লেগে রয়েছে পশ্চিম দিগন্তে। কিন্তু মাথার ওপরের আকাশ কালো চাদরে ঢাকা। এক এক করে তারা ফুটছে সোনালি বিন্দুর মত। আর দ্বীপে আলো দেখা যাচ্ছে শুধু কেরির জানালাগুলোতে।

ভরা জোয়ার এখন। ফেঁপে উঠেছে পানি। তীরের কাছাকাছি বোট নিয়ে যেতে অসুবিধে হলো না বিগের। ডুবো পাথরে ঘষা লাগার ভয় নেই। গলুইয়ের কাছে শক্তিশালী একটা টর্চ হাতে দাঁড়ানো রানা। তীরে আলো ফেলে ফেলে পথ দেখাচ্ছে, যাতে ঠিকমত চালাতে পারে বিগ। অন্ধকারে পাথরের চাঙড়ে গুঁতো লাগিয়ে না বসে।

একটা র‍্যাকুনের ওপর আলো পড়ল। চ্যাপ্টা পাথরের ওপর বসে মাছ খাচ্ছিল আরাম করে, গায়ে আলো পড়তেই স্থির হয়ে গেল। টর্চের আলো পড়ে চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে জ্বলছে। গায়ে আলো পড়তে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে পালাল একটা শিয়াল। সবকিছুই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

'অন্যদিকে চলে গেছে বোধহয় দানবটা, ন্যাপাট্রি ওটার জন্যে কাছে হবে,' বিগ বলল।

স্টাইনের মুখে শুনে আসা অবিশ্বাস্য গল্পটা সংক্ষেপে ওকে বলেছে রানা। 'গেলে তো খুশি হতাম,' নিশ্চিন্ত হতে পারছে না ও। 'যাক আর না যাক, আন্টি, কেরি আর ছেলেমেয়ে দুটোকে

শহরে রেখে আসতে হবে এখনই...

'কিন্তু লায়নগুলোকে ফেলে যেতে রাজি হবেন না ডক্টর।'

'যেতেই হবে, আর কোন উপায় নেই।'

ডকে এসে স্লিপে বোট ঢোকাল বিগ। ইঞ্জিন বন্ধ করল। ওর আগেই ডকে নেমে পড়েছে রানা। দড়িটা গোঁজে বেঁধে বিগকে বলল, 'আমি বসছি। আপনি গিয়ে নিয়ে আসুন ওদের। বলবেন, আমি আসতে বলেছি।'

পাহাড়ি রাস্তা ধরে রওনা হয়ে গেল বিগ।

ডকে দাঁড়িয়ে রইল রানা। কান পেতে শুনছে রাতের শব্দ—ঝিঁঝির কান ঝালাপালা করা চিৎকার, পাখির ডাক, সৈকতে আছড়ে পড়া অলস ঢেউয়ের মৃদু ছলাৎ-ছল। হঠাৎ করেই মনে হলো তার, কোথায় কী যেন একটা নেই...কী নেই...কী নেই...ও, হ্যাঁ, সারসটা। কোথায় ওটা? ডকের পাশের ডোবাটায়ই তো দাঁড়িয়ে থাকার কথা, চোখ গরম করে খাবারের জন্য ধমকানোর কথা।

টর্চের আলোয় ভালমত ডোবাটা দেখল রানা। নিশ্চিত হলো, নেই পাখিটা।

গেল কোথায়? পাথরের চাঙড়গুলোর ওপর আলো ফেলে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে আলোটা সরিয়ে আনল তীরের ঝোপঝাড়গুলোর দিকে।

ঝোপের গায়ে আটকে থাকতে দেখল একটা লম্বা পালক। নীলচে-ধূসর রঙ। সন্দেহ হলো ওর। পালকই তো?

ঝোপটার কাছে চলে এল ও। হ্যাঁ, পালক। ওই সারসটার।

দুই হাতে ঝোপের ডাল সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিতে গেল রানা। আঠা আঠা কী যেন লাগল হাতে। আঙুলে আলো ফেলে দেখল। রক্ত। ডাল থেকে লেগেছে।

আশপাশে খুঁজতে শুরু করল ও। লম্বা ঘাসের ফাঁকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল সারসের মাথাটা। টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

চোখ দুটো নেই।

বুকের রক্ত ছলকে উঠল রানার। আতঙ্কের স্রোত বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দৌড় দিল বাড়ির দিকে।

ছেচল্লিশ

'ওটাকে ঠেকানোর মত কোন অস্ত্র নেই আমাদের কাছে,' কেরিকে বোঝাচ্ছে বিগ। 'এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

রান্নাঘরে কথা বলছে ওরা। মেঝেতে বসে দুই প্যাকেট তাস নিয়ে 'ওঅর' খেলছে ভিকি ও সান্তা।

'লায়নগুলোকে ফেলে আমি যেতে পারব না,' কেরি বলল। 'ওরা আমার সন্তান।' জোরে জোরে মাথা নাড়ল। 'আমি স্রেফ পারব না।'

'কিন্তু দানবটা এলে আপনার লায়ন তো বাঁচবেই না, আমরাও কেউ বাঁচব না...'

'আমি যাব না। বাচ্চাদের নিয়ে আপনারা শহরে চলে যান...'

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল রান্নাঘরের দরজা। 'বিগ, এসে পড়েছে–ওটা এখানে!' বলতে বলতে ঘরে ঢুকল রানা। পিছনে দরজাটা লাগিয়ে দিল।

চমকে গেল ভিকি। রানা আঙ্কেল কী বলছে, ইশারায় সান্তাকে জানাল।

'কোথায়?' জানতে চাইল বিগ।

'জানি না। ওয়ান উইংকে মেরে ফেলেছে। দ্বীপেই কোথাও আছে ওটা, বিগ।'

'ওয়ান উইংকে খুন করেছে!' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন বিগ। ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে গেল চোয়াল। চোখের তারা জ্বলছে।

'আন্টি কোথায়?'

'শহরে গেছে একটা অনুষ্ঠানে। আমরাও...

'এখন আর চলে যাওয়ার সুযোগও নেই আমাদের,' কেরি ও ছেলেমেয়ে দুটোর দিকে তাকাল রানা। 'এই রাতে এদের নিয়ে ঘর থেকে বেরোনো ঠিক হবে না। কোথায় যে লুকিয়ে আছে ওটা কে জানে। হয়তো ডকের ধারের ঝোপগুলোতেই ঘাপটি মেরে রয়েছে।'

দরজার দিকে এগোল কেরি।

'কোথায় চললেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মেয়েদের আনতে। এখানে নিয়ে আসব।'

'পাগল নাকি!'

'আমি বললে ওরা আসবে। দেরি হবে না। যাব আর আসব।'

'উঁহু। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অনেকখানি রাস্তা। সি লায়নরা যে গতিতে চলে, তিনশো গজ আসতে আসতে...পারবেন না।'

'তাই বলে কি ট্যাংকে ফেলে রাখব দানবের শিকার হওয়ার জন্যে?' দরজা খুলল কেরি। 'ভাববেন না। ওটাকে আসতে দেখলে...'

'কী করবেন? গায়ের জোরে পারবেন? ছুটেও পালাতে পারবেন না। বোঝার চেষ্টা করুন, কেরি. লায়নগুলো শুধুই জানোয়ার!' মরিয়া হয়ে বলল রানা।

'আমার কাছে ঠিক তা নয়।' ভিকি ও সান্তার দিকে আঙুল তুলল কেরি। 'ওদের কাছেও নয়।'

'কিন্তু আমি আপনাকে যেতে দিতে পারি না

'আপনি আমাকে আটকাতেও পারেন না।' জোর করে রানাকে সরিয়ে দিয়ে দরজার পাল্লা খুলল কেরি। ছুটে বেরিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

বিড়বিড় করে কী যেন বলছে বিগ। কেরি বেরিয়ে যেতেই সিঙ্কের ওপরের তাক থেকে বড় একটা মাংস কিমা করার ছুরি নিয়ে কোমরের বেল্টে গুঁজল। রানার হাত থেকে টর্চটা নিল।

বাধা দিল না রানা। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'ওঁকে বাঁচাতে। ভয় নেই, মিস্টার রানা, আমিও আরেক দৈত্য,' রসিকতা করে পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করল বিগ। 'এক দৈত্য আরেক দৈত্যকে আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।'

কিন্তু রানা হাসল না।

রানার পাশ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল বিগ।

সান্তা আর ভিকির দিকে তাকাল রানা। 'তোমরা একা থাকতে পারবে না?'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' জানতে চাইল ভিকি।

'তোমার বাবা একা গেল!' চিন্তিত ভঙ্গিতে রানা জবাব দিল। 'মনে হচ্ছে আমারও যাওয়া দরকার।'

'যান,' কণ্ঠস্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করছে ভিকি। 'আমরা থাকতে পারব।'

ড্রয়ার থেকে বড়সড় একটা হাতুড়ি বের করল রানা। বেরিয়ে যাবার আগে ভিকিকে বলল, 'দরজাটা লাগিয়ে দাও।'

সাতচল্লিশ

পাহাড়ের দিকে দৌড়ে চলেছে কেরি। মাঝপথে ওকে ধরে ফেলল বিগ। পাশাপাশি চলল দুজন। বার বার এপাশ ওপাশ আলো ফেলে দেখছে বিগ।

সি লায়নের উত্তেজিত ডাক কানে এল। পাগল হয়ে গেছে যেন জানোয়ারগুলো। তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে।

'সর্বনাশ!' গতি বাড়িয়ে দিল কেরি। হাত ধরে ওকে থামানোর চেষ্টা করল বিগ। ঝাড়া দিয়ে হাত ছুটিয়ে নিয়ে দৌড়াতে থাকল কেরি। পাহাড় বেয়ে ওঠার সময় ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটতে পারল না বিগ। দুজনের মাঝে দূরত্ব বাড়ছে। দশ ফুট আগে চলে গেছে কেরি।

সি লায়নের পুলে আগে পৌঁছল ও। পাশে এসে দাঁড়াল বিগ। লায়নগুলোর চিৎকার কানে আসছে। কিন্তু দুজনের কেউই দেখতে পাচ্ছে না ওগুলোকে। শব্দ লক্ষ্য করে আলো ফেলল বিগ।

ছাউনির কাছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে দুটো সি লায়ন। ফ্লিপারে ভর দিয়ে দুলছে। পাগলের মত চিৎকার করে চলেছে। দ্রুত মাথা ওঠাচ্ছে-নামাচ্ছে। ডানে আলো ফেলল বিগ।

পুলের অন্যপাশে, পুলের কাছ থেকে একটু দূরে কী যেন ঘাপটি মেরে রয়েছে। বড় কিছু। সাদাটে ধূসর বিশাল পিঠটা শুধু দেখা যাচ্ছে। গায়ে আলো পড়তেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ওটা।

চেঁচিয়ে উঠল কেরি। ধড়াস করে লাফ মারল বিগের হৃৎপিণ্ড। রক্ত চলাচল বেড়ে গেল শিরায় শিরায়।

দানবটাকে দেখে মনে হচ্ছে মস্ত একটা সাদা গরিলা। মুখে রক্ত লেগে আছে। সামান্য হাঁ করে থাকায় মুখের ভিতরে ইস্পাতের দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। আলো লেগে ঝিক করে উঠছে। কালো দুই হাতের আঙুলে লম্বা লম্বা ইস্পাতের নখ। ছেঁড়া মাংসের টুকরোয় নখ বিঁধিয়ে ধরে রেখেছে। হাত-পায়ের শিরাগুলো ফুলে রয়েছে দড়ির মত। অপারেশন করে ফেলে দেয়া হয়েছে জননেন্দ্রিয়। প্রস্রাব বেরোনোর জন্য শুধু একটা ফুটো। ভয়ানক বিকৃত লাগছে জায়গাটা। টর্চের আলো প্রতিবিম্বিত হচ্ছে মণিহীন সাদা চোখে, যেন গোল দুটো ছোট আয়না। পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে আংশিক খাওয়া একটা সি লায়নের লাশ।

হিংস্র জন্তুর মত ভয়ঙ্কর একটা গর্জন করে উঠল দানবটা। এগিয়ে এল এক পা।

'পালান!' চিৎকার করে কেরিকে বলল বিগ।

'কিন্তু লায়নগুলো...' পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে যেন কেরি, পা নড়াতে পারছে না। কথা সরছে না মুখ দিয়ে।

'পালান! ফর গড্‌স্‌ সেইক, জলদি! সোজা ঘরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিন!'

দানবটাকে আরও এক পা এগোতে দেখে এক পা পিছিয়ে গেল কেরি। সাহস হারিয়ে ফেলেছে। আচমকা ঘুরেই দৌড় দিল।

বেল্ট থেকে ছুরিটা খুলে নিল বিগ। দানবটার ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না। দেহটাকে সামনে বাঁকা করে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছুরি বাড়াল।

বিগের মতই দেহটাকে সামনে বাঁকা করে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল দানবটা। দুই হাত সামনে বাড়ানো। আঙুলের মাথায় বসানো ইস্পাতের বাঁকা নখগুলো যেন সার্জনের ছুরি।

'মানুষ যদি তোমাকে তৈরি করে থাকতে পারে,' বিড়বিড় করে বলে যেন নিজেকেই সাহস জোগাল বিগ, 'মানুষ তোমাকে ধ্বংসও করতে পারবে। এসো, দেখি, মারো আমাকে!'

*

পথে কেরির সঙ্গে দেখা হলো রানার। ফোঁপাতে ফোঁপাতে কেরি বলল, 'দানবটা ওদের মেরে ফেলছে...আমার মেয়েদের মেরে ফেলছে...'

'বিগ কোথায়?'

'ওটার সঙ্গে লড়াই করছে!'

'জলদি বাড়ি যান!' আবার দৌড়াতে শুরু করল রানা।

অস্পষ্ট দুটো সাদা রঙের বিশাল মূর্তিকে জাপটাজাপটি করতে দেখল। টর্চ গড়াচ্ছে মাটিতে, ছুরি নেই বিগের হাতে।

কাছে চলে এল রানা। হাতুড়ি উঁচু করে ধরল। বাড়ি মারার সুযোগ খুঁজছে। যেভাবে নড়ছে ওরা, বাড়িটা বিগের গায়েও লেগে যেতে পারে। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে দড়াম করে মাটিতে পড়ল বিগ, এক লাফে ওর পাশে গিয়ে বসল দানব। বিগকে এক হাতে চেপে রেখে গলায় দাঁত বসাতে যাচ্ছিল ফকনার, ওর হাত যেখানে কাঁধে মিশেছে সেই জয়েন্ট লক্ষ্য করে হাতুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড এক বাড়ি মারল রানা। ক্রুদ্ধ অমানুষিক গোঙানি বেরিয়ে এল দানবটার মুখ থেকে। ঝুলে পড়ল বামহাতটা। ঘুরে তাকাল। এই সুযোগে ওটার পেটে প্রচণ্ড ঘুসি মারল বিগ।

কিন্তু বিগের দিকে আর তাকালই না দানবটা। উঠে দাঁড়াচ্ছে নতুন শত্রুকে ঘায়েল করতে। থামাতে হবে, ওটাকে থামানোর জন্য এবার ওর ডান হাঁটুতে হাতুড়ির বাড়ি মারল রানা। মনে হলো হাঁটুর বাটি খসে গিয়ে অকেজো হয়ে গেল পা-টা। দেহের ভার রাখতে পারছে না। একপাশে কাত হয়ে গেল দানব। আরেকটা ক্রুদ্ধ গর্জন বেরিয়ে এল ওর গলা থেকে।

থামল না রানা। ওটার মাথা লক্ষ্য করে হাতুড়ি চালাল এবার। ফিরে এল হাতুড়ি, যেন ইস্পাতের গায়ে লেগেছে। কিন্তু টলছে দানব। এবার কাঁধ দিয়ে ওটার বুকে ধাক্কা মারল রানা।

এতক্ষণে পড়ল দানব। কেঁপে উঠল মাটি।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল বিগ। 'আমার ছুরি ফেলে দিয়েছিল...'

বিগের দিকে তাকাল রানা। অন্ধকারে জখমগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। 'বেশি জখম হয়েছেন?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল ও।

'না,' পড়ে থাকা দানবটার দিকে তাকিয়ে আছে বিগ। 'মাথায় যেভাবে মেরেছেন, আর উঠতে পারবে না...'

কিন্তু ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই নড়ে উঠল দানব।

ধীরে ধীর উঠে বসছে।

হাঁ হয়ে গেছে বিগ ও রানা দুজনেই। এতবড় আঘাত সামলে নিয়ে দিব্যি বেঁচে আছে ফকনার! উঠে দাঁড়াচ্ছে আবার!

চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'এভাবে মারা যাবে না ওটাকে! বিগ, জলদি পালান!' বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে দৌড় দিল ও।

পিছন থেকে বিগ জিজ্ঞেস করল, 'কী করব তা হলে এখন?'

'উপায় হয়তো একটা আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'তবে কতখানি সফল হতে পারব জানি না। তাড়াতাড়ি আসুন। ওটা উঠে এসে ঘরে ঢোকার আগেই তৈরি হতে হবে আমাদের।'

প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছে ওরা বাড়িটার দিকে। যেন ভূতে তাড়া করেছে।

আটচল্লিশ

বাথরুমের লম্বা আয়নাটার শেষ স্ক্রুটাও খুলে নিল রানা। দুই হাতে ধরে সাবধানে মেঝেতে নামাল। নিজের প্রতিবিম্ব দেখল তার

ভিতরে। পাঁচ ফুট উঁচু, দুই ফুট চওড়া আয়নাটা লিভিং রুমে নিয়ে এল ও। ডিকম্প্রেশন চেম্বারের খোলা হ্যাচের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখল।

'আরেকটু উঁচু হলে ভাল হতো,' বলল ও। 'তবে মনে হয় কাজ চালানো যাবে।'

অন্য প্রান্তের দেয়ালের কাছে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আছে কেরি। এখনও কাঁপছে ও। মুখের রঙ ফেরেনি। বলল, 'অকারণে সময় নষ্ট করছেন। কাজ হবে না।'

'কিছু তো একটা করতে হবে। আপনার মাথায় আর কোন বুদ্ধি থাকলে বলতে পারেন।'

'হিংস্র জানোয়ারকে ঘুম পাড়াতে কি ব্যবহার করে জানেন?'

'অ্যানাসথিযিয়া।'

'হ্যাঁ। অ্যানাসথিযিয়া ব্যবহার করব।'

'কীভাবে করবেন? সিরিঞ্জ নিয়ে আপনাকে কাছে যেতে দেবে দানবটা? তা ছাড়া বার বার ওটার দেহে অপারেশন চালিয়েছেন স্কপ। কী দিয়ে বেহুঁশ করেছেন তিনিই জানেন। দেহের রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন, জানা কথা। সাধারণ অ্যানাসথিযিয়া ওটার দেহে আর কাজ না-ও করতে পারে।' জানালার দিকে তাকাল রানা। পাহাড়ের নীচে চোখ রাখছে ভিকি ও সান্তা। রানা জিজ্ঞেস করল, 'ওটা আসছে, ভিকি?'

'না,' জবাব দিল ভিকি।

পাশে দাঁড়ানো বিগের দিকে ফিরল রানা। বিগের সারা গায়ে অসংখ্য জখম। রক্ত পড়ছে সেগুলো থেকে। তবে কোনটাই তেমন মারাত্মক নয়। ধুয়েটুয়ে পরে ওষুধ লাগালেই চলবে। জরুরি কাজটা আগে সারা দরকার। আয়নাটা দেখিয়ে বলল রানা, 'নিন, ধরুন এটা। আমি ভেতরে ঢুকলে আমার হাতে দেবেন।'

আয়নাটা ধরল বিগ। মাথা নুইয়ে ডিকম্প্রেশন মেশিনের চেম্বারে ঢুকল রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল বিগের দিকে।

হ্যাচ দিয়ে আয়নাটা ওর হাতে দিল বিগ। চেম্বারের অন্য প্রান্তের দেয়ালে আয়নাটা ঠেস দিয়ে খাড়া করে রাখল রানা। আয়নার ভিতরে নিজের প্রতিবিম্বর দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে এল ধীরে ধীরে।

'আমাকে দেখা যাচ্ছে?' বিগকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' বাইরে থেকে জবাব দিল বিগ।

হ্যাচের কাছে এসে ডানপাশে সরল রানা, 'এবার?'

'না।'

'হ্যাচ দিয়ে একটু এগিয়ে আয়নাটার দিকে তাকান। দেখুন তো, আপনাকে দেখা যায় কিনা।'

দুই পা এগিয়ে জবাব দিল বিগ, 'যায়।'

'এবার আবার বাইরে গিয়ে দেখুন তো কাকে দেখা যায়?'

'কাউকে না।'

এক পা বামে সরে আবার জিজ্ঞেস করল রানা, 'যায়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনাকে দেখতে পাচ্ছি।'

'ব্যস হয়েছে,' বলল রানা, 'ঘরের আলো নিভিয়ে দিন।'

নিভাল বিগ।

চেম্বারের ভিতরের লাল আলোটা জ্বেলে দিল রানা। 'এখন দেখুন তো?'

ভাল করে দেখল বিগ। 'যায়, তবে কিছুটা আবছাভাবে। কিন্তু মিস্টার রানা, এভাবে বাচ্চা ছেলেকে হয়তো ধোঁকা দেয়া যাবে...'

'আমার ধারণা ফকনারের বুদ্ধি এখন বাচ্চাদের চেয়েও কম। মগজের অনেক পরিবর্তন করে দিয়েছেন স্কপ, আদিমতম শিকারীতে পরিণত করেছেন, দানব বানিয়েছেন। বুদ্ধি বেশি থাকলে স্কপের ইচ্ছে পূরণ করতে পারত না ওটা...'

'আঙ্কেল!' চিৎকার করে উঠল ভিকি। 'বাবা! আসছে ওটা!'

'কেরিকে আলোটা জ্বেলে দিতে বলুন, বিগ,' চেম্বারের ভিতর থেকে বলল রানা।

'মিস কিন! আলোটা জ্বেলে দিন!' চেঁচিয়ে বলল বিগ।

ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কেরি ভিকি ও সান্তার পাশে।

কোথায় দাঁড়ালে বাইরে থেকে ওকে দেখা যায় সেটা ভাল করে বুঝে নিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। ও-ও এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। হাত তুলে ঢালের দিকে দেখাল ভিকি।

অনেক নীচে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে লম্বা মূর্তিটাকে উঠে আসতে দেখা যাচ্ছে। হাঁটার ভঙ্গিটা মোটেও স্বাভাবিক নয়। পা টেনে টেনে, দুলে দুলে হাঁটছে। একটা হাত ঝুলে আছে শরীরের পাশে।

'এত মার খেয়েও মরেনি!' বিড়বিড় করল রানার পাশে এসে দাঁড়ানো বিগ।

'আল্লাহ্ই জানে, ঠেকাতে পারব কি না!' অনিশ্চিত শোনাল রানার গলা।

ঊনপঞ্চাশ

প্রচুর কাটাকুটি দানবটার গায়ে, ধারালো কী একটা জিনিস দিয়ে মেরেছে ওকে লম্বা লোকটা। ব্যাটাকে মাটিতে ফেলে গলায় দাঁত বসাতে যাচ্ছিল, এমনি সময়ে ভারী কিছু দিয়ে শক্ত মার মেরেছে ওকে আরেক লোক। এক কাঁধ ঝুলে পড়েছে, আর এক পায়ের হাঁটুর বাটি নড়ে গেছে, মাথার একপাশে ভোঁতা যন্ত্রণা। গালের মাংসে প্রচণ্ড জ্বালা। কেটে দিয়েছে লম্বুটা। এক ঊরুর অনেকখানি জায়গা ছুরির খোঁচায় গভীর হয়ে চিরে গেছে। এক হাতের একটা আঙুল কাটা পড়ে প্রায় আলাদা হয়ে গেছে - চামড়ায় ঝুলছে আঙুলটা। টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল ওটা দানব। কাদা তুলে

নিয়ে লেপে দিল কাটা জখমগুলোতে।

ক্ষতগুলো দুর্বল করতে পারেনি ওটাকে। বরং আদিম মগজে এক ধরনের আনন্দ। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছিল, শুধুই অসহায় শিকার ছিল না, যেটা প্রতিরোধ করতেও জানে না, ভয় পেয়ে শুধু পালাতে জানে। শক্তিশালী শত্রুকে ধ্বংস করে জেতার আনন্দই আলাদা।

জখমগুলো কোন ক্ষতি করতে পারবে না দানবটার। সংক্রমিত হবে না। শুকিয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। সে-রকম করেই ওকে রূপান্তরিত করেছেন স্কপ।

আত্মরক্ষার জন্য সাবধান হওয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না আর দানবটা। নিজের প্রচণ্ড ক্ষমতা নিয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। অপরাজেয় ভাবছে নিজেকে।

দূরে আলো দেখতে পাচ্ছে, ঢালের শেষ মাথায়। আলো মানেই থাকার জায়গা ও আশ্রয়। হয়তো আরও শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে, যাদের ধ্বংস করে আনন্দ পাবে। খেয়েও।

জখমি পা'টা টানতে টানতে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে চলল দানবটা। সামনে ঝুঁকে এগোচ্ছে। গতি মন্থর। তবে সেটা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আপাতত। কারণ সি লায়নের মাংস খেয়ে পেট ভর্তি। খিদের তাড়া নেই।

পঞ্চাশ

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ভিকির চেহারা। সান্তা কাঁপছে। আতঙ্কে। এক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেছে কেরি। অন্য হাত

ভিকির কাঁধে।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে রানা ও বিগ। কীভাবে কী করতে চায় বুঝিয়ে বলছে রানা বিগকে। কাছে চলে আসায় এখন আরও ভালমত দেখা যাচ্ছে দানবটাকে, কালোর পটভূমিতে ভূতুড়ে একটা ছায়ামূর্তি। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। পা টেনে টেনে। কখনও বাঁয়ে সরছে, কখনও ডানে। তবে সোজা এগিয়ে আসছে বাড়িটার দিকেই।

বিগের দিকে ঘুরল রানা। 'আপনি রেডি?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল বিগ। দানবটার মতই যেন সহ্যশক্তি। জখমগুলোতে নিশ্চয় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু মুখের একটা পেশিও কাঁপছে না ওর।

ভিকি ও সান্তার হাত ধরে ওদেরকে ডিকম্প্রেশন চেম্বারের পিছনে একটা আলমারির কাছে নিয়ে এল রানা। 'ঘর অন্ধকার করে দেব। সাহস হারাবে না। চিৎকার করবে না। মনে থাকবে?'

মাথা ঝাঁকাল দুজনে।

'যাও, ঢুকে পড়ো।'

আলমারিতে ঢুকে পড়ল ভিকি ও সান্তা। কেরিকেও ঢুকতে বলল রানা। বিগকে সাবধান করে দিয়ে বলল, 'যদি কোন অঘটন ঘটে, আমাকে মেরে ফেলে; ছেলেমেয়ে দুটো আর মিস কেরিকে নিয়ে সোজা ডকের দিকে দৌড় দেবেন। দানবটাকে মারার চেষ্টা করবেন না আব। কোনদিকে তাকাবেন না। ম্যাকো বোটটা নিয়ে শহরে চলে যাবেন।'

'মিস্টার রানা...

'কোন কথা নয়। যা বললাম, ঠিক তা-ই করবেন। ওটা যদি আমাকে ধরেও ফেলে, অন্তত দশ মিনিটের জন্যে ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব আমি।' হাতে ধরা হাতুড়িটা দেখাল বিগকে। এবার কেরির দিকে ফিরল রানা, 'আর আপনাকে বলছি, দয়া করে লায়নের কথা ভাববেন না। যেটাকে মেরেছে সেটা তো গেছেই,

বাকি দুটোকে মারার সময় পায়নি ওটা।' কাঁধ ধরে কেরিকে ঘুরিয়ে দিল রানা। ঠেলে দিল আলমারির ভিতরে। দরজা লাগিয়ে দিল। বিগকে বলল, 'আপনি পাশের ঘরে অপেক্ষায় থাকুন। আমি না ডাকলে আসবেন না।'

দ্বিধা করছে বিগ।

'যান! দেরি করবেন না!' রানা বলল।

কাছে এসে আলতো করে রানার কাঁধে হাত রাখল বিগ। 'ডিকম্প্রেশন মেশিনে আমি ঢুকলে কেমন হয়?'

'প্লিজ, বিগ, যান! আমার কিচ্ছু হবে না। যদি হয়ও, ক্ষতি নেই; কোনও পিছুটান নেই আমার। কিন্তু ভিকিকে মানুষ করতে হবে আপনার, আন্টির দেখাশোনা করতে হবে। অযথা দেরি করছেন...যান, যান,' হাত ধরে বিগকে ঘুরিয়ে দিল রানা।

দেয়ালে বসানো কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে এসে দাঁড়াল ও। ডিকম্প্রেশন চেম্বার চালু করার মাস্টার বাটনটা টিপে দিল। যন্ত্রপাতি চালু হওয়ার মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। দেয়াল ঘেঁষে বসানো ট্যাংকের ভিতরে বাতাস ঢোকার হিসহিস শব্দ। ঘরের আলো নিভিয়ে দিল ও। চেম্বারের ভিতরের লাল আলোটা জ্বলে রইল শুধু।

হ্যাচ দিয়ে ডিকম্প্রেশন মেশিনের ভিতরে ঢুকে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল রানা।

একান্ন

আরও কাছে চলে এসেছে দানবটা। বাড়ির ভিতরে নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে। আলোকিত জানালার কাচে কালো কালো ছায়া।

সাবধান হওয়ার প্রয়োজন মনে করছে না, নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করছে না। ভয়ডর পুরোপুরি চলে গেছে। পরোয়া করে না এখন আর কাউকে।

হঠাৎ নিভে গেল বাতি। অন্ধকার রাত যেন শুষে নিল সমস্ত আলো।

তাতে কোন অসুবিধে নেই দানবটার। অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছে। বাড়ির ভিতর থেকে লাল আলো আসছে। সেই আলো লক্ষ্য করে এগোল ওটা। বাড়িটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল। ঢোকার পথ খুঁজছে। একটা দরজা দেখতে পেল। পাতলা কাঠ আর কাঁচ দিয়ে তৈরি। ভেঙে ফেলা কিছুই না।

দরজা ভেঙে মস্ত ঘরটায় ঢুকল ওটা। লাল আলোটার দিকে নজর।

ঘরের মাঝখানে বড় একটা জিনিসকে স্থির হয়ে থাকতে দেখল। লাল আলো আসছে ওটার ভিতর থেকে। পা টেনে টেনে জিনিসটার কাছে এসে দাঁড়াল দানবটা। গোল একটা খোলা দরজা দেখে নিচু হয়ে ভিতরে উঁকি দিল।

রঙিন আলোয় অন্যপাশে আবছা একটা ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল। চিনে ফেলল মুহূর্তে। ওই লোকটাই ভারী কী যেন দিয়ে ব্যথা দিয়েছিল ওকে! এখন লুকিয়ে আছে। ওর ভয়ে। দাঁড়াও, আসছি! ছোট্ট একটা হুঙ্কার ছেড়ে পা বাড়াল সামনে।

এবার যাবে কোথায়!

ভিতরে ঢুকল দানবটা। চট্ করে এক পা ডাইনে সরে গেল রানা।

চেম্বারের মেঝেতে হ্যাচের পাশে দেয়ালে গা ঠেকিয়ে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা। নাকে ঢুকছে বাজে দুর্গন্ধ।

চাপা ঘড়ঘড়ে শব্দ বেরোচ্ছে দানবটার গলা থেকে।

চোখের পাতা ফেলতেও ভয় পাচ্ছে রানা। ওটুকু নড়াচড়াও

টের পেয়ে যেতে পারে দানব। লালচে অন্ধকারে সোজা আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকায় রানাকে চোখে পড়ল না ওটার।

রোমহীন সাদা পা-টা লাল আলোতে লাল দেখাচ্ছে। কালো দুই হাতের ইস্পাতের নখ চকচক করছে।

মনে মনে প্রার্থনা করছে রানা: দুই কদম! দানবটা আর মাত্র দুই পা এগোক! তা হলেই বেরিয়ে যেতে পারবে ও!

কিন্তু না, থেমে গেল ফকনার।

দ্বিধায় পড়ে গেছে। শিকারী-ইন্দ্রিয় জানান দিচ্ছে, কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছে। গোলমাল। এখন অন্যরকম লাগছে আয়নার ভিতরের সেই লোকটাকে। মানুষের মত লাগছে না আর, কোন্ প্রাণী, ঠিক চিনতে পারছে না।

হঠাৎ বুঝে ফেলল। নিজেকেই দেখছে–সামনে ওটা আয়না।

প্রচণ্ড রাগে গর্জে উঠে ঘুরে দাঁড়াল দানবটা।

বায়ান্ন

ঠকাস করে ফকনারের কপালে হাতুড়ির একটা মোক্ষম বাড়ি লাগিয়ে দিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা হ্যাচের বাইরে। হাঁটু ও হাতে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। চেম্বারের দরজা বন্ধ করার জন্য ঘুরল। দেখল কিছুই হয়নি ওটার হাতুড়ির আঘাতে।

অনেক ভারি লাগছে কেন দরজাটা?

দানবটাও লাফ দিল বেরোনোর জন্য।

গায়ের সমস্ত জোর খাটিয়ে পাল্লা লাগিয়ে দিল রানা। ওটার গায়ে পিঠ লাগিয়ে ঠেসে ধরে রাখল। ভিতর থেকে প্রচণ্ড ঠেলা

মেরে খুলে ফেলার চেষ্টা করছে দানবটা।

'বিগ, আসুন! বেরিয়ে আসুন!' দরজার ডগ হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে চেঁচিয়ে ডাকল রানা।

চোখের পলকে পাশের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বিগ। দরজা লাগাতে সাহায্য করল রানাকে।

একটা লাল আলো মিটমিট করে দরজাটা ঠিকমত লাগার সঙ্কেত দিচ্ছে। ইস্পাতের দরজার গায়ে ধাক্কা মারছে দানবটা। ধ্রাম্ ধ্রাম্ শব্দ হচ্ছে।

আলমারির দরজা খোলার শব্দ শুনল রানা। বিগের পায়ের শব্দ দ্রুত ছুটে যাচ্ছে দেয়ালের কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে। ডায়াল প্রিসেট করে রেখেছে রানা। বিগকে শুধু একটা বোতাম টিপতে হবে এখন।

টিপে দিল বিগ। ডজনখানেক ভেন্ট দিয়ে ট্যাংক থেকে চেম্বারের ভিতর বাতাস ঢুকতে শুরু করল। ঠাণ্ডা, শুকনো বাতাস চেম্বারের গরম বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে কুয়াশা সৃষ্টি করল।

'চাপ বাড়াতে থাকুন,' চিৎকার করে বিগকে বলল রানা। 'যতটা পারেন, বাড়ান।' হ্যাচের কাছ থেকে সরে এসে চেম্বারের এক পাশের একটা পোর্টহোল দিয়ে ভিতরে তাকাল ও।

দরজাটা খোলার চেষ্টা করল না আর দানবটা। বুঝে গেছে ফাঁদে পড়েছে। বেরোনোর অন্য পথ খুঁজতে শুরু করল। কাঁচে ঢাকা একটা গোল ফোকর দেখে ঘুসি মারতে হাত তুলল।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ ব্যথা শুরু হলো মাথায়। অনুভূতিটা ওটার কাছে নতুন। আগুন ধরে গেছে যেন মগজে। গলে দলা পাকিয়ে পিণ্ড হয়ে যাচ্ছে যেন।

দুই হাতে মাথা চেপে ধরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল।

ঘূর্ণায়মান কুয়াশার মধ্যে চেম্বারের ভিতরে কী ঘটছে স্পষ্ট দেখছে

না রানা। চিৎকার শুনতে পাচ্ছে। ভয়াবহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে যেন হিংস্র এক জানোয়ার।

'ওটার কান শেষ!' চেঁচিয়ে বলল রানা।

'পাঁচ সেকেন্ডে দুশো ফুট চাপ সৃষ্টি হয়েছে,' জবাব দিল বিগ। কন্ট্রোল প্যানেলের গেইজের দিকে তাকাল।

পোর্টহোলে কীসের যেন আঘাত লাগল। মাকড়সার জালের মত চিড় ধরল কাচের গায়ে।

'তিনশো ফুট,' ঘোষণা করল বিগ।

তীক্ষ্ণ ব্যথাটা চলে গেছে। মাথার দুই পাশে ভোঁতা যন্ত্রণা হচ্ছে দানবটার। কী ঘটছে বুঝতে পারছে না। তবে যন্ত্রণার কারণ যে ফোকরের বাইরে উঁকি দিয়ে থাকা মানুষটা, সেটা বুঝতে পারছে। আত্মরক্ষার কথা ভুলে গেল। প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল মগজে।

এগোতে গিয়ে শক্ত কী যেন লাগল পায়ে।

নিচু হয়ে তুলে নিল জিনিসটা। ফোকরের কাঁচে বাড়ি মারতে এগোল।

'একটা রেঞ্চ পেয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। রেঞ্চটা কাঁচের গায়ে আছড়ে পড়তে দেখে লাফিয়ে পিছনে সরে গেল। মাকড়সার জাল বেড়ে গেল ফোকরের কাঁচে।

'ছয়শো ফুট,' বিগ জানাল। 'ছয়শো পঞ্চাশ।'

'আরও নামান! আরও...'

'কিন্তু কাজ কি হবে...'

'হবে কি হবে না, পরের কথা। চালিয়ে যান!' রেঞ্চের আঘাতে ভেঙে যেতে পারে কাঁচ। ঝুঁকি নিয়েও কাঁচের গায়ে নাক ঠেকিয়ে ভিতরে তাকাল রানা।

দ্রুত এক সারি বোতাম টিপে দিয়েছে বিগ। প্রবল বেগে

ট্যাংক থেকে চেম্বারে ঢুকছে চাপ চাপ বাতাস। বেড়ে যাচ্ছে চেম্বারের ভিতরে কুয়াশার ঘূর্ণন।

কুয়াশার জন্য স্পষ্ট দেখতে পারছে না রানা। আবছাভাবে চোখে পড়ল, আবার বাড়ি মারতে রেঞ্চ তুলেছে দানবটা। হাঁ করা মুখের ভিতর রুপালি দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। সাদা চোখে যেন রাজ্যের প্রতিহিংসা।

তিপ্পান্ন

কিন্তু রেঞ্চটা কাঁচের গায়ে নামিয়ে আনার সময় পেল না দানবটা। মাঝপথে থেমে গেল উদ্যত হাতটা। দেহটা ঝাঁকি খেল এমন ভঙ্গিতে যেন কয়েক হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ বয়ে গেছে শরীরে। কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে চোখ। হাত থেকে খসে পড়ল রেঞ্চ।

চেম্বারের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল দানবটা। ক্রমাগত মোচড় খাচ্ছে শরীর। নিজের মাংস নিজেই খামচাচ্ছে। চিরে ফালা ফালা করছে ধারালো নখ দিয়ে।

'পাঁচশো ফুট...' বিগ জানাল। 'চারশো পঞ্চাশ...'

'কাজ হচ্ছে,' রানা বলল। পোর্টহোলে যেন আঠা দিয়ে জুড়ে দেয়া হয়েছে ওর চোখ।

পানির সাড়ে ছয়শো ফুট নীচে নামলে যতটা চাপ পড়ে দেহের ওপর, ততটা চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল চেম্বারে। দানবটার দেহের প্রতি বর্গইঞ্চিতে প্রায় তিনশো পাউন্ড। অস্বাভাবিক দ্রুত সেটা কমিয়ে ফেলায় সহ্য করতে পারছে না দেহ।

চোখে দেখছে না দানবটা। কানে শুনছে না। দম নিতে পারছে না। হাড়ের প্রতিটি জোড়ায়, মাংসপেশিতে যেন আগুন ধরে গেছে। মাথাটা ফেটে যেতে চাইছে।

কী ঘটছে, জানে না দানবটা। বুঝতে পারছে না ভিতরের বাতাস দ্রুত চাপমুক্ত হওয়ায় নাইট্রোজেনের বুদবুদ ছড়িয়ে পড়ছে গোটা দেহের টিসুগুলোতে। আটকে যাচ্ছে সেসব বুদবুদ। বড় হচ্ছে। টিসুকে ছিঁড়ে-ফাটিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

যন্ত্রণায় নিজের গায়ে অনবরত খামচি মেরে চলেছে দানবটা। মাঝে মাঝে দুই হাতে চেপে ধরে বিকৃত হতে থাকা দেহটাকে যেন আগের পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে চাইছে।

তাকিয়ে আছে রানা। স্তব্ধ, বিমূঢ়। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মেঝে থেকে উঠে পড়তে দেখল দানবটাকে। যন্ত্রণা সইতে না পেরে চেম্বারের ভিতর এখন ছুটে বেড়াচ্ছে পাগলের মত। ধাক্কা খাচ্ছে এ-দেয়ালে ও-দেয়ালে। নাক-মুখ-কান দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। চোখ দুটো বেরিয়ে গেছে কোটর থেকে। হাত তুলল ঠেলে ঢোকানোর জন্য। কিন্তু হাতটা জায়গামত পৌঁছানোর আগেই একটা চোখ ফেটে গেল ঠুস করে, আরেকটা বেরিয়ে রক্তাক্ত শিরা ও পেশিতে আটকে থেকে ঝুলতে থাকল নাকের পাশে।

ক্রমাগত মোচড় খাচ্ছে দেহটা। থরথর করে কাঁপছে থেকে থেকে ঝাঁকি দিচ্ছে। বুদবুদের চাপে চামড়ায় ঠেলে বেরোচ্ছে যেন অসংখ্য ফোঁড়া। ভীষণ আক্ষেপে ফেটে পড়তে চাইছে বিকৃত দেহটা। ভয়ঙ্কর, বীভৎস দৃশ্য।

'দুশো পঞ্চাশ!' বিগের ঘোষণা শোনা গেল। 'দুশো...কী ঘটছে, মিস্টার রানা?'

'ভয়ঙ্কর দৃশ্য!' বিড়বিড় করল রানা। 'ওহ্, খোদা!'

বিস্ফোরিত হলো দানবটার দেহ।

লাল হয়ে গেল কুয়াশা। রক্তের ছিটে আর মাংসের কণা এসে

আছড়ে পড়ল পোর্টহোলের কাঁচে। আটকে গিয়ে ঘোলা করে দিল। ভিতরের দৃশ্য এখন আরও অস্পষ্ট।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

আলমারি থেকে বেরিয়ে আসতে বলল কেরি ও ছেলেমেয়ে দুটোকে।

ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্নের অবসান হয়েছে।

প্রত্যেকে একবার করে ভিতরের দৃশ্য দেখে এসে নিশ্চিন্ত হলো। তারপর হাসতে শুরু করল পাগলের মত। আনন্দে জড়িয়ে ধরছে একে অপরকে। হঠাৎ তীব্র আতঙ্কের চাপ দূর হয়ে যেতে মাতাল হয়ে গেছে যেন।

এই পাগলামির ছুতোয় রানাকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে চুমো দিল কেরি। কৃতজ্ঞ বোধ করছে মহৎপ্রাণ যুবকটির প্রতি।

-: শেষ:-

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

অখণ্ড অবসর

কাজী আনোয়ার হোসেন

রকি পর্বতমালার কোলে ছোট্ট শহর অ্যাসপেন। ওখানে গত চারমাস ধরে একাকী বাস করছে মায়াবী চোখের এক যুবক, জানে না ও কে। কারা যেন ইঞ্জেকশন দিয়ে স্মৃতি নষ্ট করে দিয়েছে ওর। কে দিল ইঞ্জেকশন? কাঁচাপাকা ভ্রূওয়ালা যে-লোকটা ওর স্বপ্নে দেখা দেয়, সে-ই? নাকি ওই হাতকাটা লোকটা, যে ওর দিকে চেয়ে হাসে, চোখ টেপে? তরুণী সাংবাদিক লিমা সোরেনসনের সঙ্গে পাহাড়ে ক্যাম্পিং করতে গিয়ে একটা লাশ পেল ও। মৃত মানুষটার ক্যামেরা কেস-এ লুকানো কোডটাই যেন কাল হলো ওদের। কোন্ গোক্ষুরের লেজে পা দিয়েছে, জানে না যুবক। নিষ্ঠুর ভাবে পিটিয়ে আহত করা হলো ওকে খুন হলো ওর বন্ধু পাগলাটে চার্লস রবিনসন, মারাত্মক জখম করা হলো ওর প্রিয় কুকুর হান্টারকে। কেন? কারা করছে এসব? সহ্যের সীমা অতিক্রম করতেই রুখে দাঁড়াল দুঃসাহসী বাঙালি যুবক।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল

গুনবহা, পো: বোয়ালমারী, ফরিদপুর। মোবা: ০১৭২১-৬৬২১৫১।

আমি মাসুদ রানা তথা সেবা প্রকাশনীর নতুন ভক্ত। 'গুপ্তঘাতক' দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম। ইতিমধ্যে 'আই লাভ ইউ, ম্যান', 'অন্ধকারের বন্ধু', 'গোপন শত্রু', 'অন্ধ আক্রোশ' এবং সর্বশেষ প্রকাশিত 'দুরন্ত ঈগল-১' পড়ে শেষ করেছি। সত্যিই আপনি যাদু দেখাতে পারেন, কাজীদা। তবে, বাংলাদেশের দুরন্ত ঈগল ফেরত চাই, যেমন ভাবেই হোক। তা না হলে কিন্তু... না থাক, শুরুতেই চমকে দিতে চাই না। রানা সিরিজ-এর বইগুলো উপহার দেবার জন্য আপনাকে হাজারো ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আচ্ছা, বোয়ালমারীর শাওন হোসেন (রাজু) কোথায় থাকে বলতে পারেন? সারা বোয়ালমারী বাজার খুঁজেছি ওই নামের কাউকে পেলাম না।

☆ তা-ই নাকি? বলেন কী! আপনার কি তাকে অশরীরী কিছু বলে মনে হচ্ছে—মানে, যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না? বাবারে! এ তো খুব ভয়ের কথা! ওই ঠিকানায়, অর্থাৎ, পোস্ট অফিসের দক্ষিণ পাশে কোনও শ্যাওড়া গাছ-টাছ দেখতে পেয়েছেন? সাবধানে থাকবেন কিন্তু, আপনি খুঁজে না পেলেও, তিনি হয়তো খুঁজে বের করে ফেলবেন আপনাকে! ...দুরন্ত ঈগলের খবর তো নিশ্চয়ই এতদিনে জেনে গেছেন, তাই সে বিষয়ে আর কিছু বললাম না।

মোঃ শাওন হোসেন (রাজু)

বোয়ালমারী পো. অফিস সংলগ্ন, থানা-বোয়ালমারী, জেলা-ফরিদপুর।

আমি প্রেমিক হিসাবে সার্থক। আমি ১০০% শিওর সেবা আমাকে তার

প্রেমিক হিসারে গ্রহণ করেছে। আর অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী সোহানা, ও না, ও আমাকে খু-উ-ব ভালবাসে। আমিও ওকে আমার জীবন থেকে অনেক-অনেক বেশি ভা...আরে!...মা-মাসুদ ভাই, আপনি? এই কান ধরছি, তিন বার উঠ-বসও করছি, প্লিজ, মাফ করে দিন। আর হে হে...দুরন্ত ঈগল-১ ও ২ উপহার দেবার জন্য আপনাকে...থুড়ি, কাজীদা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সঙ্গে একটু দেরিতে হলেও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন...বিদায়!!

☆কাভি আলবিদা না ক্যহ্না। ...গত নববর্ষের শুভেচ্ছা নিলাম, সেই সঙ্গে আগামী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

নূরে মাহমুদুল হাসান

দ. চর্থা, টমছমব্রীজ, কুমিল্লা।

সেবার পুরোনো পাঠক হলেও আলোচনা বিভাগে আমি নতুন। মাসুদ রানার সাথে আমার প্রথম পরিচয় 'গহীন অরণ্যে'। তারপর এখন পর্যন্ত প্রায় ২০০-২৫০টি বই পড়েছি। সম্প্রতি প্রকাশিত 'বেদুঈন কন্যা' এবং 'অরক্ষিত জলসীমা'–বইগুলো পড়লাম। এক কথায় দারুণ হয়েছে। 'বেদুঈন কন্যা'য় সুফিয়ার চরিত্রটি সত্যিই চমকপ্রদ, আর 'অরক্ষিত জলসীমা' বইটিতে 'তিসতা আরাকানীর' মৃত্যুতে সত্যিই আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি কারণ সে তার ভুল সংশোধনের জন্য দৃঢ় সংকল্প করেছিল। আমি এই নিয়ে বারবার যে দুইটি বই পড়েছি সেগুলো হলো 'অগ্নিপুরুষ' ও 'আই লাভ ইউ, ম্যান'। বারবার পড়ার পরও মনে হয় নতুন। নিঃসন্দেহে সকল পাঠক-পাঠিকা আমার সাথে একমত হবেন। এই বই দুটি মাসুদ রানার সেরা বই।

সবশেষে কাজীদার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং সকল পাঠক-পাঠিকাকে শুভেচ্ছা এবং সুন্দর সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য 'ভিক্টর নীল, রণবীর আহমেদ বিপ্লব, হাসান খুরশীদ রুমী' ভাইদের ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

সামনে যে কোন বইয়ে গিলটি মিয়াকে চাই।

☆যে-কোনও বইয়ে পেলেই চলবে তো? পাবেন...প্রমিজ। আপনার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা পৌঁছে গেল জায়গামত। ধন্যবাদ।

জয়

টিলাগড়, সিলেট-৩১০০। মোবাইল: ০১৭২২০৬২২৫২,

গত প্রায় চার বছর ধরেই পড়ছি সেবার বই। সময়ের হিসাবে খুব বেশিদিন নয়, কেউ কেউ তো ৩০-৩৫ বছর কিংবা তারও বেশি সময় ধরে পড়ছেন; সে তুলনায় আমি নিতান্তই শিশু! তবে আমি এই চার বছরে সেবার যত বই পড়েছি এবং সংগ্রহ করেছি, তা অন্য কেউ করেছে কি-না সন্দেহ। আমি তিন গোয়েন্দায় নিয়মিত লেখা পাঠালেও, এবারই প্রথম রানা সিরিজে লিখছি। সম্প্রতি 'দুরন্ত ঈগল' ১ম ও ২য় খণ্ড পড়লাম, বেশ ভাল লেগেছে।

লেখকদের কয়েকজন তো লেখা ছেড়ে দিলেন, আপনিও আবার মাসুদ রানা লেখা বন্ধ করে দিবেন না যেন! এভাবে সেরা সিরিজগুলো যদি বন্ধ

হয়ে যায়, তবে আমার মত সাধারণ পাঠকরা কোথায় যাবে, কী পড়বে?

কাজীদা, আমার একটা প্রশ্ন আছে: সেটা হলো–ইংরেজিতে জেমস বন্ড কিংবা মাসুদ রানা দুটো লিখতেই মোট ৫+৪=৯ টি অক্ষর লাগে। আবার বন্ড ও রানা উভয়েরই প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার পি.পি.কে: এটা কি কাকতালীয় নাকি ইচ্ছাকৃত?

☆সবটুকু ইচ্ছাকৃত নয়। ...বন্ধ হবে কেন, নতুন লেখক লিখবেন।

আবুল বাশার

বন্ধগেট, রাজশাহী, মোবা: ০১৯১১১০৯৩৩৭।

দুই বছর আগে প্রথম মাসুদ রানা ধরি। বর্তমানে ১৫০টা পড়া হয়েছে। আমার জীবনে যখনই ব্যর্থতা, হতাশা বা দুঃখ আসে তখনই ওষুধ হিসেবে কাজ দেয় মাসুদ রানা। নিমেষেই সব দুঃখ দূর হয়। তাই মাসুদ রানার সৃষ্টিকর্তকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

আচ্ছা রানার সাথে গগলের সর্বপ্রথম কোন বইতে দেখা হয়? সবশেষে সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

☆আপনিও আমাদের সবার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন। .যতদূর মনে পড়ে, রানা সিরিজে 'স্বর্ণতরী' বইয়ের মাধ্যমেই প্রথম গগলের পদার্পণ।

আরিফুর রহমান বাদল,

কাঁঠালবাগান কলোনী, লাকসাম, কুমিল্লা। মো: ০১৭২২ ৪৩২৫৮৬

শামসুদ্দীন নওয়ার রূপান্তরিত জুল ভার্নের 'পাতাল অভিযান' বইটির আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত রূপগঞ্জের টিপু সুলতান মোল্লার চিঠি থেকে জানা গেল: মাসুদ রানার জন্ম-তারিখ ১৯৩৬ সালের ৯ এপ্রিল। কাজী দা, সত্যিই কি তা-ই? সত্যি হলে প্রতি বছর ৯ এপ্রিল আমরা রানার জন্মদিন পালন করার সুযোগ পেতাম।

একসময় রানা আমার কাছে মধুর মত মনে হত আর তিন গোয়েন্দা অমৃত আর এখন তিন গোয়েন্দা মধুর মত লাগে, আর রানা অমৃত। বলুন তো, দোষটা কার? আমার, না আমার বয়সের?

☆আপনার বয়সটা কত, না-জানলে কী করে বলি? ...হ্যাঁ, জন্মদিনটা ঠিকই আছে, তবে সালটা ভুল। কারণ, আমরা জানি, মাসুদ রানা চিরনবীন, ওর বয়স বাড়ে না। অতএব, ওর বয়স জানতে হলে বর্তমান থেকে পঁচিশ কি আটাশ বছর বিয়োগ দিতে হবে। ইহাই উপপাদ্য বিষয়

ইমরান হোসেন (পলাশ)

লাকসাম, কুমিল্লা। মো: ০১৭১০-২৭৮১১৯

'দুরন্ত ঈগল-১,২' খুব ভাল লেগেছে। বিশেষ করে রানাকে অতীতের সেই রূপে ফিরে পেয়ে ভাল লাগল। তবে মরুকন্যা তার চেয়েও ভাল লেগেছে। আর 'সহযোদ্ধা' বিশেষ একটা ভাল লাগেনি। গিলটি মিয়াকে অনেক দিন দেখি না, প্লিজ, তাকে আগামী কোনও বইয়ে ফিরিয়ে আনুন

☆আচ্ছা।

মুহম্মদ আশরাফ আলী
হাজী ইমান আলী লেন, বসুপাড়া খুলনা।

নিশ্চয়ই বার্ধক্যে আক্রান্ত? খুবই স্বাভাবিক। যতদূর মনে হয় বয়স সত্তরের ঘরে। আমিও ৬৭তে পড়েছি। আপনি যেমন চালিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি আমিও আপনার প্রকাশিত 'রানা ও ওয়েস্টার্ন' সিরিজ সমানে চালিয়ে যাচ্ছি। ৬০-এর দশকে ইয়ান ফ্লেমিং-এর জেমস্ বন্ড সিরিজ শেষ করেছিলাম; বেশি উৎসাহিত হই ৬৪-তে 'ডক্টর নো' ছায়াছবি দেখে। যতদূর মনে পড়ে '৬৫ তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর এক বইয়ের দোকানে ধূলি-ধূসরিত অবস্থায় নতুন গেটআপ, ভিন্ন ধরনের চেহারা, নিউজ প্রিন্টে ছাপা, মলাটে খানিকটা ডিম্বাকৃতিভাবে কাটাস্থানে তৎকালীন সময়ের তুলনায় সাহসী ভঙ্গিতে একজন মহিলার ছবি। মূল্য মাত্র ২ টাকা—নাম 'ধ্বংস পাহাড়' সেই থেকে আর পিছনে তাকাইনি।

আপনার লেখার ঢং আমার পছন্দ। চিরকাল বাংলা সাহিত্য বলতে যা বোঝাত তা কলকাতা নির্ভর ছিল। আপনার কলমে সর্বপ্রথম এক ভিন্ন ধারা সৃষ্টি হলো এই বাংলায়। আপনার লেখা ঝরঝরে, কোনও আঞ্চলিকতাদুষ্ট নয়—যা এদেশী লেখায় প্রায়ই চোখে পড়ে। যদিও গোয়েন্দা গল্প উপন্যাসকে সাহিত্যের দরবারে কৌলিন্যের বিচারে ততটা উঁচু বলে ধরা হয় না, তবুও 'শার্লক হোমসে'র স্রষ্টা সার আর্থার কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি, ইয়ান ফ্লেমিং প্রমুখরা সাহিত্যের জগতে নতুন স্বাদের এক ধারা প্রবর্তন করে অমর হয়ে গেছেন। আমার মনে হয় পূর্ববাংলা সাহিত্য জগতে তৎকালীন সময়ে আপনার সৃষ্টি কৌলিন্যহীন 'রানা' সিরিজ কাটতির ক্ষেত্রে যে বিপ্লব সৃষ্টি করে, নতুন নতুন পাঠক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এর অবদান অনেক। পাঠকরা শুধু রানা বা সমমানের বই পড়েই ক্ষান্ত হন না নিশ্চয়ই, আরও এগিয়ে যান।

আমি আপনাকে প্রথম থেকে শ্রদ্ধা করি আর এখন সুস্থতা ও দীর্ঘায়ুর জন্যে দোয়া করি। আপনার লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে উচ্চশিক্ষিত, উন্নাসিক সাহিত্যসাধক অনেক বন্ধুর সাথে তর্কযুদ্ধ করতে হয়েছে; শুধু আপনার জন্যে সাহিত্যিক হিসেবে তাদের স্বীকৃতির একটু ছিটে-ফোঁটা আদায় করতে।

☆ আপনার আলোচনা প্রায় পুরোটা পড়ার পর টের পেলাম আপনি ঠিক কী বলতে চান। আপনি চান আমাকে লেখক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক, তা-ই না? আপনার আন্তরিক ভালবাসাটুকু আমি কৃতজ্ঞচিত্তে নম্রতার সঙ্গে গ্রহণ করলাম। তবে স্বীকৃতির ব্যাপারে আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। 'যেচে মান কেঁদে আদর' কে চায়? আমি জানি, আমার যতটুকু সাধ্য, ততটুকুই দিচ্ছি—আর আমার কাছ থেকে যতটুকু পেয়েছে, পাচ্ছে, পাবে: বিন্দুমাত্র কার্পণ্য না করে ততটুকুই মানুষ আমাকে দিয়েছে, দিচ্ছে, দেবে। কারও বিরুদ্ধে আমার কোনও নালিশ নেই।

চিঠির জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব কটি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২৩/০৭/০৭ পিশাচের আস্তানা+উড়ন্ত রবিন+অন্য ভুবনের কিশোর
(তিন গোয়েন্দা ভলিউম-৯৩) শামসুদ্দীন নওয়াব

পিশাচের আস্তানা: অদৃশ্য জিনিসটা টক-মিষ্টি দুর্গন্ধ ছড়ায়, তাড়া করে কিশোরকে। কিন্তু একথা কে বিশ্বাস করবে? কেউ না। তবে রবিন করল। তার কারণ, ও দেখেছে জিনিসটাকে। ফিফথ অ্যান্ড অরচার্ড স্ট্রীট থেকে একে একে হারিয়ে যাচ্ছে বাচ্চারা। ফলে, হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারল না তিন গোয়েন্দা। নিতেই হলো জীবনের ঝুঁকি।

উড়ন্ত রবিন: ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর সীমান্তে পাহাড়ি অঞ্চলে বেড়াতে গেল তিন গোয়েন্দা ও ফারিহা আঙ্কেল ডিক কার্টারের এক আত্মীয়ের খামার-বাড়িতে। ওখান থেকে ঘোড়ায় চেপে চলল ওরা বিখ্যাত প্রজাপতি-উপত্যকা দেখবে বলে। কিন্তু পথ হারিয়ে চলে গেল আরেক দিকে। তারপর? রবিনকে বন্দি করে নিয়ে গেল এক লোক পাহাড়ের অভ্যন্তরে। যে-পাহাড় থেকে লাল রঙের ধোঁয়া বেরোয়। হঠাৎ ঘিরে ধরল ওদের একপাল নেকড়ে!

অন্য ভুবনের কিশোর: কিশোরদের পাড়ায় এসেছে বিচিত্র এক পরিবার। তাদের রয়েছে কিশোরের বয়সী এক ছেলে—রিচি। আঙুল লম্বা করতে পারে সে, পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এক ধরনের আঠাল পিণ্ড, যার ভয়ে বুলির মত মারকুটে ছেলেও কাবু। অন্ধকার দেশ থেকে নাকি এসেছে রিচিরা। কারা ওরা? কেন এসেছে রকিবিচে? কোনও ক্ষতি করে দেবে না তো তিন গোয়েন্দার?

আরও আসছে

২৮/০৭/০৭ রহস্যপত্রিকা (২৩ বর্ষ ১০ সংখ্যা) আগস্ট, ২০০৭

মাসুদ রানা

অমানুষ

কাজী আনোয়ার হোসেন

ছোট্ট একটা দ্বীপ-অসপ্রে আইল্যান্ড, লিজ নিয়েছে রানা। মাঝে মাঝে ছুটি কাটাতে যায় ওখানে।

সাগরের বিচিত্র দৃশ্য দেখতে ভাল লাগে ওর।

মস্ত এক সাদা হাঙ্গরের ওপর নজর রাখছিল, ঠিক তখনই শুরু হল উৎপাত। কি যেন আছে সাগরের নিচে।

রহস্যময়ভাবে হারিয়ে যাচ্ছে মানুস-ভেসে উঠছে পচা লাশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

অকারনে পাখি ও অন্যান্য প্রানীকে ছিন্নভিন্ন করে রেখে যাচ্ছে কেউ। বিকৃত এক খুনের আনন্দে মেতেছে যেন ভয়ঙ্কর কোন রাক্ষস।

এ কিসের আলামত? সমুদ্রের গভীরে কি ওটা?

খুঁজছে ওকে রানা।

মারাত্মক জিনিসটার দেখা যখন মিলল, চমকে গেল ও!

কিভাবে ধ্বংস করবে ওটাকে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০